সাড়ে চার টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক ৮৩-বি,
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

পরিচয়

গত যুদ্ধের সময় এক সাহিত্য বৈঠকে বাগ্মী অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন: আমাদের দেশে বিপুল জন-সংখ্যার অনুপাতে কত সংখ্যক লোকই বা বড় বড় নামজাদা লেখকদের ছাপা বই পড়েছে—পড়া তো পরের কথা, নামকরা বইএর নাম পর্যন্ত অনেকে শুনেছে কিনা সন্দেহ। কোন সাহিত্যিকের—তা তিনি যিনিই হোন—তাঁর বইএর পাঠক সংখ্যা হাজারের ঘর পেরিয়ে লাখের সীমাপ্রান্তে পৌছায়নি নিশ্চয়ই! কিন্তু আমাদের দেশেরই কাশীরামদাসের মহাভারত, পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, এমনি সব চেনা কতকগুলো সেকেলে বইএর যে হাজার হাজার সংস্করণ হয়ে গেছে, আর আমাদের দেশেরই কোটী কোটী লোক সে-সব বই পড়েছে—একথা জোর করে বলা যায়। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, শেষোক্ত বইগুলি সোজা সরল সহজবোধ্য ভাষায় লেখা বলেই এগুলির এত বেশী প্রচার এবং দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অতি পরিচিত। কাজেই আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের উচিত, পাঠক তৈরীর দিকে লক্ষ্য রেখে সহজবোধ্য ভাষায় বই লেখা—সামান্য লেখা পড়া জানা পাঠক পাঠিকাও যাতে সে বইয়ের ভাষা বুঝতে পারে।

সরকার মহাশয়ের কথাগুলি তখন সভাস্থ অনেকেরই অন্তরস্পর্শ করিলেও সাহিত্যিকগণ যে নির্বিচারে তাঁহার যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। গত কার্তিক মাসে জয়পুরে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাসজীও সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন: বাঙলা ভাষাকে এমন সহজবোধ্য করা উচিত, যাহাতে ভারতের অপরাপর ভাষাভাষীরাও সহজে বুঝিতে ও শিখিতে পারে। তাহা হইলে জাতীয় ভাষা হিন্দীর মতই বাঙলা ভাষারও প্রচার এবং আদর ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়া পড়বে।

আমার লেখা 'স্বয়ংসিদ্ধা' 'অপরাজিতা' প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হিন্দী গুজরাটি উড়িয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইবার সময় অনুবাদকগণও ঠিক এই কথাই আমাকে বলিয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে উপন্যাস লিখিবার সময় আমি যেন আরও সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করি। বিশেষ একটি ঘটনা-সূত্রে একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়াই আমাকে এই উপন্যাসখানি অতি দ্রুত রচনা করিতে হয়। তৎকালে উল্লিখিত বিশিষ্ট উপদেষ্টা সুধীদের সুচিন্তিত নির্দেশগুলি স্মরণ করিয়া এই দীর্ঘ মৌলিক উপন্যাসখানির রচনায় আগাগোড়াই যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করি। এখন ইহা কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকমহলে গৃহীত হয়, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে, অভিজ্ঞতা-সূত্রে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, সহজবোধ্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতাও আছে যথেষ্ট এবং আজ তাহার প্রয়োজন হইয়াছে।

এই উপন্যাসখানি সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া শয্যাগ্রহণে বাধ্য হই। রচনা সমাপ্ত হইলেই প্রগতিশীল গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠান ডি, এম, লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী প্রীতিভাজন শ্রীগোপালদাস মজুমদার ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করেন। সুতরাং অসুস্থাবস্থাতেই আমাকে ইহার প্রুফ দেখিয়া দিতে হয়। যদি কোন ভ্রম ত্রুটি থাকে সহৃদয় পাঠকমহল আমার কায়িক অবস্থা বুঝিয়া মার্জনা করিবেন, এ ভরসা করি।

আর এক কথা, উপসংহারের পর জাতিস্মর খোকার ভবিষ্যৎ জানিতে অনেকেই আগ্রহান্বিত হইবেন। আমিও তাহা উপলব্ধি করিয়া তৎসম্পর্কে অবহিত আছি। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

প্রভাবশালী সংবাদপত্রসম্পাদনা ও দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার

সহিত

আধ্যাত্মিক জগতের জন্মান্তর এবং কর্মবাদ সম্পর্কেও

যিনি

পুরুষানুক্রমে অনুশীলনশীল, অভিজ্ঞ ও একান্ত বিশ্বাসী

সেই

স্বনামধন্য কর্মীপুরুষ—সর্বদিক-প্রসারিণী প্রতিভার অধিকারী

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মহাশয়ের করকমলে

দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত আমার এই

নবতম গ্রন্থখানি

গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিক শ্রদ্ধায়

সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম

গুণমুগ্ধ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

—এই লেখকের কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—

রাগিণী—৪৲

স্বয়ংসিদ্ধা ১ম—৩৲, ২য় পর্ব—৪॥০

অগ্রগামী—৪৲

অপরাজিতা—৪৲

গোটামানুষ—২॥০

কুমারী সংসদ—২॥০

কে ও কী—৩৲

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—২॥০

রাণী লক্ষ্মীবাঈ—৩৲

বাঙলা মায়ের সহিদ ছেলে—১॥০

পেশোয়া বাজীরাও (নব পরিকল্পিত পরিবর্তিত সংস্করণ)—২৲

ঝাঁসীর রাণী (নাটক)—২৲

প্রাপ্তিস্থান :

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জাতিস্মর

প্রথম পর্ব

সহরতলী অঞ্চলে শিবনগর গ্রাম। দাস বাবুরা পুরুষানুক্রমে এখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এঁদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—দাস ফ্যাক্টরী নামক প্রতিষ্ঠানটি। দু'মহল বড় বাড়ী। বাহির মহলে পূজার দালান, প্রকাণ্ড চত্বর, বৈঠকখানা—তার সামনে দর দালান। এখান থেকে টানা সিঁড়ি গেছে উপরে—সেখান দিয়ে ভিতর মহলে যাওয়া যায়। নীচের উঠানের পথে বাড়ীর ভিতর মহলে যাতায়াত চলে। কর্তৃপক্ষরা উপরের সিঁড়ি দিয়ে আসা যাওয়া করেন। এই বাড়ী থেকে খানিকটা তফাতে এঁদের কারখানা।

শীতকালের সকাল। বাড়ীর গৃহিণী অচলা স্নানান্তে ভিতর মহলের দ্বিতলে তাঁর ঘরে লক্ষ্মীর ছবিকে প্রণাম করছিলেন। অচলা স্বাস্থ্যবতী সুদর্শনা; বয়স ৩২।৩৩ বৎসর। অত্যন্ত স্নেহশীলা এই নিঃসন্তান নারী এবং সেই স্নেহধারা পিতৃমাতৃহীন ১২।১৩ বছরের বালক দেবর ভূতনাথকে পরিবেষ্টন করে অভিসিঞ্চিত হয়ে থাকে। এই বালকের যত আবদার মাতৃসমা এই ভ্রাতৃজায়ার কাছে। অচলা এ পর্য্যন্ত নির্বিচারেই তার প্রতি আবদার রেখে এসেছেন। এদিনও দেবী পটের উদ্দেশ্যে প্রণাম কালে দেবর ভূতনাথ দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে এসে আবদারের সুরে বলল:

ভূতনাথ: বৌমা, বৌমা—শীগগীর!

অচলা চমকে উঠে প্রণত মুখখানা তুলে বললেন: কিরে? ..... কি হয়েছে?

এই সময় দেখা গেল একটি মাত্র ঘোড়া বাহিত সেকেলে ধরনের কম্পাস গাড়ী আসছে।

ভূতনাথ : শীগ্‌গীর চল্ ঘরে লুকুই—দাদা না দেখতে পায়—

তারক : তা যাচ্ছি। কিন্তু ভূতো ভাই, তোর বৌমাকে বলে ঐ গাড়ীখানা একদিন বাগাতে হবে—সদরে বেড়িয়ে আসব।

ছেলের দল ঘরে গিয়ে লুকালো। গাড়ীখানা এই বাড়ীর পাশ দিয়ে অদূরবর্তী কারখানার দিকে চলল। খানিক পরেই প্রাচীর বেষ্টিত বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত ফ্যাক্টরী বাড়ীর ফটকের সামনে গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল। ফটকের উপর বড় বড় হরফে লেখা বোর্ড- দাস ফ্যাক্টরী।

* *

*

সইস গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই সৌম্যমূর্তি গম্ভীর প্রকৃতি সুপুরুষ সিদ্ধিনাথ নীচে নামলেন। ফটকের দারোয়ান তাঁকে অভিবাদন করল। সিদ্ধিনাথের বয়স এ সময় ৩৫।৩৬ বৎসর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

সিদ্ধিনাথ : অডিটার সাব হ্যায় ?

দারোয়ান : জী হুজুর !

সিদ্ধিনাথ কম্পাউণ্ড দিয়ে চলেছেন। চারদিকের পরিস্থিতির মধ্যে কেমন যেন থমথমে ভাব।

দাস ফ্যাক্টরীর মধ্যে মালিকের ঘর। একখানা টেবিলের উপর বিভিন্ন ফাইল, কাগজপত্র, একাউণ্ট বুক প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। সেই টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে বসে কার্য্যরত অডিটার মিষ্টার গুপ্ত।

একটু তফাতে আর একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে গদী আঁটা চেয়ারে বসেছেন সিদ্ধিনাথ। উভয়ের মধ্যে সংলাপ চলেছে :

সিদ্ধিনাথ : কি রকম দেখছেন মিঃ গুপ্ত ?

মিঃ গুপ্ত : যতখানি দেখিছি, তাতে মনে হচ্ছে সিধুবাবু—আপনারা বরাবর চোখ বুজিয়ে দরাজ হাতে খরচ করেই চলেছেন ; আয়ের দিকে দৃকপাতও করেন নি।

সিদ্ধিনাথ : বাবার আমল থেকেই এটা হয়ে এসেছে। আয়ব্যয়ের ব্যাপারটা তিনি নিজের হাতেই রাখতেন কিনা তাই আমি ছিলাম অন্ধকারে।

মি গুপ্ত : তাহলেও, তাঁর মৃত্যুর পর এই একটি বছর আপনিই তো—

সিদ্ধিনাথ : তাহলে আমিও বলব মিঃ গুপ্ত—এই একটা বছর বাবার কাজের ধারাকে আমি—যাকে বলে কার্বন কপি করা—তাই করে এসেছি। খরচ পত্র--বিজনেসই বলুন, আর হাউসহোল্ড য়্যাফেয়ার্স্‌ই ধরুন—কোন দিক থেকেই আমি কমাই নি, কাট ছাঁটও করিনি। ইদানীং টাকায় টান পড়তেই না টনক নড়েছে—আপনার শরণ নিতে হয়েছে। এখন আপনিই ভরসা।

মিঃ গুপ্ত : ভরসা হচ্ছেন ভগবান। আমি না হয় আগাগোড়া সব চেক করে আপনার সিচুয়েসানটা বাতলে দিতে পারব ; কিন্তু তা থেকে সেভ্‌ করবার ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা তো আমার নেই।

সিদ্ধিনাথ : তাহলেও এটা বুঝতে পারব ত—কারবারের কি অবস্থা··· আমরা কোথায় আছি। তবে আপনি যদি danger signal দেখান—তাহলে তখন বাঁচবার রাস্তা দেখতে হবে বইকি! কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কাউকে জানাইনি মিঃ গুপ্ত—এমন কি, আমার ওয়াইফকেও নয়। এখন আপনি—

মিঃ গুপ্ত : আমার কাছ থেকে আর সাতটা দিনের মধ্যেই আপনি actual statement পাবেন।

দাস-পরিবার ও ফ্যাক্টরীর পরিচালক এবং কর্তা সিদ্ধিনাথ। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃতত্ত্বাবধানে পরিচালিত কারবারে প্রবিষ্ট হয়েই ইনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারলেন যে, তার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, চতুর্দিকে প্রচুর দেনা। অথচ এ সত্ত্বেও পিতা বৈদ্যনাথ কোনদিকে খরচপত্র কাটছাঁট না করেই এই দায়গ্রস্থ কারবার ও বৃহৎ পরিবার জাঁক-জমকে চালিয়ে এসেছেন বরাবর। কর্মচারীদিগকে বছরে দুর্গা পূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে এক এক মাসের বেতন পার্বনী স্বরূপ দিয়েছেন ; বারো মাসে তেরো পার্বণ চালিয়ে লোকজন খাইয়ে এসেছেন খুব ঘটা করে, উপায়হীন আত্মীয়কুটুম্বদের আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। এর ওপর কত বিপন্ন লোক ও প্রতিষ্ঠানকে কত ভাবে যে কত টাকা দিয়েছেন—সে সবের ঠিকমত হিসেবও নেই। তার কারণ, লোক দেখানো দান করে নাম কিনতে তিনি ছিলেন নারাজ।

সিদ্ধিনাথ এ অবস্থায় কর্মস্থান ও কর্মচারীদের উপর হাত না দিয়ে—পূজা-পর্ব, বাহাড়ম্বর ব্যাপার সব, লোকজন খাওয়ানো, দান দাতব্য একে একে সব বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা না দেখে তাঁর পরিচিত এক বিশ্বস্ত অডিটারকে আনিয়ে কারবারের প্রকৃত অবস্থাটা জানতে সচেষ্ট হলেন। অডিটারের কার্যকালে তাঁর সঙ্গে সিদ্ধিনাথের কথাবার্ত্তায় কারবারের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া গেল।

এরপর একদিন অডিটর যে স্টেটমেণ্ট দিলেন, নথিভুক্ত তার বিবরণ পড়ে সিদ্ধিনাথ চমকে উঠলেন। জানলেন—কারবারের দেনা প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। পাওনাপত্র যা আছে তাদের অধিকাংশই অনাদায়ের

সামীল। এমন সব অর্ডারের উপর নির্ভর করে কাজ সরবরাহ করা হয়েছে, সে সব বোনাফাইড (bonafide) নয়।

সেদিন দাস বাড়ীর বাহিরের বৈঠকখানায় অডিটার মিঃ গুপ্ত সিদ্ধিনাথের সঙ্গেই তাঁর স্টেটমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন :

মিঃ গুপ্ত : এ অবস্থায় আমার মতে, কারখানা বেচে ফেলে পাওনাদারদের সঙ্গে রফা করাই উচিত।

সিদ্ধিনাথ : দেখুন মিস্টার গুপ্ত, বাবার আমলের পূজো-আচ্ছা, দান-ধ্যান, লোকজন খাওয়ানো সবই তুলে দিয়েছি। কেবল আশ্রিত আত্মীয়স্বজন, আর কারখানার কর্মচারীদের ওপর হাত দিইনি। এখন এটা ভাবতেও ব্যথায় অন্তর ভেঙে পড়ছে, কি করে তাদের বলব—আর তোমরা এসনা, তোমাদের আর রাখতে পারছি না—কারবার তুলে দিচ্ছি!

মিঃ গুপ্ত : খুবই দুঃখের কথা বটে—কিন্তু উপায় কি···মুখ ফুটে বলতে যখন একদিন হবেই।

সিদ্ধিনাথ : দেখুন, আমার এক বাল্যবন্ধু আছেন, তিনি মস্ত কর্মী মানুষ, অনেক বড় বড় ফ্যাক্টরী চালিয়ে এসেছেন—এখন পাটনা ফ্যাক্টরী চালাচ্ছেন- নাম তাঁর ভাস্কর গাঙ্গুলী। এই শিবনগরেরই লোক। আমি তাঁকে সব লিখেছি—আপনার ষ্টেটমেণ্টের কাপিও পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে তাঁর মতেরও একটা দাম আছে। আমি সেইটিই প্রতীক্ষা করছি মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত : খুব ভাল কথা। আমি তাঁকে জানি—সত্যই খুব পাকা লোক। তাঁর মত নেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। আচ্ছা, আমি এখন উঠছি।

সিদ্ধিনাথ: আসুন।

রুদ্ধ ঘরে কথা বলছিলেন—কেউ যাতে না শুনতে পায়। সিদ্ধিনাথ উঠে দরজা খুলে দিলেন। মিঃ গুপ্ত বেরিয়ে গেলেন। সিদ্ধিনাথ পুনরায় ফরাসে এসে বসলেন। চিন্তামগ্ন অবস্থা। পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য কৈলাস সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ফরাসের কাছে এসে ম্লান দৃষ্টিতে সিদ্ধিনাথের পানে তাকাল এবং আপনমনেই কি যেন উপলব্ধি করল, তারপর ডাকল:

কৈলাস: বড় দাদাবাবু—

সিদ্ধিনাথ: কে—কৈলাস! কি হয়েছে?

কৈলাস: (নীরবে তাকাল ছল ছল চোখে)

সিদ্ধিনাথ: কিছু বলবে কৈলাস?

কৈলাস: কি হয়েছে তোমার দাদাবাবু? খালি বসে ভাবো, ভালো করে খাওনা, রেতে ঘুমোও না···

সিদ্ধিনাথ: কে তোমাকে বলেছে—পাগল নাকি!

কৈলাস: আমি সব বুঝিগো—সে চেহারা তোমার কালি হয়ে গেছে, আর তেমনি করে হাসনি কেনে? কি হয়েছে কওতো—

সিদ্ধিনাথ: হবে আবার কি—তোমার যেমন মিছে বুকপুকুনি। কারবার ঘাড়ে পড়েছে, দেখা শোনা করতে হচ্ছে, খাটুনি হয়েছে—তাই হয়ত—

কৈলাস: উহুঁ—তোমার দুঃখ্যু আমি বুঝি দাদাবাবু·· কিন্তু ওসবের তরে ভেবুনি তুমি? আবার সব হবেক—ঐ পুজোর দালান আবার হাসবে—তুমি ভেবুনি দাদাবাবু!

সিদ্ধিনাথ পিতৃবয়সী ভৃত্যের অন্তরের দরদ বুঝে তার দিকে চেয়ে

থাকেন। তাঁরও চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাঢ়স্বরে বলেন :

সিদ্ধিনাথ : তোমার কথাই সত্য হোক কৈলেস - আবার সেদিন ফিরে আসুক।

* *
*

এর পর আরো কিছু দিন অতীত হয়। সিদ্ধিনাথ নিত্যই তাঁর কর্মী বন্ধু ভাস্করের পত্রের প্রতীক্ষা করেন; কিন্তু পত্র আসে না। এদিকেও কাজে তাঁর মন আকৃষ্ট হয় না—তিনি ভেবে পান না কি করবেন!

এক এক দিন বাহির মহলের দোতালার টানা বারান্দায় একাকী পদচারণা করতে করতে কত কি ভাবেন। সামনে শূন্য পূজার দালান—বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে। বাবার আমলে প্রতিমাসে কোন না কোন পর্ব উৎসব হোত, দালানে উঠানে কত লোক, এখন খালি।

সিদ্ধিনাথ : ও! বাবা থাকতে এই দালান যেন হাসতো—উঠানে লোক ধরত না! এখন—

(জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন)

এই সময় এক দল বালক বালিকা খেলা করতে করতে ছুটে এলো নীচের উঠানে—সেখান থেকে উঠল দালানে—তার পর বাইরে গেল।

সিদ্ধিনাথ : এর পর হয়ত—এরাও থাকবে না; হয়ত এই মুখেই বলতে হবে—বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। উ—

পিছনে ধীরে ধীরে অচলা এসে দাঁড়ালেন। বারাণ্ডার অপর দিক থেকে তিনি সিদ্ধিনাথকে দেখেছিলেন। কাছে এসে বললেন:

অচলা: কি হয়েছে তোমার বলত? রোজই দেখি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখ আর ভাব—

সিদ্ধিনাথ: ভাবি—তুমি কতক্ষণে এখানে আস, আর—দালানটাও আলো হয়ে ওঠে।

অচলা: আহা—তাই কি না! আমি যেন বুঝিনা! যে মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত, সে মুখ এখন অন্ধকার! তা বাপু, আমি তো কোনদিন তোমাকে বলিনি—কেন তুমি ওসব বন্ধ করলে?

সিদ্ধিনাথ: হঠাৎ ওকথা কেন?

অচলা: ঐ জন্তেই ত তোমার দুঃখ্যু—সে কি আমি বুঝিনা? তা যা হবার হয়েছে, ও নিয়ে মন ভার করা কেন! বাবা বলতেন ত জানো—মনে দুঃখ্যু হয় এমন কাজ কখনো করবে না। যেমন চলছে চালিয়ে যাও; যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি! বুঝলে?

সিদ্ধিনাথ: হাঁ তাই বাবা আজ—(হঠাৎ থেমে গেলেন—নিজেকে সম্বরণ করলেন)

অচলা: বল, বল, কি বলছিলে—বল?

সিদ্ধিনাথ: না, না,—থাক ও কথা—

ওদিকের বারাণ্ডা থেকে ভুতনাথের আহবান এলো—বৌমা! বৌমা!

অচলা: অ—মা! ভুতোর গলা না? যাইরে—

অচলা ব্যস্তভাবে চলে গেলেন!

সিদ্ধিনাথ: বেশ—তুমিই বেশ আছ।

অচলার ঘর। অচলা ও ভূতনাথ। অচলাকে সাদরে জড়িয়ে ধরে ভুতনাথ আবদারের স্বরে বলছিল :

ভূতনাথ : হ্যাঁ বৌমা—এবার আমার একটা সুট চাই—

অচলা : সুত্ সে আবার কিরে ?

ভূতনাথ : তুমি যেন কি! সুট জাননা—সাহেবের ছেলেরা কাপড়ের বদলে যা পরে গো ?

অচলা : ও! তা তুইত সাহেব হোসনি—তবে…

ভূতনাথ : বা—রে! ক্লাবে সাহেবী খেলা খেলছি যে—ব্যাটমিণ্টন খেললে সুট পরতে হয়।

অচলা : বেশ ত—বার মহলে তোর দাদা আছে—তাঁকে বলনা—

ভূতনাথ : যা—ও! (বিকৃতস্বরে) তাঁকে বল না! আমি যেন আর কাউকে কিছু বলি ? দেবে কি না বল ?

অচলা : শোন ছেলের কথা! সবতাতেই তম্বি!

ভূতনাথ : সত্যি বৌমা! সবাই বলছে—সুট পরলে আমাকে যা মানাবে, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকবে—

অচলা : তাই নাকি ?—তা বেশ, তুই কৈলেশকে চুপি চুপি বল্—সে যেন হাবু ওস্তাগরকে খবর দেয়, সে এসে তোর 'গায়ের মাপ নিয়ে যায়।

ভূতনাথ : থ্যাঙ্ক ইউ বৌমা! এই জন্যেই তো তোমাকে এত ভালবাসি।

সেদিন সকালের দিকে সিদ্ধিনাথ বৈঠকখানায় বসে আছেন গুম হয়ে। কৈলাস ফরাসের পাশে দাঁড়িয়ে বলছে :

কৈলাস : বৌমার কাছে আদর আর নাই পেয়েই ত ছোট দাদাবাবু অমন হৈছেন গো দাদাবাবু! যখন যা আবদার করতিছেন, বৌমার না করবার ক্ষ্যামতা আছে নাকি? এই ছ্যাখেন না —সে দিন খেয়াল হলো সায়েবের পোলাদের মতন পোষাক চাই—অমনি বৌমা হাবু মিঞাকে ডাকিয়ে ফরমাজ দিলে না—

সিদ্ধিনাথ : তাই নাকি? তা পোষাক এসেছে?

কৈলাস : এখনো এসেনি—তৈরী হচ্ছে গো! আর ছোট দাদাবাবুর কি টাইস্-দুটি বেলা তাগিদ দিতে হচ্ছে। এই ছ্যাখেন না—কখন থেকে মাষ্টার বাবু এসে অপিক্ষে করছেন, দাদাবাবুর ফেরবার নামটি নেই—

সিদ্ধিনাথ : সে কি—এত সকালে সে কোথায় গেছে? বাড়ী নেই?

কৈলাস : না গো—কেলাবে গ্যাছেন, চড়িভাতি হবে, তার বিলিবন্দেজ করতে।

সিদ্ধিনাথ : বটে—

ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত ভঙ্গিতে ফরাস থেকে উঠে সিদ্ধিনাথ ঘরের বাহিরে দরদালানে গেলেন।

বৈঠকখানার সামনেই দরদালান। সিদ্ধিনাথ সেখানে এসেই দেখলেন, বারান্দার অন্যদিক থেকে ভূতনাথের গৃহশিক্ষক নবীন মাষ্টার বিরক্ত ভাবে গজগজ করতে করতে আসছেন। সিদ্ধিনাথ বললেন :

সিদ্ধিনাথ : কি হয়েছে মাষ্টার মশাই? ভূতো পড়তে আসে নি?

ভাঁজ করা কাগজ—দলিলের মত। ভুতনাথকে দেখে প্রতীক্ষারত সিদ্ধিনাথ উৎফুল্ল হলেন—প্রসন্ন ভাবে বললেন :

সিদ্ধিনাথ : এসেছিস্?—ব'স্! তোর কথাই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলুম!

ভুতনাথ কোন কথা না বলে নীরবে গম্ভীর মুখে সামনের চেয়ারে বসল।

সিদ্ধিনাথ : পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত সময়টা খুব ভালো। সাড়ে আটটার মধ্যেই ভাস্কর এসে পৌঁছাবে—আমি গাড়ী পাঠিয়েছি তাকে আনতে। তার আগেই আমাদের সই দুটো হওয়া চাই। আমিই প্রথমে সইটা করি তাহলে।

কথাটা বলেই সিদ্ধিনাথ কলমদানি থেকে কলমটি তুলে দোয়াতে ডুবিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর প্রসারিত দলিলের নির্দিষ্ট স্থানটিতে সহী করবেন এমন সময় ভুতনাথ অকস্মাৎ অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বরে বাধা দিল :

ভুতনাথ : ও-সই এখন থাক দাদা—আমার এই দলিলখানা আগে দেখুন।

সিদ্ধিনাথ বুঝি আকাশ থেকে পড়লেন। কখনো যা সম্ভব বলে ভাবেননি—এমনি এক অদ্ভুত ও অসম্ভব কাণ্ড! ভুতোর মুখে এমন স্বরও শোনেননি তিনি কখনো—তার এমন মূর্তিও বুঝি নূতন! স্তম্ভিত হলেও তৎক্ষণাৎ সে ভাব কাটিয়ে রুক্ষস্বরে সক্রোধে বলে উঠলেন :

সিদ্ধিনাথ : তোর দলিল দেখব মানে? কিসের দলিল?

ভুতনাথ : পড়েই দেখুন না—

বলেই ভুতনাথ দলিলখানি সিদ্ধিনাথের হাতে ছেড়ে না দিয়ে তাঁর সামনে এমন ভাবে ধরল যে বেশ পড়া যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দলিলের ছত্রে

চোখ পড়তে—লেখা অর্থ বুঝতে পেরে—তাঁর চোখ মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। বিকৃত কণ্ঠে তিনি বললেন :

সিদ্ধিনাথ : কী! আমার সঙ্গে সময় বুঝে তুই কি এখন ইয়ার্কি করতে এলি?—'দাস ফ্যাক্টরীর মালিক হইতেছেন নিব্যূঢ়-স্বত্বে শ্রীসিদ্ধিনাথ দাস ও তস্য ভ্রাতা শ্রীভূতনাথ দাস; অপিচ, সিদ্ধিনাথ দাসের অবর্তমানে শ্রীভূতনাথ দাস ভ্রাতার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া সমগ্র কারবারের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইবেন।'—য়্যাঁ! ভাস্কর গাঙ্গুলীর নাম গন্ধও নেই এতে! হুঁ—বুঝিছি তোর মতলব। চালাকী পেয়েছিস্ বটে! পাজী, অভদ্র, বেইমান, ইতর কোথাকার—এখনি এ দলিল টুকরো টুকরো করে—

সিদ্ধিনাথ দলিলখানা ছিঁড়বার জন্যে সচেষ্ট হবামাত্র ভূতনাথ ঝাঁ করে সেখানি সরিয়ে নিয়ে বলল :

ভূতনাথ : যা হওয়া উচিত, আমার য়্যাটর্নীর পরামর্শে আমি তাই করেছি দাদা! আপনারও উচিত—এ দলিল্ মঞ্জুর করা।

সিদ্ধিনাথ : তোর ও কাগজ কলাপাতার সামিল—ও বাজে, ওর কোন দাম নেই। যদি ভালো চাস্—ও সব বজ্জাতি রেখে—এই দলিলে সই কর বলছি ভূতো –

ভূতনাথ : আমিও বলছি দাদা—সহী হবে এই দলিলে; এতে তুমি সই করবে, আমি করব, ভাস্করদাও করবে। তুমিই আগে সহী করো—

সিদ্ধিনাথ : কি বললি; আমাকে হুকুম! ছুচো—বাঁদর—জুতো মেরে ও মুখ—

কথা বলতে বলতে রাগে কাঁপতে কাঁপতে পায়ের জুতো খুলে

সিদ্ধিনাথ চেয়ার থেকে উঠে সামনে ঝুঁকে ভূতনাথকে মারতে গেলেন। ভূতনাথ নিরুপায় হোয়ে তাঁর হাত থেকে জুতোটা কেড়ে নিয়ে ঈষৎ ঠেলে দিতেই সিদ্ধিনাথ প্রথমে একটা র‍্যাকের গায়ে হেলে পড়লেন— তারপর র‍্যাকের কতকগুলো জিনিসশুদ্ধ মেঝের উপর বেকায়দায় পড়ে গেলেন। ভূতনাথও সভয়ে টেবিলখানা ঘুরে গিয়ে সিদ্ধিনাথের পানে চেয়ে তাঁর মুখ ও চোখ দেখে শিউরে উঠল। এই সময় সিদ্ধিনাথের চোখ দুটো যেন ঠেলে উঠছিল, গলা থেকে ঘড়ঘড়ানির শব্দের সঙ্গে একটা বিকৃত স্বর বেরিয়ে এলো—

সিদ্ধিনাথ : ওঃ, আমার দিন ফুরিয়ে গেল—তবু বলছি—তোর শাস্তি তোলা রইল ভূতো—ঈশ্বর সাক্ষী—সে শাস্তি দিতে-এ-এ—

ভূতনাথ : দাদা—দাদা—একি হলো! য়্যাঁ—

ভূতনাথ বিহ্বল হয়ে সিদ্ধিনাথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এমন সময় গোবর্দ্ধন ছুটে এসে বলল :

গোবর্দ্ধন : দাঁড়ান—ঘাবড়াবেন না! দেখছেন না—হয়ে গেছে! হার্টফেল করেছে। এখন নিজেকে সামলান ছোটবাবু—নৈলে আপনাকেই খুনের দায়ে পড়তে হবে।

ভূতনাথ : করলুম কি গোবর্দ্ধন বাবু! দাদাকে আমি—

গোবর্দ্ধন : ও কথা ভুলে যান—আপনাকে বাঁচতে হবে। ভাস্কর বাবু এসে পড়লেই—আপনি হাতে নাতে ধরা পড়ে খুনি সাব্যস্ত হবেন—তার কি পরিণাম—

ভূতনাথ : আমাকে বাঁচান গোবর্দ্ধন বাবু!

গোবর্দ্ধন : শীগগীর আপনার হাতমোজা দুটো খুলে দিন দেখি—

ভূতনাথ হাতমোজা খুলে গোবর্দ্ধনের হাতে দিতেই গোবর্দ্ধন যেন লুফে নিয়ে নিজের হাতে পরতে পরতে বলতে লাগল :

গোবর্দ্ধন : দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন আমি কি করি—আর যা যা বলি, শুনতে থাকুন। উদোর পিণ্ডি এখন বুদোর ঘাড়ে চাপানো ছাড়া আপনাকে বাঁচাবার আর রাস্তা নেই ছোটবাবু!

ওদিকে এই সময় আফিস গাড়ী আসছে। গাড়ীর ভিতরে ভাস্কর বসে। রাত্রির পথ। শিবনগরের পিচের রাস্তা—রাস্তায় গ্যাসের আলো। বাউলের গানের রেশ তখনো ভেসে আসছে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে—ভাস্কর কেমন যেন উন্মনা হয়েছেন গানখানি শুনে।

আফিস ঘর। ঘড়িতে ৮টা বেজে ১৫ মিনিট হয়েছে। সিদ্ধিনাথের টেবিলের সামনে চেয়ারখানির উপর এমনভাবে সিদ্ধিনাথের প্রাণহীন দেহটিকে বসানো হয়েছে—দেখলেই মনে হবে—টেবিলের উপর মাথাটি রেখে তিনি বুঝি ভাবছেন। গোবর্দ্ধনই এভাবে সাজিয়েছে—তখনো আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি করে রাখছে। ভূতনাথ মর্মর মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধনের কেরামতি দেখছে। গোবর্দ্ধন দলিল দুখানি টেবিলের উপর পাশাপাশি সাজিয়ে শীশার ওয়েট চাপা দিয়ে বলল :

গোবর্দ্ধন : আমাদের এখানকার কাজ হয়ে গেছে। চলুন ওঘরে যাই। এখন হাতমোজা দুটো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (খুলতে লাগল) লাইটের সুইচটা অফ করে দিন—

অফিস-গাড়ী ফ্যাক্টরীর ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সহীস এসে দরোজা খুলে দিল। গাড়ী চালাচ্ছে বৃদ্ধ মহাঙ্গীর। ভাস্কর গাড়ী থেকে নামতেই দরোয়ান এসে হাত তুলে অভিবাদন করল। সামনেই বিস্তীর্ণ

প্রাঙ্গণ। ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত নানাবিধ মেসিনারীর অংশ, কাঠের বাক্স, পিপা, সগ্‌গড় বা ঠেলা গাড়ী প্রভৃতি বিকীর্ণভাবে রয়েছে। তার মধ্য দিয়ে পথ। ভাস্কর চলেছেন।

* *
*

ভূতনাথের চেম্বার। ভূতনাথ ও গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন ফোন করছে।

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে হ্যাঁ—দলিল নিয়ে বচসা হতে হতে হাতাহাতি—তারপর এই কাণ্ড স্যার! আপনি এখনি আসুন।

ভূতনাথ : আপনার কি মাথা গোবর্দ্ধন বাবু—রাতকে আপনি দিন করছেন দেখছি।

গোবর্দ্ধন : আপনার জন্যেই—আপনাকে বাঁচাতে হবে জেনেই। আমার গুরুর হুকুম আপনার গায়ে কোন দিক দিয়ে মাছিটি না বসে—বুঝলেন? এখন আপনাকে এমনভাবে সরে পড়তে হবে—গেটের দরোয়ান পর্য্যন্ত জানতে না পারে।

ভূতনাথ : সে কি করে—

গোবর্দ্ধন : সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—চলুন।

* *
*

অফিস-ঘরের সামনে লম্বা দালানে আলো জ্বলছে। ভাস্কর এই পথ দিয়ে অফিস-ঘরে আসছেন। দরজার কাছে এসে দেখলেন—ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। ভিতরে চেয়ে বললেন :

ভাস্কর : কি ব্যাপার! ঘর অন্ধকার করে…

ঘরের ভিতরে ঢুকলেন ভাস্কর। নিজেই সুইচ টিপে দিতেই আলো

নবীন মাষ্টার : আজ্ঞে না—ওঁর ক্লাবে চড়িভাতির মিটিং—সেখানে গেছেন ; ফিরবেন খানিক পরে।

সিদ্ধিনাথ : ওঁর আবার ক্লাব হয়েছে নাকি ?

নবীন মাষ্টার : আপনি বুঝি কোন খবরই রাখেন না স্যার! ক্লাবের ত উনিই ফাউণ্ডার—ওঁর টাকাতেই ক্লাব চলে।

সিদ্ধিনাথ : বটে ?

নবীন মাষ্টার : আপনারা বড়লোক, হয়ত টাকার অভাব নেই ; তা বলে ১২।১৩ বছরের ছেলের হাতে আময়দা টাকা পয়সা দেওয়া মানে—ছেলে-বয়েস থেকেই ওদের কাপ্তেনীতে রপ্ত করা। এ কিন্তু ভাল কথা নয় স্যার !

নবীন মাষ্টার বিরক্তভাবে চলে গেলেন। সিদ্ধিনাথ কিছুক্ষণ কাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে সেই লম্বা বারাণ্ডায় পাইচারী করতে লাগলেন।—কৈলাস একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শুনছিল এঁদের কথা। এই সময় কাছে এসে বলল :

কৈলাস : ওনার সম্বন্ধে আপনি দাদাবাবু একটু কড়া হও গো !

সিদ্ধিনাথ : হুঁ !

বলেই তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। এই সময় ভূতনাথকে দালানে উঠতে দেখে কৈলাস বলে উঠল :

কৈলাস : এই যে ছোটদাদা বাবু বেশ লোক ত তুমি! কোথায় ছিলে ? ম্যাষ্টর বসে বসে চলে গেলেন !

ভূতনাথ কৈলাসের কথায় কর্ণপাত না করে দ্রুত বেগে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সিদ্ধিনাথ তখন উপরের দালানের শেষ প্রান্তে গেছেন। ভূতনাথও খুব দ্রুত বেগে চলেছে—পদশব্দে সিদ্ধিনাথ ফিরে তাকাতেই ভূতনাথের

জ্বলে উঠলো। আলোকিত ঘরে সিদ্ধিনাথকে সেইভাবে টেবিলের উপর ঝুঁকে মাথায় হাত রেখে উপবিষ্ট দেখে বিস্ময়ের স্বরে ভাস্কর বললেন :

ভাস্কর : ওকি! অমন করে বসে যে? শরীর ভাল নয় নাকি? (কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে)—ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি হে! (গায়ে হাত দিয়ে) সিধু—ওহে সিধু! একি!

একটু জোরে ঠেলতেই হুড়মুড় করে প্রাণহীন দেহটি উল্টে পড়ে গেল, সেইসঙ্গে ভাস্করের সমস্ত দেহমন মথিত করে ভীষণ আর্তস্বর শ্বসিয়ে উঠল :

ভাস্কর : য়্যাঁ—পড়ে গেলে! (সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে ঝুঁকে তুলতে গিয়ে) ওহো—সর্ব্বনাশ! হা ভগবান—একি হলো! আমিই কি তবে সিধুকে মেরে ফেললুম? সিধু—সিধু—সিধু—

বুক-ফাটা স্বরে ভাস্কর ডাকছেন। ওদিকে ফ্যাক্টরীর ফটক দিয়ে পুলিসের গাড়ী ঢুকছে। গাড়ীতে ইনেসপেক্টর ও কনেষ্টবলগণ।

অফিস-ঘরের সামনে আলোকিত দালান। গোবর্দ্ধন, ইনসপেক্টর ও কনেষ্টবলগণ।

গোবর্দ্ধন : আসুন স্যার—আমি ওয়াচ করছি আর ঘর বার করছি আপনার জন্যে।

ইনসপেক্টর : কোন ঘরে?

গোবর্দ্ধন : (নীরবে দেখিয়ে দিল)

অফিস-ঘর। ভাস্করের বয়স যেন এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে দশ বছর বেড়ে গেছে; আকৃতি বদলে গেছে—প্রকৃতিও ইতিমধ্যেই বিকৃত হয়েছে। বিহ্বলভাবে তিনি বলছিলেন :

ভাস্কর : কি করলুম—আমি কি করলুম! সিধু - সিধু—সিধু ভাইরে! আমি কি করলুম ·· কি করলুম···· ··

এমন সময় ইনেসপেক্টর, দুজন পদস্থ কনেষ্টবল ও গোবর্দ্ধন ঘরে ঢুকলেন।

ইনসপেক্টর : কি করেছেন আপনি—সব বলুন ত!

ভাস্কর : বলব ?·· সিধুর গায়ে হাত দিলুম পড়ে গেল ·· আর নেই! সব শেষ · কি করলুম···কি করলুম···

ইনেসপেক্টর এগিয়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় পতিত সিদ্ধিনাথকে দেখলেন। ভাস্করের দিকে তাকালেন। গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করলেন :

ইনেসপেক্টর : ' কে ?

গোবর্দ্ধন : আপনি স্যার এখানকার থানায় নতুন এসেছেন কিনা—তাই জানাশোনা নেই। ইনি এই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার ভাস্কর গাঙ্গুলী···· মালিক সিধুবাবুর বন্ধু। অথচ গ্রহের ফেরে কি কাণ্ড করে ফেলেছেন দেখুন!

ভাস্কর : তাইত—গায়ে হাত দিলুম···পড়ে গেল···আর নেই··· সিধুরে—

ইনেসপে : (গোবর্দ্ধনকে) দলিলে সহী করবার কথা কি বলছিলেন ?

গোবর্দ্ধন এদিক ওদিক চেয়ে টেবিলের উপর দলিল দু'খানা দেখেই সহর্ষে বলল :

গোবর্দ্ধন : বোধ হয়, এই হবে স্যার! দেখুন। বাইরে থেকে শুনেছিলুম··· সিধুবাবু বলছিলেন—আমার দলিলে তোমাকে সহী করতে হবে ; ভাস্করবাবুও পাল্টা ওঁর দলিল দেখিয়ে শাসাচ্ছিলেন—না, এই দলিলে তুমি সই করবে। তার মানে—ইনি মালিক-

ফুল মেজারদের সমান পার্টনার হবার জন্যে···পড়লেই সব বুঝবেন স্যার !

ইতিমধ্যেই ইনেসপেক্টর চেয়ারে বসে টেবিলের উপর প্রসারিত দুইখানি দলিল পড়ে এবং গোবর্দ্ধনের কথায় ব্যাপারটি উপলব্ধি করে দৃঢ়স্বরে বললেন :

ইনেসপেক্টর : আই সী। তেওয়ারী! হ্যাণ্ডকাপ লাগাও।

ভাস্কর : য়্যাঁ—একি করলুম—কি করলুম!

ইনেসপেক্টর : শিক্ষিত ভদ্রলোক হঠাৎ খুন-খারাবি করলে এইভাবে মাথা বিগড়ে ফেলে। উপস্থিত আমি লাস থানায় নিয়ে যাব সদরে পাঠাবার জন্যে। আর এই ঘর তালাচাবী দিয়ে শীল করে যাব।

* *

*

ভাস্করের বাড়ী। বৈঠকখানায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। এক দিকে গানের আসর বসেছে। তাঁদের মাঝখানে ভূতনাথ উপবিষ্ট। ওদিকে সকলেই গৃহস্বামী ও সিদ্ধিনাথ বাবুর আসার প্রতীক্ষা করছেন। দেউড়ীতে নহবত বাজছে।

জনৈক আমন্ত্রিত ব্যক্তি : তাইতো—রাত দশটা বাজতে চললো....এখনো ফিরছেন না যে বড় ?

ভূতনাথ : আমি তো এসেই শুনলুম, ভাস্করদা নিজেই আনতে গেছেন দাদাকে—

দরজার কাছ থেকে—কৈলাস : আমি একবার দেখবো নাকি ?...(এই সময় গোবর্দ্ধনকে দেখেই সহর্ষে) এই যে গোবর্দ্ধন বাবু এসেছেন দেখছি—তা বাবু···ওকি ! কাঁদছেন যে!

ভূতনাথ। কি হয়েছে গোবর্দ্ধন বাবু ?

গোবর্দ্ধন : সর্ব্বনাশ হয়েছে ছোটবাবু—সর্ব্বনাশ হয়েছে—আপনার দাদা নেই—খুন হয়েছেন !

ঘর শুদ্ধ লোক সকলেই অপ্রকৃতিস্থভাবে উঠে দাঁড়ান। সমবেত কণ্ঠ থেকে আর্তস্বর ওঠে : সে কি—সে কি !!

দণ্ডী-ঘরে নবীন ব্রহ্মচারী রবি গৈরিকবর্ণের ঝুলি কাঁধে করে—মৃগচর্মের উপর উপবিষ্ট, মুখে সলজ্জ হাসি। একটু দূরে—স্বতন্ত্র আসনে আরতি, অচলা, দুর্গা ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ। বাহিরে নহবৎ বাজছে। হঠাৎ নহবৎ থেমে যেতেই মিশ্রকণ্ঠে একটা কোলাহল উঠল—"সর্ব্বনাশ—হয়েছে। হায় হায় হায় !—কি হলো, কি হলো !"

আরতি : কি হলো ! নবৎ থেমে গেল কেন ? কারা কাঁদছে—

আলুথালুভাবে আরতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—অচলা প্রভৃতিও উঠে পড়ে পিছনে পিছনে ছুটলেন। রবিও উঠে দাঁড়াল।

দোতালার বারাণ্ডায় আরতি, অচলা, দুর্গা ও অন্যান্য মেয়েরা দাঁড়িয়ে নীচের প্রাঙ্গণের ব্যাপার দেখছেন ও শুনছেন। গোবর্দ্ধন আর্তস্বরে সেখানে দাঁড়িয়ে বলছিল :

গোবর্দ্ধন : একেই কয়—উৎসবে ব্যসন…হরিষে বিষাদ ! বরাত—বরাত ! নইলে আফিস ঘরে বসে দুই সাঙাতে কথা হতে হতে হাতাহাতি হয় ! আর এমনি গ্রহের ফের—ভাস্করদা'র হাতের ঠেলায় পড়ে গিয়েই বড় বাবু—উঃ ! হার্ট ফেল করে মারা গেলেন ?

কৈলাস : য়্যাঁ—বড়বাবু—বড়বাবু গো ! আমার বড় দাদাবাবু !

গোবর্দ্ধন : হায় হায় হায়—রে !

ভূতনাথ : বলছেন কি গোবর্দ্ধন বাবু ! দাদা—

দোতালার বারাণ্ডায় আরতি, অচলা, দুর্গা। গোবর্দ্ধনের মুখে খবর শুনতে শুনতেই সকলে আর্ত্তনাদ করে ওঠেন। এক সঙ্গে তিনজনেই— অন্যান্য মেয়েরাও যোগ দেন।

আরতি : য়ঁ্যা—সত্যি ?

অচলা : মাগো ! ভগবান—

দুর্গা : ও মাগো—

আরতি : না, না, না, এ হতে পারে না—এ হয় না—

অচলা : ওরে কে আছিস্ · ওরে ভূতো—আমাকে নিয়ে চল্ তাঁর কাছে—

দুর্গা : হে ঠাকুর—হে মা মঙ্গলাচণ্ডী—একি করলে তুমি—

ব্রহ্মচারী রবিও এই সময় দণ্ডী হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলতে লাগল :

রবি : খুন হয়েছে ! আমার বাবা কাকাবাবুকে খুন করেছেন ! মিথ্যা—এ মিথ্যা। আমি বলছি মিথ্যা—আমি বলছি মিথ্যা—এ হোতে পারে না ! আমি যাবো—আমাকে নিয়ে চলো ! কাকাবাবু ! বাবা ! বাবা !!

* *
*

দাস-বাড়ী। অন্দরমহল—দালান। একখানা কার্পেটের আসনে যুগল মোক্তার বসে আছেন। ভূতনাথ আর একখানা আসনে গালে হাত দিয়ে বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট। দালানের গায়েই অচলার ঘর। সেই

ঘরের দরজার কাছে বিধবার বেশে অচলা ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পিছনে অবগুণ্ঠনবতী দুর্গা।

যুগল : যে সর্বনাশ হয়ে গেছে বড় মেয়ে—এখন ঐ নিয়ে গোয়েন্দা লাগিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে—কারবার-পত্তর ফেলে ওরই পিছনে ছুটোছুটি করতে হয়। কিন্তু কি হবে তাতে বলো মা—সিধু বাবুকে তো আর ফিরে পাব না আমরা? তাই বলি—

অচলা : দেখুন তালুই মশাই—কিসে যে কি হয়েছে, তা সে তিনিই জেনে গেছেন, আর জেনেছেন ভগবান। তাই, দিন রাতই তাঁকে ডাকছি—তিনি জানিয়ে দিন কে কি করেছে। তবে একথাও বলি—আমরা যেন ও-বাড়ীর দেবতার নামে কিছুতেই ও কলঙ্ক না দিই! যে যাই বলুক, আমি কিন্তু তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে করে বলতে পারি—দেবতা ও-কাজ কখ্খনো করেন নি। আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, সে তো ফিরবে না; কিন্তু আর একটা সংসার যাতে নষ্ট না হয় সেটা আমাদের দেখা উচিত—আর দেখতেই হবে।

যুগল : একশ বার উচিত। আর দেখবই ত। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা! ভাস্কর ঠাকুরকে খালাস করবার জন্যে আমরাই এখন হামরাই হয়ে দাঁড়াব …… তা পুলিস্ ওঁকে খুনী বলে সদরে চালানই দিন, আর—ফাঁসি কাঠে ঝোলাবার জন্যে যত তদ্বিরই করুক না কেন?

অচলা : আপনার মুখে একথা শুনে সত্যিই আমি মনে শান্তি পেলুম তালুই মশাই! এখন ভূতোর মাথার ওপরে থেকে সব বিলি

বন্দেজ আপনাকেই করতে হবে। খরচের জন্যে ভাববেন না—বড় বড় কৌঁস্থলি দিন, যা যা করা দরকার সব করুন আপনি!

ভূতনাথ একটু উদ্বিগ্নভাবে তাকাতেই যুগলের সঙ্গে চোখোচোখী হলো; যুগল তৎক্ষণাৎ চোখ টিপে ইসারা করে বিচিত্র ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন:

যুগল: শুনলে তো বাবাজী! কত বড় ভাগ্য করেছিলে, তাই এমন দিল-খোলসা পর-দরদী বৌদি পেয়েছিলে! তোমাকে কিছু দেখতে শুনতে হবে না বাবাজী, আমার এই মায়ের কাছেই জোর গলায় বলে যাচ্ছি—কার-কারবার দেখাশোনা, মামলা চালানো সবই আমি দেখবো, তুমি শুধু অচলা মার পিছনে পিছনে সব সময় থাকবে—আহা! মা আমার ভগবতী! এঁর অদৃষ্টে এ দুর্গতি যে কেন হলো—তাই ভাবি, হা ভগবান—

দুর্গা এই সময় অচলার আঁচল ধরে ঘরের দিকে টানতে লাগল।

অচলার ঘর। অচলা ও দুর্গা।

অচলা: কি বলবি বল না—অত লুকোছাপা কিসের! আর জ্বালাস্নি বাপু—বল্ ……

দুর্গা: আগে বলুন দিদি—রাগ করবেন না?

অচলা: তোর ওপরে রাগ করিছি কোনদিন বলতে পারিস্—এখন যদি তোরা ধরে মারিস, কাটিস্-কুটিস্—তবু টুঁ শব্দটি আর করবনা রে

দুর্গা: অমন করে আপনি বলবেন না দিদি!—হ্যাঁ, আমি শুধু এই

কথাটি চুপি চুপি বলে রাখছি দিদি……আপনারা আমার মামাকে বিশ্বাস করবেন না—উনি লোক ভালো নন দিদি!

অচলা : ওমা! একি বল্‌ছিস্‌রে! মাথা খারাপ হয়নি তো তোর?

দুর্গা : দিদি, জ্ঞান হয়ে অবধি আমি মামার বাড়ী আছি, ঐখানে মানুষ হয়েছি! আমার চেয়ে আর কেউ আমার মামা মামীকে বেশী চিনবেন না—উনিও না। আমি বলছি দিদি—বিশ্বাস করে ওঁর ওপরেই সব ভার যেন ছেড়ে দেবেন না—

অচলা : কিন্তু আমরা তো ওঁর কিছুই মন্দ দেখছিনা রে—এই বিপদের সময় উনি ছুটে এসে আড়ি আগলে না পড়লে আমরা কি করতুম! সব দিকেই দেখি ওঁর নজর; কি মিষ্টি কথা, কত আদর যত্ন! মনে হচ্ছে বুঝি নিজের বাপের কাছেও এমন আদর পাইনি। তুই মন খারাপ করিসনি দুর্গা! আর বলি ভাই—এই কথাটি সব সময় মনে রাখবি, শ্বশুরবাড়ী এসে বাপের বাড়ীর আপনার জনদের দোষ অন্যায় চেপে রাখতে হয়। এমনি, বাপের বাড়ী গিয়েও শ্বশুরবাড়ীর মন্দ কিছু রটাতে নেই—বুঝলি? তাতে পাপ হয়।

* *
*

ভাস্করের বাড়ী। দোতালার দালান। যুগল মোক্তার একখানা বেতের চেয়ারে বসে অবগুণ্ঠনবতী আরতির সঙ্গে কথা বলছেন :

যুগল : দেশশুদ্ধ লোক আজ হায় হায় করছে মা-ঠাকরুণ!—আপনার ঋষির মত স্বামীর এই মিছে অপবাদের জন্যে। তাইতো বলে এলুম পুলিস সাহেবকে—তোমরা যাই বলো,

আর যতই প্রমাণ পত্র আনো, কারখানার হাজার লোক, আর বিশখানা গ্রামের বাসীন্দাদের কেউই ও কথা বিশ্বাস করবে না। তাই তো ভরসা দিতে এসেছি মা-ঠাকরুন—আপনি ভাববেন না—আপনার স্বামীকে আমরা খালাস করে আনবই।

আরতি : দেখুন, উনি কখনো কারুর কোন অনিষ্ট বা কোন রকম অন্যায় করেননি ; ওঁর সম্বন্ধে কেউ অন্যায় কিছু করলে একগাল হেসে বলতেন—ও নিজেই ভুল বুঝবে—ভগবান ওকে সুমতি দেবেন। সেই মানুষের এই বিপদে আমরাও ভগবানের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

যুগল : এর ওপরে আর কথা নেই মা-ঠাকরুণ, বামুনের ঘরের মেয়ের মতই কথা আপনি বললেন। কিন্তু ভগবান তো নিজের হাতে কিছু করেন না মা,—তাঁর ওপরে বিশ্বাস রাখুন, কিন্তু চুপ করে নিশ্চিন্ত থাকলে তো হবে না মা—ভগবানও চান কর্ম—কাজ। ওঁকে মুক্ত করবার জন্যে যা যা করা দরকার—সে সব তো করতেই হবে মা!

আরতি : বেশ, আপনি যখন নিজে দরদী হয়ে এসেছেন বিশ্বাস মশাই, ওঁর জন্যে যা করতে বলবেন তাই করব—যা উনি রেখে গেছেন সবই তুলে দেব।

যুগল : ভাস্কর বাবুর তরফ থেকে আমিই এ মকর্দ্দমা চালাব মা-ঠাকরুণ—বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারও নেবো। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলি মা ঠাকরুণ—আপনি যদি বলেন, আমি সিধুবাবুর স্ত্রী আর ভূতনাথকে বলে—মামলার খরচ......

আরতি : না, না, না, বিশ্বাস মশাই! আপনি ও চেষ্টা করবেন না… কারুর সাহায্য আমি নেব না। দেখুন, এই ছোট সংসারটির উনি ছিলেন আনন্দ আর প্রাণ—আমরা যে কি করে এখনো বেঁচে আছি তা জানিনে! যখন যা দরকার হবে, আমার কাছ থেকেই নেবেন। এখুনি আমি আপনাকে দু'হাজার টাকা এনে দিচ্ছি। তবে একটা কথা এখনো বলছি—তদ্বির করা উচিত বলেই আপনার কথায় এসব করছি; কিন্তু আমি জানছি—ভগবান আছেন, তিনি সব শুনছেন—দেখছেন, তিনিই রয়েছেন মাথার ওপর—তাঁর যা ইচ্ছা, তাই হবে বিশ্বাস মশাই! সত্য একদিন প্রকাশ হবেই।

* *

*

সিদ্ধিনাথের বৈঠকখানা। সিদ্ধিনাথের স্থানে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে গড়গড়ার নল টানতে টানতে যুগল মোক্তার বলছেন :

যুগল : তোমার বৌমা ঢালাও হুকুম দিয়ে বসলেন—বলেই আমি অমনি টাকাগুলো জলে ফেলব বাবাজী ?…তাই না বামনী মাগীকে ধাপ্পা দিয়ে তার কাছ থেকে টাকাগুলো বার করে আনলুম!

ভূতনাথ : বৌমার ও কথাটা আমারো ভাল লাগেনি বাবাবু! ওখান থেকে টাকাটা বার করে এনে ভালোই করেছেন!

যুগল : এক চালে দুটো কাজ ফতে করে এনেছি বাবাজী! হাজার হোক মেয়েমানুষ তো—পিছনে এসে নাচাবার লোকের হয়ত অভাব হবে না; পাছে আর কেউ এসে মাতব্বর

অচলা : ভুতোর ইচ্ছে—নিজেই সব খরচ দেবে!

সিদ্ধিনাথ : যেহেতু উনি হচ্ছেন তালেবর ঘরের ছেলে! কিন্তু তাল-পুকুর এখন নামেই—ঘটি ডোবাবার মতনও জল নেই বড়বৌ।

অচলা : কি বলছ তুমি গো!

সিদ্ধিনাথ : ভেবেছিলুম বলব না—কিন্তু না বলিয়ে তুমি ছাড়লে না—শোন....বাবা মারা যাবার পর এই একটা বছরেই রাস্তায় নেমে দাঁড়াবার অবস্থায় এসেছি। জানো, মাথার ওপরে কত দেনা? পাঁচ লাখেরও ওপর!

অচলা : য়্যাঁ! দেনা!! অত টাকা—কিন্তু আমায় তো কিছু বলনি?

সিদ্ধিনাথ : তুমিও আমার সঙ্গে তুষের আগুনে জলে খাক হও—সেটা চাইনি। এই দেনার ব্যাপারেই এখন চলেছি—সময়মত সব বলব তোমাকে।

অচলা : কিন্তু এখন আমার মুখ রাখ-এবারের মত ও টাকাটা ওকে দাও—

সিদ্ধিনাথ : আশ্চর্য্য! তবু তুমি....উঃ!

অচলা : না হয়—আমার একখানা গয়না কোথাও রেখে—

সিদ্ধিনাথ : একখানা নয়—সব গয়নাই হয়ত খুলে দিতে হবে একদিন।

সিদ্ধিনাথ দেরাজ বন্ধ করে কাগজখানা নিয়ে চলে গেলেন ঘর থেকে। অচলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অচলা নিজের ঘরে খোলা বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে নোট টাকা ও রেজগি ভুতনাথের হাতে দিয়ে বলছেন :

অচলা : এই ছাখ্—কুড়িয়ে বাড়িয়ে সিকি দুয়ানি আধুলি—যেখানে যা ছিল—বাক্স খালি করে তোকে দিলুম—

হয়ে মামলাটা চালাতে চায়, সেই ভয়ে আগেই ওপথ বন্ধ করে দিয়েছি। তারপর মামলা চলবে আমার ইশারায় আর ওদেরই টাকায়—বুঝেছ, এর ফল কি হবে ?

ভূতনাথ : আমার বোঝাবুঝি সবই আপনি মামাবাবু!

যুগল : এখন শোন—সে রাতে গোবর্দ্ধন তোমাকে বাঁচাবার জন্যে যে রাস্তা তৈরী করে রেখেছ, তোমাকে বাবাজী এখন আমাদের ইশারায় সেই রাস্তা ধরে সাবধানে পা ফেলতে হবে, একটু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ! বুঝতে পারছ তো, তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে এত কাণ্ড করে ভাস্করগাঙ্গুলীর মামলা চালাবার ভারটি নিজের হাতে নিতে হয়েছে!

ভূতনাথ। মামাবাবু! আপনার আর গোবর্দ্ধন বাবুর এ ঋণ—

যুগল : এই, এই! মনে রেখ বাবাজী, তাহলেই সব হবে। আগে তো তোমার ভয় ভাবনা দুশ্চিন্তা সব কাটিয়ে দিই, তারপর যখন যেটি করতে বলব, হ্যাঁ ছাড়া, আর না বলা চলবে না বাবাজী।

ভূতনাথ। এই আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি মামাবাবু—মাথার ওপরে বসে আপনি আমাকে আর আমাদের কারবারকে চালাবেন—আপনার কথার ওপরে কোন কথাই আমি কোনদিন বলব না।

যুগল : বেশ, বেশ—এই তো চাই! কথাগুলো কিন্তু মনে রেখো বাবাজী!

ভাস্করের বাড়ীর দালান। যুগল মোক্তার ও আরতি।

যুগল : উকীল মোক্তার কি করবে মাঠাকরুণ! তাদের জেরা, সওয়াল জবাব সব বাজে হয়ে গেল। আপনার স্বামীকে হাকিম জিজ্ঞাসা করতেই তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে এক রকম কবুল করে বসলেন!

আরতি : কি বলছেন আপনি! আমার স্বামী—

যুগল : আদালতশুদ্ধ লোক শুনে একবারে থ! ওঁর মুখে সেই গোড়া থেকে এক কথা—গায়ে হাত তুলতেই পড়ে গেল—তার পরই দেখি—হয়ে গেছে—সিধু নেই। একশো বার এই একই কথা, এ থেকে কি বোঝায় বলুন?

আরতি : হাকিমও কি তাই বুঝলেন—কিছু ভাবলেন না—কেন উনি অমন হয়ে গেলেন!

যুগল। নীচের আদালত কি তলিয়ে ভাবে মা-ঠাকরুণ! দিলেন তাঁরা দায়রায় ঠেলে, ভেবে চিন্তে যা করবার করবেন দায়রার হাকিম জুরীদের মত নিয়ে। আসল বিচার সেই খানেই তো। তবে মা', এর ডবল খরচ সেখানে—

আরতি : আপনি তার জন্যে ভাববেন না বিশ্বাস মশাই—যা দরকার হবে বলবেন।

যুগল : তাহলে হাজার পাঁচেক যোগাড় করে রাখবেন মা-ঠাকরুণ!

*

*

দাস-বাড়ী। অন্দরমহল—দালান। ভূতনাথ, অচলা, দুর্গা।

অচলা : অমা! বলিস্ কিরে—দায়রায় পাঠালে দেবতাকে। খালাস পেলেন না? তাহলে তোরা কি করলি রে?

ভুতনাথ : খালাস দেবার মালিক কি আমরা—যে খালাস করে আনব তোমার দেবতাকে? এ কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য বৌমা—তুমি ভাস্করদা'র জন্যে অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছ, আর দেশশুদ্ধ লোক ওরে ছি ছি করছে! তাদের বিশ্বাস হয়েছে—উনিই দাদাকে খুন করেছেন!

অচলা : ওরে ভূতো—যারা ওঁদের দুজনের সম্বন্ধ জানে, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না দেবতা ওঁকে খুন করেছেন! রাতে তো ঘুম নেই—যেই একটু তন্দ্রা আসে অমনি দেখি, যেন—দুজনে বসে আছেন! আমার তাই এখন কি কাজ হয়েছে জানিস্—ওঁকেই বলি, ওগো! তুমি বলে দাও, তুমি জানিয়ে দাও—কে একাজ করেছে—কে তোমাকে খুন করেছে!

একথা শুনে ভুতনাথের মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল—সে মুখখানা ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি দ্রুতপদে চলে গেল। দুর্গা এগিয়ে এসে বলল :

দুর্গা : দিদি, এখনো আমার কথা শুনুন—আপনি ওর কথা, আমার মামার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না দিদি! আপনার পায়ে পড়ি দিদি, আর কাউকে আপনি বলুন, দায়রায় দেবতার মামলা যেন—

অচলা : আর আমাদের কে আছে যে বলব? আমাদের কতটুকু মুরদ বল্?

দুর্গা : তাহলে বলি দিদি—আপনার মনের ঐ কথা—বড়ঠাকুরকে আমিও জানাব—আমার ভারি মনে লেগেছে দিদি! আজ থেকে তাহলে ঠাকুর ঘরে বসে আমিও বড় ঠাকুরকে বলব—

ঠাকুর! আপনার বন্ধুকে আপনি অপবাদ থেকে রক্ষা করুন, আপনি সত্য প্রকাশ করে দিন—

অচলা : বেশ, তাই বলিস্—স্বর্গের ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনিই সত্য প্রকাশ করে দিয়ে তাঁর বন্ধুকে রক্ষা করুন ।

* *

*

দায়রা আদালত। দায়রার বিচারপতি, জুরিগণ, পেস্কার, সরকারী উকীল, আসামীপক্ষের উকীল যুগল মোক্তার, অন্যান্য উকীলগণ, দর্শকগণ। সিনিয়ার মোক্তাররূপে যুগল বাবু অনেক তদ্বির করে দায়রার এই মামলায়ও আসামীপক্ষ সমর্থনের মঞ্জুরী পেয়েছেন। আসামীর কাটগড়ায় ভাস্কর গাঙ্গুলী—তাঁর আকৃতি প্রকৃতি থেকে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বিচারপতি : আসামী ভাস্কর গাঙ্গুলী! সিদ্ধিনাথ দাসকে আপনি খুন করেছেন—এই অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে হত্যার চার্জ আরোপ করা হয়েছে। এখন আপনি আপনাকে দোষী বা নির্দোষী—কি বলতে চান?

যুগল মো: ভাস্করবাবু! হুজুরের কথার জবাব দিন। বলুন—আপনি গিল্টি কিম্বা নট গিল্টি?

ভাস্কর : আমি খালি ভাবছি—কি করলুম · কি করলুম? সিধুর গায়ে হাত দিলুম · পড়ে গেল··· হয়ে গেল! বলুন তো—কি করলুম?

সরকারী উকীল : আপনি কি করেছিলেন···যিনি আড়াল থেকে দেখেছেন···তাঁর কথা শুনলেই মনে পড়বে। তাই আমি

প্রথমে এই মামলার প্রধান সাক্ষী গোবর্দ্ধন সামন্তকে ডাকছি—

পিয়াদা : সাক্ষী গোবরধন সামন্ত—হাজীর—

* *
*

সাক্ষীর কাটগড়ায় গোবর্দ্ধন এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারী উকীল তার জবানবন্দী নিচ্ছেন :

সরকারী উকীল : যখন ঐ দুর্ঘটনা হয়—সময়টা মনে আছে আপনার ?

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে হ্যাঁ—রাত তখন আটটা বেজে ২০ কি ২২ মিনিট হবে।

সরকারী উকীল : আপনি তখন আফিসে ছিলেন ?

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে হাঁ।

সরকারী উকীল : কি করছিলেন তখন ?

গোবর্দ্ধন : হঠাৎ কর্তাদের কামরা থেকে খুব জোরে জোরে বচসা শুনতে পেয়ে সিট থেকে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।

সরকারী উকীল : তারপর ?

গোবর্দ্ধন : সিদ্ধি বাবু তখন একখানা দলিল হাতে করে বলছিলেন—এই দলিল পাকা, এতে তোমাকে সই করতেই হবে। ভাস্করবাবুও আর এক খানা দলিল ওঁর সামনে ধরে বলেছিলেন—তোমার দলিল কলার পাতা, আমার এই দলিলেই তুমি সই করবে।

সরকারী উকীল : তারপর ?

গোবর্দ্ধন : সিদ্ধিনাথ বাবু ওকথা শুনেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার

থেকে উঠে দলিলখানা কেড়ে নিতে গেলেন। ভাস্করবাবু ঝাঁ করে সেখানা টেবিলের উপর রেখেই দুহাতে সিদ্ধিনাথ-বাবুর গলা টিপে ধরে ঠেলে ফেলে দিলেন—উনি উল্টে চীৎ হয়ে পাশের র‍্যাকটার গায়ে পড়েই তারপর জিনিষপত্র-শুদ্ধ মেঝের ওপর পড়ে গেলেন। সেই সঙ্গে ভাস্করবাবুর কথা শুনেই বুঝলাম—বড়বাবু মারা গেছেন!

সরকারী উকীল: আপনি তখন কি করলেন?

গোবর্দ্ধন: বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পুলিশে খবর দেবার জন্যে ফোন্ করতে গেলুম।

সরকারী উকীল: আচ্ছা—এই দু'খানা দলিল নিয়েই কি ওঁদের মধ্যে বচসা হয়? দেখুন তো—

গোবর্দ্ধন: (দলিল দুখানি দেখে) আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দলিল।

সরকারী উকীল: তারপর—পুলিস আসতে কি করলেন আপনি?

গোবর্দ্ধন: পুলিসের সঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখি—সিদ্ধিনাথবাবু চীৎ হয়ে পড়ে আছেন; আর ভাস্করবাবু খালি খালি পাগলের মতন বলছেন—কি করলুম··কি করলুম···কি করলুম!

আসামীর কাঠগড়া থেকে এই সময় ভাস্কর পূর্ব্ববৎ ভঙ্গি ও সুরে বলে উঠলেন: সিধুরে! কি হলো ভাই—কি করলুম আমি কি করলুম!

বিচারপতি: সাইলেন্স্—চুপ্।

চেয়ার থেকে উঠে বিচারপতিকে সম্বোধন করে এই সময় [illegible]লেন—

যুগল মোক্তার: ধর্মাবতার! আসামীর তরফ থেকে আমি পুলিসের ঐ সাজানো সাক্ষীটিকে জেরা করবার অনুমতি চাইছি।

বিচারপতি: ইয়েস, ইয়েস।

যুগল: আচ্ছা—বলুন তো··আপনার সঙ্গে দাস ফ্যাক্টরীর কি সম্বন্ধ?

গোবর্দ্ধন : আমি একজন কর্মচারী—কনফিডেনসিয়্যাল চিঠিপত্র সব আমি টাইপ করে থাকি।

যুগল : আচ্ছা, আপনার ডিউটি কখন বলুন ত ?

গোবর্দ্ধন : বেলা তুটো থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

যুগল : তাহলে ঘটনার দিন আপনি ও-রকম অসময়ে অফিসে ছিলেন কেন বলবেন ?

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে হ্যাঁ—ওদিন রাত সাড়ে আটটার সময় ভাস্করবাবুর বাড়ীতে তাঁর ছেলের পৈতে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ থাকে। বড় বাবু আমাকে বলেছিলেন—আমি যেন আফিসে একটু রাত পর্যন্ত থেকে চিঠিগুলো টাইপ করে দিই; তারপর এক সঙ্গেই নিমন্ত্রণে যাব, আর রাতে ওঁদের বাড়ীতেই থাকব।

যুগল : বটে! তা আফিসে অত লোক থাকতে আপনার প্রতি তাঁর এত অনুগ্রহের কারণ ?

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে, আমি লোক্যাল ম্যান নই কি না, বাসে যাতায়াত করি; সাড়ে ন'টায় আমার লাষ্ট বাস্। সেই জন্যেই আমাকে তিনি—

যুগল : আপনি নিজের চোখে দেখেছেন—ভাস্করবাবু সিদ্ধিবাবুর গলা-খানা তুহাতে চেপে ধরেছেন ?

গোবর্দ্ধন : নিশ্চয়—দেখেছি।

যুগল : গলাখানা ধরতেই বুঝি মারা গেলেন সিদ্ধিবাবু ?

গোবর্দ্ধন : গলা তু'হাতে চেপে ধরে গোটা কয়েক ঝাঁকুনিও দিয়েছিলেন, তারপর—জোরে ঠেলে দেন।

যুগল : অফিসে তখন আর কেউ ছিলেন না ?

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে না—সে দিন এক ঘণ্টা আগেই অফিস বন্ধ হয়েছিল;

অফিসের চাকর বেয়ারা ভাস্করবাবুর বাড়ী গিয়েছিল কাজ করতে—দেউড়ীতে শুধু দরোয়ান ছিল।

যুগল: আপনি যেখানে বসে কাজ করেন, সেখান থেকে ওঁদের খাস-কামরা কতখানি তফাতে গোবর্দ্ধনবাবু?

গোবর্দ্ধন: আজ্ঞে আমাকে কনফিডেনসিয়্যাল চিঠিপত্র টাইপ করতে হয় বলে, ওঁদের কামরার ঠিক পাশেই কাঠের পার্টিসন দিয়ে আমার ঘর করে দেন; সেখান থেকে ও ঘরের কথা স্পষ্ট শোনা যায়।

অন্যান্য উকীল মোক্তারগণও এই অদ্ভুত রকমের মামলাটির শুনানীর সময় দায়রা জজের এজলাসে কৌতূহলী হয়ে উপস্থিত ছিলেন। যুগল মোক্তারের জেরা শুনতে শুনতে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চা[illegible] গলায় মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন:

—এ কি রকম জেরা চলছে হে!

—শুনে যাও, শুনে যাও। মজা আছে।

—ঐ ঘুঘুটি হচ্ছেন যে—বরের ঘরের মাসী, আর কনের ঘরের পিসী!

যুগল মোক্তার এর পর আরও কতকগুলো জেরা করলেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বা ভাস্করের বিরুদ্ধে কোন প্রকার চক্রান্তের আভাসও পাওয়া গেল না। অথচ সাক্ষীদের জবানবন্দীর ব্যাপারে বৃথা আরও দুটো দিন কাটিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ কর[illegible]।

* *

*

সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হবার পর সরকারী উকীল সওয়ালজবাব করতে উঠলেন। তিনি বললেন:

সরকারী উকিল: জুরী মহোদয়গণ বিবেচনা করুন—সম্ভ্রান্তবংশীয় এক

উচ্চশিক্ষিত সভ্য ভদ্র কর্মী ব্যক্তি সাময়িকভাবে লোভের প্রেরণায় কত বড় একটা সাংঘাতিক অপরাধের নায়ক হতে পারেন! যে প্রতিষ্ঠানটির তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ, যার উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব থাকায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কাছ থেকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মান পেয়ে এসেছেন; এবং বেতন, বোনাস প্রভৃতি ধরে বছর শালিয়ানা ১৭।১৮ হাজার টাকা যাঁর বাঁধা আয়—হঠাৎ তাঁর মনে লোভ জাগল যে মালিকদের মত সমান অংশীদার হবেন। ছেলের উপনয়নকে উপলক্ষ করে সম্পাদিত দলিলখানি নিয়ে কৌশলে কাজ গুছুতে এলেন। এদিকে মালিক সিদ্ধিনাথও সন্দিহান হয়ে এক দলিল করে জানাতে চাইলেন—তাঁরা দুই ভাইই সিদ্ধিনাথ ও ভূতনাথ ফ্যাক্টরীর মালিক—সে দলিলে আসামী ভাস্কর বাবুর নাম গন্ধও নেই। দুখানি দলিল দেখে দুজনেই ধৈর্য্যচ্যুত হন এবং তার পরিণাম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে আপনারা জ্ঞাত হয়েছেন। এখন আপনারা বিবেচনা করুন—আসামী যে সাংঘাতিক কাজ করেছেন, তার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পেতে পারেন কিনা!

[?]গল মোক্তার: আমার বিজ্ঞ বন্ধু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই মামলার বিভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে আসামীকে অপরাধী প্রতিপন্ন করতে যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন। মাননীয় বিচারপতি ও বিবেচক জুরী মহোদয়গণ অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন—আসামীর বিরুদ্ধে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই—আসামীর শিক্ষা, বিদ্যা, প্রতিভা প্রভৃতি নানা-

গুণ ও সহৃদয়তার খ্যাতির কথা উল্লেখ করেছেন। মালিকদের সঙ্গেও তাঁর খুবই সদ্ভাব সম্প্রীতি ছিল। আকস্মিকভাবে উত্তেজনার বসবর্তী হয়ে যদিই বা তিনি ঐ গর্হিত কাজটি করে থাকেন এবং সেই সম্পর্কে এই ভয়ঙ্কর অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হন—তথাপি, এ অবস্থায় আমি তাঁর বয়স, বংশ, শিক্ষা, কর্মশক্তি ও বর্তমানের মানসিক বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে তাঁর প্রতি এই আদালতের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বিচারপতি : আমরা এখন এই মামলাটির উপসংহারে এসেছি! এই মামলায় জুরীদের দায়িত্বও বড় কম নয়। একদিক দিয়ে এই মামলাটি খুবই বিস্ময়াবহ যে, সরকার পক্ষ যে-সব সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত করেছেন, আসামী পক্ষ তাদের কোন তথ্যই খণ্ডন করতে পারেন নাই। এখন আপনাদিগকে ঐ সব সাক্ষ্য প্রমাণ ও সেই সঙ্গে স্ব স্ব বিবেকচালিত অনুভূতির উপর নির্ভর কর মত দিতে হবে—আসামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আরোপিত হয়েছে, তা প্রকৃত কিনা—আপনারা আসামীকে সিদ্ধিনাথ দাসের হত্যাকারীরূপে দোষী সাব্যস্ত করেন কিম্বা তাঁকে নিরপরাধ জেনে মুক্তি দিতে চান! আপনাদের সিদ্ধান্তের উপরেই আসামীর জীবন-মরণ নির্ভর করছে—মনে রাখবেন।

দর্শকবৃন্দ সমস্বরে : সাধু—সাধু! হিয়ার, হিয়ার!

* *

*

জুরিদের পরামর্শ কক্ষ। জুরিদের ফোরম্যান ও অন্যান্য জুরিগণ

ভূতনাথ : পঁচিশ টাকায় কি হবে? ওরা যে সব 'দুয়ো' বলবে।

অচলা : কিন্তু না থাকলে কি করি বল্? ম্যাদ্দিন কি না বলেছি রে? আর শোন্—আমার মাথার দিব্যি রইল, আর কখ্খনো এ রকম আবদার করবি নে। তোর দাদা ভারি বেজার হয়েছেন; কারবার মন্দা পড়েছে—টাকা কড়ির নাকি ভারি টানাটানি।

ভূতনাথ : আমি ওসব বুঝি না। আচ্ছা, আমি এখন এই নিয়ে যাচ্ছি, কাল কিন্তু বাকি পঁচিশ টাকা চাইই—হুঁ।

ভূতনাথ চলে গেল। অচলা ভাবাদ্রদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দেবরের দিকে। তাঁর দুই চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে।

*   *
*

সিদ্ধিনাথ উপরের সিঁড়ি দিয়ে বাহির মহলের বৈঠকখানায় যাবার জন্ত নামতে গিয়েই দেখেন—তাঁর প্রিয়বন্ধু তাঁরই সমবয়স্ক সুপুরুষ পরিহাস প্রিয় মিষ্টভাষী ভাস্কর গাঙ্গুলীও নীচে বারাণ্ডা দিয়ে চলেছেন—বৈঠকখানা লক্ষ্য করে। সিদ্ধিনাথ ব্যগ্র উল্লাসে সুধালেন :

সিদ্ধিনাথ : ভাস্কর যে! আ—বাঁচালে ভাই! তোমার চিঠির আশায় ক'দিন যে কি উদ্বেগে....

ভাস্কর : সেটা বুঝেই ত গুজরত খোদ্ সশরীরে হাজির হয়েছে হে! (হো হো করে হাস্য)······তোমার জরুরী চিঠি যখন গেছে, আমারও তখন দেশে ফেরবার প্রয়োজন হয়েছে, তাই আর জবাব দিই নি। কাল লাষ্ট ট্রেনে বাড়ী এসে যখন পৌছুই—রাত প্রায় একটা, নৈলে কালই আসতাম।

ই কক্ষে সমবেত হয়েছেন। টেবিলের এক দিকে জুরীদের মুখপাত্র বা ফোরম্যান, অন্যদিকে অন্যান্য জুরীগণ উপবিষ্ট। প্রাথমিক আলোচনার র ফোরম্যান বলছেন :

ফোরম্যান : দেখুন, আমাদের কাজ হচ্ছে—আইনের চেয়ে কানে শোনা সাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে কেস্‌টা বোঝা। এ-দিক দিয়ে মূল সাক্ষী গোবর্দ্ধন সামন্ত থেকে আরম্ভ করে আর সব সাক্ষীর এজাহারে কোন গরমিল আমরা দেখিনি—আসামী-পক্ষ সাক্ষীদের কোন কথাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেন-নি। তাছাড়া, আসামীর কথা খাপছাড়া হলেও তাকে কবুল করা বলেই ধরা যায়। এ অবস্থায় আসামীকে আমরা গিলটি বলতেই বাধ্য।

নৈক জুরী : আমার অভিমত কিন্তু স্যার, একেবারে উল্টো; আমার মনে হয়—আসামীপক্ষের সঙ্গে যোগ-সাজসে মামলাটা ইচ্ছামত করে সাজানো হয়েছে। আসামীর কথার ওপর কোন গুরুত্বই দেওয়া যায় না—আসামীকে কিছুকাল মেণ্ট্যাল হসপিটালে রেখে তারপর মামলার বিচার করানো উচিত ছিল। আসামী তরফের মোক্তার মশাই—আসামীকে 'নট গিল্‌টি' প্রতিপন্ন করবার দিকে জোর না দিয়ে আদালতকে তাঁর প্রতি দয়া করবার জন্যই প্রার্থনা জানিয়েছেন। আমার মত হচ্ছে—আসামী গিল্‌টি নন; ঐ প্রকৃতির লোকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। একটা রীতিমত চক্রান্ত এর মধ্যে আছে; দুঃখের বিষয়, আসামী পক্ষের মোক্তারটি সেদিক দিয়েই যাননি।

ফোরম্যান : অনুমানের ওপর নির্ভর করে আসামীকে কথনই নট গিলটি

বলা যায় না—বোধ হচ্ছে আপনি একলাই এই মত পোষণ করেন আসামী সম্বন্ধে। তারপর, আমাদের সামনে যে সব তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে, আমরা সেগুলি নিয়েই বিচার করব—তার বাইরে যেতে পারি না।

উক্ত জুরী : হ্যাঁ—শুধু অনুমান নয়—আমার বিবেকচালিত অন্তর আসামীকে 'নট গিল্‌টি' বলছে স্যার!

এক মাত্র এই জুরী ভদ্রলোকটি তাঁর সিদ্ধান্তে দৃঢ় থেকে আসামীর অনুকূলে অনেক কথাই বললেন, কিন্তু মুখপাত্র ভদ্রলোক সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত বিবেকচালিত অনুমানকে অগ্রাহ্য করায় অন্যান্য জুরীরা তাঁকেই সমর্থন করলেন।

পরামর্শের পর এজলাসে ফিরে এসে জুরীদের ফোরম্যান দায়রার বিচাররীতিকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা মাত্রই বিচারপতি যে রায় দিলেন, তার মোটামুটি মর্ম এইরূপ :

বিচারপতি : জুরীদের মধ্যে একজন মাত্র আসামীকে এই অভিযোগ সম্বন্ধে 'নট গিল্‌টি' বলছেন—অপর সকলের অর্থাৎ অধিকাংশ জুরীদের মতে আসামী 'গিল্‌টি'। আসামীপক্ষের সমর্থক আইনজ্ঞ প্রবীণ মোক্তার আসামীর শিক্ষা বিদ্যা পদ-মর্য্যাদা প্রভৃতি উল্লেখ করে তাঁর প্রতি করুণা প্রকাশের প্রার্থনা জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় আসামীর প্রতি চরম দণ্ডাদেশের পরিবর্তে দ্বাদশ বৎসরকাল সশ্রম কারাবাস দণ্ড প্রদত্ত হলো।

দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গে আদালত গৃহ মধ্যে একটা চাপা আর্তস্বর গুমরে উঠল।

দাস ফ্যাক্টরীর শ্রমজীবিরা—চাকর বেয়ারা দারোয়ান ড্রাইভার ঠিকে মজুররা পর্যন্ত এ খবর শুনে হাহাকার করে উঠল। দাস-বাড়ীর অন্তঃপুরেও নূতন করে শোকের ঝঞ্ঝা বইল। দুই বধূরই দৃঢ় ধারণা—অবিচার হয়েছে, প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে নাই। ওদিকে যুগল মোক্তার স্বয়ং আরতি দেবীর সামনে গিয়ে যখন তাঁর সিদ্ধ ভঙ্গিতে খবরটি শোনালেন—পুলিস ও আইনকে দায়ী করে খানিকটা হা-হুতাশ করে শেষে জানালেন: হাইকোর্টে আপীল করব আমরা—দায়রার রায় সেখানে রদ হবেই! এ অবস্থায় আরতি দেবী মর্মভেদী একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন: এর ওপরেও বিচার আছে বিশ্বাস মশাই! কিন্তু সে বিচারালয় আপনার ঐ হাইকোর্ট নয়—তারও ওপরে ধর্মের কাছে।

যুগল মোক্তার তাঁর ছেঁদো কথায় বোঝাতে চাইলেন: এ যে চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে বসে খাওয়ার মত ভুল করছ মা! ধর্ম কি আছে—থাকলে এমন কাণ্ড হয় কখনো?

এই সময় নূতন ব্রহ্মচারী রবি এসে সেখানে দাঁড়াল, এখনো তার গৈরিক বেশ, হাতে দণ্ড, মুণ্ডিত মস্তকের উপর এই কয়মাসে কেশোদ্গম হয়েছে মাত্র। দণ্ডী-ঘরে সেই দুঃসংবাদ শুনে অবধি রবি সঙ্কল্প করেছে, প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত—সে দণ্ডধারী ব্রহ্মচারীরূপে ধর্মের কাছে তার ধার্মিক পিতার মুক্তি কামনা করবে। এই সূত্রেই সে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল: কিন্তু আমার ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস মশাই, ধর্মকে জাগিয়ে তোলা, আমার মহাপুরুষ বাবা যে খুনি নন, আইন তাঁকে শাস্তি দিলেও ধর্ম তাঁকে মুক্তি দেবেন—এই বিশ্বাস বুকে ধরে আমি করবো ধর্মের সাধনা। এই দৃঢ়চেতা কিশোরের মুখে এমন তেজোদৃপ্ত সঙ্কল্পবাক্য শুনে যুগল মোক্তারের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল, মুখ দিয়ে আর কোন কথা নির্গত হলো না।

তৃতীয় পর্ব

সিদ্ধিনাথ দাসের অপমৃত্যু সম্পর্কে দাস ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কারাদণ্ডের পর আরো দেড়টি বছর অতীত হয়েছে। এতদিন একটানা গভীর শোকাচ্ছন্ন ভাবের পর একদা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে দাস-বাড়ীর অন্দর-মহল সহসা শঙ্খঘণ্টা হুলুধ্বনির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখবর সদর মহল ও সমগ্র শিবনগর পল্লীটিকে পুলকচঞ্চল করে তুলল।

অন্দরমহলের দালানে কতকগুলি মেয়ে শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অচলা ঘরের ভিতর থেকে দরজার কাছে এসে বললেন :

অচলা : ওরে খোকা হয়েছে—খোকা। কোলজোড়া ছেলে—চাঁদ-পানা মুখ! একটুও কষ্ট দেয়নি। শাঁখ বাজা—হুলু দে—কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে বল্—সকলকে খবর দে!

বহু কণ্ঠে কলরব উঠল : ছেলে হয়েছে—ছেলে হয়েছে—

শাঁখ বাজাতে লাগল মেয়েরা ; কেউ কেউ হুলু দিল ; ভিতর থেকে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল।

নীচের তলায় কৈলাস চাকরকে ব্যস্তভাবে হাঁকডাক করতে দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য দাসদাসীরা সানন্দে শুনছে তার কথা।

কৈলাস : খোকা হয়েছে—ছোটবাবুর খোকা হয়েছে। বড়মা বললেন—মোণ্ডা দিয়ে হরির লুঠ দেবেন—বাড়ী বাড়ী মিষ্টি বিলুতে হবে।—ওরে চল্—শীগ্‌গীর চল্—

বহুকণ্ঠে : খোকা হয়েছে—ছোটবাবুর খোকা হয়েছে।

দাস বাড়ীর বৈঠকখানা। ফরাসে সিদ্ধিনাথের স্থানে যুগল মোক্তার বসে সটকা টানছেন; সামনে গোবর্দ্ধনও তারক। যুগল বাবুর এখন চেহারা বদলে গেছে—গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী চুনট করা, মিহি কালাপাড়, কাঁচি ধুতির কোঁচার বাহার। কৈলাস ও আর এক চাকর থালায় সাজানো খাবার রাখছে তাঁদের সামনে।

যুগল : ব্যাপার কি কৈলেস! এ সব কি?

কৈলাস : এজ্ঞে, বড় মার কাণ্ড! দেড় বছর পরে নিরানন্দ পুরীতে আনন্দ নিয়ে এলেন নতুন খোকা—তেনার আহ্লাদ আর ধরে না গো মামাবাবু!···মিষ্টিমুখ করেন তো আগে।

যুগল : যাক্—দুগ্যা ছেলে বিয়োতে বড় মেয়ে তাহলে খুব খুশি হয়েছেন বল?

কৈলাস : সেই থেকে বড় মার মুখে কেউ কি আর হাসি দেখেছিল গো মামাবাবু—আজ তেনার কি আনন্দ!

এই সময় ভূতনাথ নীরবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

যুগল : ভাল, ভাল!—এই যে বাবাজী এসো! হ্যাঁ, তাই বলছিলুম, দুগ্যার খোকা হয়েছে—আমারই খাওয়াবার কথা, তা তোমার বড় মার কাণ্ড দেখ না! আমরা কিন্তু বাবাজী আগে জানতেই পারিনি যে—

ভূতনাথ : কাউকে জানতে দিয়েছিল নাকি? আপনার ভাগনীর কথা আর বলবেন না—শোকের বাড়ীতে ছেলে হওয়ার আনন্দ ওঁর পছন্দ নয়, তাই চেপে রেখেছিলেন—জানাতে চাননি। ভাগ্যিস বৌমা—

যুগল : বাস্—বাস্। বউমার ঘাড়েই এ ঝক্কি চাপিয়ে দাও বাবাজী—উনিই পেট থেকে টেনে বার করেছেন, ওঁরই কোলে তুলে দাও—টান পড়ুক, মায়া বাড়ুক—বুঝেছ বাবাজী কথাটা ?

* *

*

ভাস্করের বাড়ীর দালান। তার পাশেই ঠাকুর ঘর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্রহ্মচারী রবি ঠাকুর ঘরে বসে কোশাকুশি নিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করছে। দরজার কাছে বসে আরতি দেখছেন। এমন সময় কৈলাস এলো—হেঁট হয়ে খাবারের হাঁড়িটি এগিয়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠুকে গড় করল।

আরতি : কে—কৈলেস ! একি বাবা ?

কৈলাস : বড় মা পেঠিয়ে দিলেন গো মা-ঠাকরোন ! আপনি শুনে আহ্লাদ কর গো—ছোট মা'র খোকা হয়েছে।

আরতি : তাই নাকি ? কিন্তু কিচ্ছু শুনিনি তো—

কৈলাস : শোনবার রাস্তা যে ছোট মা বন্ধ করে রেখেছিল মা'ঠাকরুণ। বাড়ীতে শোক দুঃখু—আর উনি ছেলে বিয়োবেন—তাই না কাউকে ক'ননি। কিন্তু একথা কি চাপা কখনো থাকে মা-ঠাকরোন—আজ সন্ধ্যের পর হৈ হৈ কাণ্ড !

আরতি : পাগলি মেয়ে !....কিন্তু কৈলেস, শুধু খবর নিয়েই এলে না কেন বাবা ? আর কি সে দিন আছে যে—

কৈলেস : চোখের জল আজ আর ফেলবেন না মা-ঠাকরোণ—তাতে খোকার অকল্যেণ হবে....বড়মা অনেক করে বলে দিয়েছেন... আপনি যেন মা-ঠাকরোণ আজকের দিনে খোকারে—

আরতি : আশীর্বাদ করতে বলছ বাবা ! কিন্তু কৈলেস, এ অভাগীর

আশীর্বাদের কি কোন ক্ষমতা আছেরে? কত পাপ করেছিলুম তাই'''তারই শাস্তি ভোগ করছি। আজকের দিনে এই কথাই বলি—দুর্গার পুণ্যে ওর ছেলে যেন জেঠার মতন মন পায়।

কৈলাস: তুমি যে মন বুঝে মোক্ষম আশীর্বাদ করলে মা-ঠাকরুণ! জানো—ছেলে দেখে সবাই এক বাক্যিতে বলছেন, বড়বাবুই ফিরে এয়েছেন গো!

ঠাকুর ঘরের ভিতর থেকে এই সময় ব্রহ্মচারী রবি ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে বলল: আসতেই হবে কৈলেস দা—এ যে ধর্মের ইচ্ছা; আমার নালিশ তাঁকে শুনতেই হবে।

বলতে বলতে রবি মাতৃচরণে নত হয়ে প্রণাম করল।

দাস-বাড়ী—আঁতুর ঘর। নবজাত খোকাকে নিয়ে মেয়েরা আনন্দ করছে। অচলা, দুর্গা, আরো অনেকে।

জনৈক মহিলা: বড়বাবুর মুখখানা একেবারে কেটে বসিয়ে দেছে গো বড় মেয়ে।

আর একজন: তাইত—ঠিক সেই রকম মুখের ছাঁদ, তেমনি নাক, চোখ। মায়া কাটাতে না পেরে সংসারের মধ্যে ফের ফিরে এয়েছেন গো!

অচলা শিউরে ওঠেন। দুর্গাও তাঁর মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

•

ভূতনাথের ঘর। একটু রাত হয়েছে। ভূতনাথ খাটের উপর বসে ভাবতে ভাবতে সিগারেট টানছে। দুর্গা আচম্বিতে ঘরে ঢুকে

ভূতনাথকে দেখেই চমকে উঠে মাথার আঁচল একটু টেনে দিয়ে—দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল :

দুর্গা : কখন এসেছ ?

ভূতনাথ : দেখতেই পাচ্ছ—এসেই সিগারেট ধরিয়েছি, টানতে টানতে বারো আনা শেষ করে ফেলেছি ; তাহলেই বোঝ কখন এসেছি।

দুর্গা : ডাকনি কেন !

ভূতনাথ : দরকার বুঝিনি। আচ্ছা, ছেলের মা হয়েছ—অথচ কোলে যে ছেলে নেই ?

দুর্গা : ছেলেকে আমি বিয়িয়েছি বইত নয়—সে এখন জেঠাইয়ের গলার হার হয়েছে।

ভূতনাথ : ভালই তো—তোমার মেহন্নত বেঁচে গেছে ; ছেলে বইতে হয় না। মামাবাবু গোড়াতেই একথা বলেছিলেন কিন্তু।

দুর্গা : কি কথা ?

ভূতনাথ : বলেছিলেন—বড় মার ঘাড়েই ও ঝক্কি চাপিয়ে দিতে—যাতে টান পড়ে, মায়া বাড়ে—বুঝেছ ?

দুর্গা : মামাবাবুর কথা তুমি আমাকে ব'লো না—যেদিন থেকে উনি তোমার ঘাড়ে রাহুর মতন চেপে বসেছেন—

ভূতনাথ : মুখ সামলে !—আমি দেখছি—ছেলের মা হয়ে অবধি তোমার সাহসটা হঠাৎ বেড়ে গেছে ! কিন্তু তুমি জেনে রেখ—মামাবাবুর চেয়ে তুমি বা তোমার ছেলে আমার বেশী আপনার নয় ! আর, ও ছেলের ওপরে আমার কোন মায়া মমতাও পড়েনি !

দুর্গা : বাপ হয়ে তুমি একথা—

ভূতনাথ : (দাবড়ি দিল জোরে)—থামো।

* *

*

দাস-ফ্যাক্টরী—আফিসের খাস কামরা। যে ঘরে সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর পাশাপাশি বসতেন, এখন সেখানে একটা সিটই দেখা যাচ্ছে—একখানি নূতন রিভলভিং চেয়ার। সে আসনে বসেন যুগল মোক্তার। মোক্তারীর উপর তিনি এখন দাস ফ্যাক্টরী পরিচালনা করেন। একটু তফাতে গোবর্দ্ধনের সিটে ভাস্করের চেয়ার। তারককে আফিসে আবার বাহাল করা হয়েছে—সেয়ারের ব্যাপারেই সে চাকরী পেয়েছে। তখনো যুগল মোক্তার আসেন নাই। কতকগুলি সেয়ার সম্পর্কে তারক গোবর্দ্ধনের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে :

তারক : বিশ্বকর্মা আয়রণ ওয়ার্কসের সেয়ারগুলো কি তাহলে নেওয়া পাকা হলো স্যার ?

গোবর্দ্ধন : নিশ্চয়—আজই ভুক্তান হবার কথা। কর্তা সেই তালেই গেছেন।

তারক : এখন ভাবছি স্যার, ছোটবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে সেয়ারের কাজ করছিলেন—এটা জেনেও বলিনি বলে, আমার চাকরী গিয়েছিল। আর—আজ সেই আফিসে বসে খোলাখুলি ভাবে সেয়ারের কাজ করছি।

গোবর্দ্ধন : বসুন—আর যা বলি—শুনুন।.......

সামনের চেয়ারে তারক বসল ; গোবর্দ্ধন বলতে লাগল :

হুঁ—আপনার সেই চাকরী যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস মশাই পাকে প্রকারে জড়িয়ে ছিলেন, সে তো

জানতেন। তাই না—সেই ডামাডোলের পর উনি দাস ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর হয়েই—আগে আপনাকে কাজে বাহাল করলেন, সেই সঙ্গে ঐ সেয়ারের কাজই দিলেন আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে।

তারক : আমার প্রতি ওঁর যথেষ্ট দয়া।

গোবর্দ্ধন : এখন আপনারও উচিত হচ্ছে তারকবাবু, ওঁর মন যুগিয়ে চলা। দেখুন, এই সেয়ার কেনার ব্যাপারে অনেক কিছুই আপনার নজরে পড়বে—কিন্তু তাই নিয়ে যেন ছোট বাবুর কাছে ফফোর-দালালী করতে যাবেন না—তাহলেই মরবেন। কথা বুঝেছেন আমার ?

তারক : আজ্ঞে হ্যাঁ—আর বলতে হবে না।

গোবর্দ্ধন : দেখুন, ওঁদের আমলে ছোটবাবুকে যখন সেয়ার মার্কেটে নিয়ে গিয়ে মৌতাত ধরানো হয়, তখন—ও-ব্যাপারটা যে লাভের, সেটা জানাবার জন্যেই নিজের ট্যাঁক থেকে বিশ্বাস মশাইকে ক্ষেপে ক্ষেপে বিস্তর টাকা বার করে ছোট বাবুর বিশ্বাসটাকে বজায় রাখতে হয়েছিল। এখন উনি যদি সেগুলো সুদ শুদ্ধ উসুল করে নিতে উল্টো চাপ দেন—বলবার কিছু আছে ?

তারক : কিছু না, কিছু না। আমাকে আর বোঝাতে হবে না স্যার! ছোটবাবু, জিজ্ঞেস করলেই আমি বলব—সেয়ার না সোনার পাহাড়!

গোবর্দ্ধন : বাস্—তাহলে আপনার চাকরী মারে কে!

ইতিমধ্যে সিদ্ধিনাথ নেমে এসে নত হয়ে ভাস্করকে প্রণাম করলেন। ভাস্কর প্রিয় বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কথাগুলি বললেন।

সিদ্ধিনাথ: একবারে সঙ্গীন সময়ে এসে পড়েছ। চল ভাই চল; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—অনেক পরামর্শ—তোমাকে পেয়ে যেন ·· চল, চল—

সিদ্ধিনাথ সোল্লাসে প্রিয়বন্ধুকে নিবিড়ভাবে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

* *
*

লম্বা টানা বৈঠকখানা। সেকেলে আসবাবপত্র স্থানে স্থানে। ঢালা বিছানা তক্তপোষের উপর। সারিবন্দী তাকিয়া। টানাপাখা ঝুলছে। প্রকাণ্ড একটা ঝাঁড়। দেওয়ালে দেয়ালগিরি। তবে শীতের সকাল বলে পাখা চলছে না।

সিদ্ধিনাথ: অডিটার গুপ্তর ষ্টেটমেন্টটা দেখে সবই বুঝেছ! বাবার আমলে গোড়া থেকেই ভাঙন ধরেছিল—চোখ বুজিয়ে খালি খরচ করেই গেছেন। যারাই তাঁর কাছে হাত পেতেছে, দায় জানিয়েছে, কাউকে 'না' বলেননি। তারপর—বারো মাসে তেরো পর্ব, আত্মীয়পোষণ, বাড়ীতে নিত্যই উৎসব এলাহিকাণ্ড! এতে কুবেরের ভাঁড়ারও ফুরিয়ে যায়।

ভাস্কর: তা'বলে একথা আমি মানব না সিধু। তোমার প্রপিতামহের আমল থেকে এই কারখানার চাকা ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব সদ্ব্যয়ও হয়ে এসেছে। সার্থক জীবনের এই ত লক্ষণ হে! মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের দেখ—কারবারের আয় থেকে

দাস ফ্যাক্টরীর এক অংশ। ভিতরের দিকে একটা সংযোগস্থল। সেই খালি জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে কর্মচারীরা জটলা করছিল :

১ম : না—চাকরী করা এখানে আর পোষাবে না দেখছি! যে সব সুখ সুবিধা ছিল—সব যেতে বসেছে।

২য় : যা নিয়ে কারবার—সে দিকে কারুর নজরই নেই—সেয়ার নিয়ে সবাই মেতেছেন—রাতারাতি লাল হবার ফিকির। কিন্তু এ থেকেই যে লাল বাতি জ্বলে, সে খবর কেউ রাখেন না!

৩য় : চুলোয় যাক ওসব—যা ইচ্ছে করুকগে; আমাদের পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিলে তো কোন কথা হয় না!

৪র্থ : পয়লা বছর অত বড় সর্বনাশ হলো, আমরাও চুপ করে-ছিলুম। কিন্তু এ-বছরে বোনাস দেবে না কেন? ছেলের ভাতে দশ হাজার টাকা খরচ হলো, অথচ—আমাদের বেলায় টু টু; বোনাস্ দেওয়া হবে না। কেন হবে না?

সাবেক আমলের প্রবীণ কর্মচারী ইয়াসিন সরদার এই সময় এগিয়ে এসে বলল :

ইয়াসিন : তাহলে হক কথা কইরে বাপু শোন্—সিধুবাবুর আমলে কারবার লোকসান খাচ্ছে দেখে উনি বাড়ীর পাল পার্বণ সব বন্ধ করে দ্যান, তবু কারখানার কাউকে ছাঁটেননি। সেই পুণ্যিতেই ওনার কারবার আবার ফেঁপে ওঠে—তেমনি লায়েক আদমীও পেয়েছিলেন গাঙ্গুলী বাবুরে। তারপর আমাদের বরাতে কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল, তার হদিসই পেলুম না! নসীব, নসীব।

১ম : তাইত—কি মনিব ছিলেন, আর এখন কি মনিব এসেছেন!

ছোট বাবুর যে রকম তিরিক্ষি মেজাজ—কে বলবে যে উনি আমাদের সাবেক মনিবের ভাই !

২য় : আরে—ভাই, ঐ শালার মামাবাবু এসে তো ওঁকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে—যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে ঐ বুড়ো সয়তান—

বাহির থেকে পরিচিত পদধ্বনি শুনেই সকলে সতর্ক হলো।

৩য় : এই চুপ—ছোটবাবুর জুতোর শব্দ··আসছেন····এখানে একসঙ্গে দেখলেই—চল্ সরে পড়ি।

সকলেই ক্ষিপ্রপদে সরে গেল। সিগারেট টানতে টানতে ভূতনাথ এই পথ দিয়ে তার ঘরের দিকে গেল।

ভূতনাথের ঘর। কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ও-ঘরে সিদ্ধিনাথ যে চওড়া চেয়ারে বসতেন—সেই চেয়ারখানা এই ঘরে এনে ভূতনাথের সিটে দেওয়া হয়েছে। ভূতনাথ চেয়ারে বসেই টেবিলের উপরে পাশাপাশি রাখা দুটো ফাইল নেড়ে চেড়ে দেখল। একটার কভারের উপরে লেখা রয়েছে—"সেয়ার বণ্ডস্"। আর একটায় লেখা—"টেণ্ডার্স ফাইল"। সেয়ার বণ্ডস্গুলো ফাইল থেকে খুলে খুলে সে দেখল—একই রকমের কতক ছাপানো ও কতক টাইপ করা বণ্ডস্।—চুপ করে একটু ভাবলো; তারপর ফাইলে রেখে ফিতে দিয়ে বাঁধল। মুখ দেখে মনে হলো—মনটা প্রসন্ন নয়। এর পর টেণ্ডার্স ফাইলটি খুলে—ছাপানো ক্রমে টাইপ করা ও নীচে লাল কালিতে মন্তব্য লেখা এক একখানা টেণ্ডার-সীট দেখে, আর ভ্রূকুঞ্চিত করে; পড়তে পড়তে এবং একই ধরনের মন্তব্য দেখে তার সমস্ত মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে। কোন রকমে টেণ্ডারগুলো ফাইলে রেখে সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল :

ভূতনাথ : ননসেন্স—

সঙ্গে সঙ্গে বেল টিপতেই বেয়ারা ছুটে এসে প্রণাম করল।

ভূতনাথ: মামাবাবু হ্যায়?

বেয়ারা: জী—হুজুর!

ভূতনাথ অমনি তড়াক করে উঠে দুটো ফাইল তুলে নিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ চলন-ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আফিস ঘর বা কর্তৃপক্ষের খাস কামরা। এ-ঘর থেকে সিদ্ধিনাথের চেয়ারখানি ভূতনাথের ঘরে পাঠিয়ে এখানে একখানি খুব দামী রিভলভিং চেয়ার এসেছে। সেখানে বসেছেন যুগল মোক্তার। খানিকটা তফাতে গোবর্দ্ধন ভাস্করের চেয়ারে বসে কাজ করছে। সিদ্ধিনাথের আমলে দু'খানি চেয়ার প্রায় পাশাপাশি ছিল। এখন ম্যানেজারের চেয়ার তফাতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভূতনাথ হাতের ফাইল দুটো যুগল বাবুর টেবিলের উপর রেখে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করছে—আলোচ্য প্রসঙ্গে আপত্তি থাকলেও বলবার ভঙ্গি ও স্বর নম্র এবং বিনীত।

ভূতনাথ: সেকি মামা বাবু, একটা কোম্পানীর এতগুলো সেয়ারের দাম এক সঙ্গে এক চেকে—

যুগল: এইটিই দস্তুর বাবাজী—যতগুলো সেয়ার কিনবে, তার পেমেণ্ট এক চেকেই হওয়া উচিত। তা, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন শুনি?

ভূতনাথ: বৌমার কাছে কে লাগিয়েছে—আমি নাকি কারখানার কাজকর্ম ঠেলে ফেলে সেয়ার নিয়েই মেতেছি। এখন আপনিই বলুন—এর পর এই মোটা টাকা ঐ বাবদে পেমেণ্ট হয়েছে শুনলে…বৌমা—

যুগল মোক্তারের চোখের সঙ্গে ভূতনাথের চোখের দৃষ্টি মিশতেই তার ভঙ্গি দেখে ভূতনাথের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

যুগল : এ! তুমি এখনো দেখছি তেমনি ছেলে মানুষ আছ বাবাজী! চোখের সামনে এত বড় একটা পরিবর্তনেও তোমার কিছু বদলায় নি? এখনো কাজ কর্মের ব্যাপারে তোমার ঐ বৌমা—তাঁর কাছে জবাবদিহির ভাবনা! য়্যাঁ—হাসালে বাবাজী। ও সব—ভুলে যাও, ভুলে যাও; তুড়ি দিয়ে সরিয়ে দাও। জিজ্ঞেস করলে বলবে—এও একটা বিজনেস, আর—সেরা বিজনেস। এই যে সেবার তোমার ছেলের ভাতে বৌমা দশ হাজার টাকা খরচ করলেন—আমি টুঁ শব্দটি করেছিলুম? তবে তিনি বাইরের ব্যাপারে কথা বলবেন কেন? হ্যাঁ—আর কি বলছিলে বাবাজী?

ভূতনাথ : এই ফাইলটা দেখেছেন?

যুগল : আমি না দেখলে—তোমার কাছে ও ফাইল যায়? টেণ্ডার-গুলো য়্যাকসেপ্ট হয়নি বলে বুঝি—

ভূতনাথ : দেখুন—ওঁরা থাকতে আমরা যে সব টেণ্ডার পাঠাতাম, নব্বুই পার্সেণ্ট মঞ্জুর হয়ে আসত। কিন্তু চেক করে এখন দেখুন—১৭ খানা টেণ্ডারের মধ্যে দুটো মঞ্জুর হয়েছে—তাও ছোট ছোট; বাকি সবগুলো বাতিল করে যেভাবে রিমার্ক করেছে খুবই লজ্জার কথা। আমি ভেবে পাচ্ছি না মামাবাবু—

যুগল : আমি যতক্ষণ আছি বাবাজী, তোমার ভাবনার কিছু নেই। আর, এটাও মনে রাখবে—বিজনেস করতে বসে লজ্জা ভয় মন থেকে ছেঁটে ফেলতে হয়। যাক্—তুমি চেয়ারে বসে

মউজ্জ করগে—দেখবে এরপর আপসে এইসব টেণ্ডার ফিরে আসবে···

তনাথ : বলেন কি ! কি করে ?

লে : হেঁ হেঁ হেঁ—উল্টো রাস্তা ধরে ! হ্যাঁ, তবে খরচ কিছু করতে হবে, সোজা আঙুলে কি ঘী ওঠে বাবাজী ! এখন মাথা ঠাণ্ডা হলো ত ?

* *
*

দাস-বাড়ীর উঠান। অপরাহ্ন কাল। কৈলাস চাকর ঠেলা গাড়ীতে তনাথের ছেলে সত্যনাথকে বসিয়ে উঠানময় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চলাই খোকার নাম রেখেছেন সত্যনাথ। ছেলের বাবা অচলাকে বৌমা লে। ছেলে অচলাকে 'বৌ' বলে ডাকে। দুবছরের ছেলে—যে রকম াধ আধ স্বরে কথা বলা সম্ভব, তার চেয়েও এ যেন আরো বেশী স্পষ্ট থা বলে। গাড়ীতে বসে ছেলে দেখতে পেল—বারাণ্ডা থেকে অচলা । দুর্গা তাকে দেখছে। সেও অমনি করতালি দিয়ে সহাস্যে বলে উঠল :

ত্যনাথ : বৌ! এই দ্যাখ—কেমন গলি চলছি !

কলাস : শুহুন গো বৌমা—খোকাবাবুর কথা।

এই সময় ভূতনাথ ও তারক দেউড়ী দিয়ে সেখানে এল। ভূতনাথ রককে বলল :

তনাথ : বৈঠকখানায় ব'স্—আমি এখনি আসছি।

তারক বারাণ্ডায় উঠে বৈঠকখানায় গেল—ভূতনাথ সিঁড়ি দিয়ে পরে উঠতে লাগল। কৈলাস গাড়ী টানতে টানতে খোকাকে জ্ঞাসা করল :

কৈলাস : উনি কে খোকাবাবু ?

সত্যনাথ : ভূ—তো।

কৈলাস : বড়মা—শুনছেন ?

দালানে অচলার সঙ্গে ভূতনাথের দেখা হলো। দুর্গাও মাথায় ঘোমটা টেনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অচলা : তুই কি হচ্ছিস দিনকের দিন ভূতো—প্রাণে একটুও দয়া মায়া, কি মনে কিছু সাধ আহ্লাদও নেই ?

ভূতনাথ : কেন—কি করিছি আমি ?

অচলা : গাড়ী চড়ে খোকার কি আহ্লাদ—সবাই দেখছে ; তুই একটু দাঁড়িয়ে একবারটি চেয়েও দেখলিনি ?

ভূতনাথ : এই কথা! তা তোমরা তো দেখছ—তাহলেই হবে। আমার অত সখ নেই, সময় নেই ; আর যা বললে বৌমা—মায়া দয়ার ধারও ধারিনে আমি।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই ভূতনাথ গট্‌গট্‌ করে চলে গেল। দুর্গা আবার ঘোমটা একটু নামিয়ে নীচু গলায় বলল :

দুর্গা : দিদি শুনলেন! এমনি হয়েছে আজকাল! আপনাকে খোকা বৌ বলে, তাতে আপনি কত আহ্লাদ করেন আর ওঁকে একদিন নাম ধরে যেই ডেকেছে—এটুকু ছেলে.... ঠাস করে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দিলে দিদি!

অচলা : বলিস্ কি ? খোকাকে মেরেছে ভূতো! রোস্ তো!

দুর্গা : দোহাই দিদি, এখন ওকথা তুলবেন না, তা হলে আমার পিণ্ডি চটকাবে।

অচলা : আচ্ছা আমিও তকে তক্কে রইলুম—আমার চোখে একবার পড়লে হয়। আমি ওর তিরিক্ষি ভাব বার করছি!

শিশু সত্যনাথের এইটিই বড় খেলা এবং এই খেলাতেই সে প্রচুর আনন্দ পায়। গাড়ীর চালক ও সাথী কৈলাস। খেলার এই গতির সঙ্গে বয়সের তালে তালে তার জীবনের গতিও বাড়তে থাকে।

পাঁচ বছর বয়স হতেই বালকের দৈনিক আয়তনবৃদ্ধির অনুপাতে সাবেক গাড়ী বদলাতে হয়েছে। অচলা তার জন্য একখানি বড় সড় প্যারাম্বুলেটার গাড়ী কিনে দিয়েছেন। সেই গাড়ীতে এখন খোকাবাবুর ভ্রমণ চলে। গাড়ীতে বসে সত্যনাথ জোর গলায় বলে : কৈলেস, আরো জোরে—আরো জোরে! বয়সের তুলনায় সত্যনাথকে যেমন অপেক্ষাকৃত বড় সড় দেখায়, তেমনি তার ভাব ভঙ্গি ও কথাবার্তার বৈচিত্র বাড়ীশুদ্ধ সকলকে অবাক করে দেয়। এই পাঁচবছরে সংসারের কোন দিকে কোনরূপ পরিবর্তন বা অশান্তির আভাস পড়ে নাই সুগৃহিণী অচলার নিপুণ পরিচালনার জন্য—অতিযত্নে তিনি সাংসারিক শান্তি বজায় রেখেছেন।

কিন্তু সিদ্ধিনাথ ও ভাস্করের আমলের বিরাট কারখানাটি যুগল মোক্তারের পরিচালনাধীনে এই পাঁচ বৎসরে দ্রুতগতিতে কিভাবে সব দিক দিয়েই অবনতির পথে নেমে চলেছে, তার কিঞ্চিৎ আভাস আগেই পাওয়া গেছে এবং কারখানার কর্মীদের সংলাপে আরও অনেক কিছু প্রকাশ পাবে।

সেদিন অপরাহ্নের দিকে কারখানার একাংশে কর্মচারীরা দলপুষ্ট হয়ে উদ্ধতভাবে আলোচনা করছিল :

১ম: আমরা কি বুঝিনে—ঐ কালনিমে মামা রাহুর মত এসে—স
সাবড়ে দিলে।

২য়: তাইত! কি ডাঁট ছিল এই কারখানার—কত নাম ডাব
মামা এসে পাঁচ বছরেই কি হাল করে তুলেছে দেখনা!

৩য়: বোনাসের পাট তুলেই দিলে—

৪র্থ: আরে, বোনাস দেবে কোথা থেকে? কাজও হচ্ছে—মেশিনও
চলছে—কিন্তু কাজের পড়তা খতিয়ে দেখেছ? মোটা
ঘুষ দিয়ে টেন্ডারের কাজ এনে লাভ থাকে? তার ওপর
পুকুর চুরিতো…

এদের মধ্য থেকে খুব পুরাতন প্রবীণ কর্মচারী সাবেক আমলের ইয়াসিন সরদার এইসময় এগিয়ে এসে বলল:

ইয়াসিন: আরে ভাইসব—বোনাস এখন দরিয়ায় থোও—মাইনে গণ্ডাই
মাস মাস পাও কিনা ছাখো…গেলো মাসে দশ তারিখে
জায়গায় সতেরো তারিখ হয়েছে, সে খেয়াল আছে
কারখানা হয়ে ইস্তক এর নসীবে যা কখনো হয়নি
ভাই!

পরিচিত পদশব্দে সচকিত হয়ে জনৈক কর্মচারী চাপা গলায় বলল:

১ম: চুপ্ চুপ্—ছোটবাবু এসে পড়েছে; শুনতে পাবে…

২য়: আসুক ছোটবাবু—শুনুক—ভয় কিসের…

ভূতনাথ এইসময় সিগারেট টানতে টানতে গট্ গট্ করে এসে থমকে দাঁড়াল—চোখ পাকিয়ে বলল:

ভূতনাথ: কি হচ্ছে এখানে… কাজ ফেলে জটলা চলেছে বুঝি
যাও এখান থেকে—

কারিগরেরা প্রথমটা জবাব দেবার জন্যে উসখুস্ করল; কি

ইয়াসিনের ইশারার সঙ্গে নিরস্ত হয়ে পায়ে পায়ে চলে গেল সুড় সুড় করে। সে দিকে তাকিয়ে ভূতনাথ বলল :

ভূতনাথ : হামবাগ্ সব—

ভূতনাথ এখান থেকে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল, তারক তার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে। ভূতনাথকে দেখেই তারক বলল :

তারক : ব্যাপার কি—তোমার সামনে পড়ে গেছে বুঝি ?

ভূতনাথ : দেখনা—কাজ ফেলে বাইরে এসে জটলা করা হচ্ছে।

তারক : মামাবাবুর আমল আরম্ভ হতে পাঁচ বছর ধরেই এটা চলছে, আর ক্রমশঃই বাড়ছে। ওদের প্রথম কথা হচ্ছে—বোনাস পাচ্ছে না পাঁচ বছর ধরে···

ভূতনাথ : হুঁ বোনাস দেবে! লাভের তো সীমা নেই—বোনাস্!

তারক : ওরা বলে—কারখানার চাকা ঘুরলেই লাভ। তবে কর্তারা যদি চাকা ঘোরাবার খরচায় লোকসান করেন, আমাদের কি দোষ ?

ভূতনাথ : থাক্—তুমি আর ওদের হয়ে ওকালতি ক'রনা—

তারক : আমি ওকালতি করিনি, বরং কারখানার বিপক্ষেই বলছি—ওতে মজা নেই। এই গ্যাখনা—মামাবাবু মাথা খেলিয়ে পয়সা ঢেলে টেণ্ডার তো আনছেন, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে। এর চেয়ে সেয়ারের ব্যাপার ঢের ঢের ভালো—

ভূতনাথ : তুই বলছিস্ একথা ?

তারক : জোরগলায় বলছি। কি দরকার এই সব ছোটলোকদের তোষামদ করে কলের চাকা ঘুরিয়ে—যদি আপসে টাকা আসে ? জানো—মামাবাবুর চেষ্টায় আজ তোমার ঘরের

মধ্যে কত সব কারবারের ইষ্টিকবজ জড়ো হয়ে আছে? ২৭
লাখ টাকার সেয়ারের আজ মালিক তুমি!

ভূতনাথ স্তব্ধভাবে নীরবে চেয়ে থাকে।

তারক: চুলোয় যাক তোমার ফ্যাক্টরী আর তার কারিগরদের দেমাক; বেঁচে থাকুক—সেয়ার মার্কেট।

* *

*

দাস-বাড়ীর অন্দর মহল। অচলার ঘর। অচলা ও দুর্গা। বিছানার উপর খোকা সত্যনাথ ঘুমাচ্ছে—রাত্রির প্রথম দিক।

অচলা: ছেলে যে সারারাত আমার কাছে থাকে, তোর মন কেমন করে না?

দুর্গা: আজ নতুন নাকি—আঁতুর থেকে উঠেই তো খোকা আপনার কাছে শুচ্ছে। বাবা! যে মনিষ্যি, বিছানায় শুলে এক কাণ্ড করতেন!

অচলা: তুই ও-সব কথা বলিস্‌নি বাপু—বাপ আবার ছেলেকে দেখতে পারে না! এরকম কথা তো কখনো শুনিনি।

দুর্গা: বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না দিদি, কিন্তু উনি যে মনিষ্যি—ছেলেকে দেখতে পারেন না, কাছে এলেই বেজার হন। দেখছেন তো, যত বড় হচ্ছে—ছেলের মুখে কিরকম পাকা পাকা কথা! কিন্তু ওঁকে দেখেছে তো—চোখ পাকিয়ে অমনি নাম ধরে ডাকবেই, আমি তো দিদি ছেলের মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোন রকম করে সামলাই। সেইজন্যেই তো ওঁর ত্রিসীমায় নিয়ে যেতে চাই না।

অচলা: এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড কখন দেখিনি বাপু! ছেলেবেলা থেকে

ওঁরা বড় বড় ধর্মশালা চালাচ্ছেন; কতরকম সৎকাজে কত টাকা খরচ করছেন!

সিদ্ধিনাথ: তা ঠিক। কিন্তু বলতে পারো ভাই, আমাদের বেলায় উল্টো হয় কেন?

ভাস্কর: তার কারণ—আমরা উল্টো রাস্তা ধরে সব গুলিয়ে ফেলি। আয় কমলেই আমরা সব দিকে ছাঁটাই করতে ব্যস্ত হই, কিন্তু আয় বাড়াবার কথা ভুলে যাই। এখন যদি আমার পরামর্শ চাও সিধু, আমি বলব—কারবার তুলে দেবার কিম্বা ছাঁটাই করবার দিক দিয়েও যাওয়া হবে না। কাজ, কাজ, কাজ বাড়াতে হবে, তাহলেই সামলে উঠবে।

সিদ্ধনাথ: আশ্চর্য্য! অডিটারের ষ্টেটমেণ্ট দেখেও তুমি একথা বলছ! আর কেউ হলে আমি বলতাম—হামবাগ্!

ভাস্কর: হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক মিলে যাচ্ছে হে সিধু! পাটনা ফ্যাক্টরীর মালিককে যেদিন এই পরামর্শ দিই, শুনে তিনি বলেছিলেন—আমি একটা আস্ত উন্মাদ। কিন্তু সেই পরামর্শ মাফিক্ চলতেই মরা বিজনেস যেই চাঙ্গা হয়ে দাঁড়াল—দশ বছরের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ৩০ লাখে উঠল, তখন এই উন্মাদের কি খাতির! নাম রটিয়ে দিলেন—দৌলত-পয়দা-করনেবালা দেমাগদার! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—দুনিয়ায় এইটিই দস্তুর—সুব শিয়ালের সুরুতে একই রা! হাঃ হাঃ হাঃ!

সিদ্ধিনাথ: তাহলে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—এত বড় ক্রিটিক্যাল সিচুয়েসন থেকে আমাদের বিজনেসটাকেও সেভ্ করা যায়?

ভাস্কর: যায়—যদি এই সিদ্ধান্তে সম্মত হয়ে অখণ্ড বিশ্বাসে আমার হাতে কারবারটি ছেড়ে দিতে পার।

ভূতো আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে, এখন ওর ছেলে হয়েও নিস্কৃতি নেই। ঘরে বাইরে ওকে নিয়ে আমার এমনি জ্বালা।

এই সময় কৈলাস ভৃত্য এসে বলল :

কৈলাস : বড়মা, নীচের বৈঠকখানায় মামাবাবু এসেছেন, ছোটবাবু তেনার তরে চা-জল খাবার পাঠাতে বললেন।

অচলা : চল'—যাই।

মামার নামেই দুর্গার মুখে অন্ধকার যেন ঘনিয়ে আসে।

দাস-বাড়ী। বাহিরের বৈঠকখানা। যুগল মোক্তার ও ভূতনাথ—ফরাসে বসে গল্প করছেন। যুগলবাবু জলখাবার খেতে খেতে বলছেন :

যুগল : আবার এসব হাঙ্গামা করালে কেন বাবাজী—এত রাত্রে কষ্ট দেওয়া।

ভূতনাথ : কষ্ট আবার কি এ তো আনন্দের কথা। রাতও বেশী হয়নি।

কৈলাস : এজ্ঞে—আমাদের বড়মা যেন অন্নপূর্ণে; কিছুতেই ছ্যালেন না। মানুষকে খাওয়াতে ওনার যে কি আনন্দ!

যুগল : সবই ওঁর ভালো বাবাজী, তবে এটা ভারি দুঃখের কথা···শুনতে পাই, পাঁচটা বছর কেটে গেল, তবুও উনি মানতে চান না যে, ভাস্কর ঠাকুরের হাতেই সিধুবাবু মারা পড়েছেন! নয় কি কৈলেস, তুমিই বলনা?

কথাটা শুনেই ভূতনাথ চমকে ওঠে—যুগলবাবু সেটা লক্ষ্য করেন।

কৈলাস : এজ্ঞে, তা আপনি মিছে বলেন নি গো মামাবাবু—বড়মা'র মনে সত্যিই প্রত্যয় মানে নি।

ভূতনাথ : তাহলে বলি মামাবাবু—বৌমার মনে না-মানার ঐ ধারণাটা আপনার ভাগনীই জাগিয়ে দিয়েছে !

যুগল : বল কি বাবাজী !

ভূতনাথ : তবে ইদানীং বড় মা বুঝেছেন তাঁর ঐ ধারণা সত্যি হলে য়্যাদ্দিনে ধর্মের কল বাতাসে নড়ত।

যুগল : হাঃ হাঃ হাঃ এও একটা কথা বটে। ঠিক, ঠিক্ ! হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি বাবাজী। দেখ, এই বয়েসে আর দুরপাল্লার টানা পোড়েন চলেনা বাবাজী, তাই কিনা ও পাড়ার মল্লিকদের বাড়ীখানা আজ কিনে ফেলা গেল—পেমেণ্ট রেজেষ্টারী মায় দখল পর্য্যন্ত সব সেরে ফেলিছি ···

বলেই ভূতনাথের মুখের দিকে তাকালেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তার মনোভাবটি এ-ব্যাপারে জানবার উদ্দেশ্যে।

ভূতনাথ : তাই নাকি ? মল্লিকদের অত বড় বাড়ীখানা আপনি কিনেছেন মামাবাবু ! কই, কিছু শুনিনি তো ?

যুগল : এ-সব কাজ চুপিসাড়ে করতে হয় কিনা বাবাজী—তাই জানাজানি হতে দিইনি ; আর—তুমি তো ঘরের ছেলে, শুধু কি জানা—আনাগোনা থেকে দেখা শোনা তো সব তোমাকেই করতে হবে বাবাজী !

ভূতনাথ : তা—কত টাকা পড়ল ?

যুগল : দরটা একটু বেশী পড়েছে বাবাজী, বাড়ীটা বড়, তাছাড়া বড় রাস্তার ওপর—সাড়ে সতেরো হাজার টাকার দলিল হয়েছে।

ভূতনাথ : সুবিধায় পেয়েছেন মামাবাবু—বেশী পড়েনি !

যুগল : হ্যাঁ, যা বলতে এসেছি—কাল বিকেলে কারখানার সবাইকে

এই উপলক্ষে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছে। আর কৈলেস–তুমি বাপু আমাদের খোকাবাবুকে তার সেই ঠেলা গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে যাবে—তুমিও ওখানে মিষ্টিমুখ করবে, আর বড় মেয়ে ছোট মেয়েদের মিষ্টি নিয়ে আসবে। আমি তাহলে এখন উঠি বাবাজী!

* *

*

দাস-বাড়ী অন্দর মহল। অচলার ঘর। তখনো অপরাহ্ন হয় নাই—রোদের তেজ প্রখর রয়েছে। অচলা সিদ্ধিনাথের সাজসজ্জার অনুকরণে সত্যনাথের জামা কাপড় চাদর তৈরি করিয়েছেন—এখন তাকে সাজাচ্ছেন। দুর্গা মুখ টিপে হাসছে আর দেখছে।

দুর্গা : হ্যাঁরে সত্য–কে তোকে এত করে সাজাচ্ছেন রে?

সত্য : বউ।

দুর্গা : বউ কৈ?

সত্য : এই—যে। (অচলাকে দেখিয়ে দিল)

দুর্গা : ও বউ কার?

সত্য : আমার বউ।

দুর্গা : দিদি—শুন্‌ছেন?

অচলা : শুনিছি—তুই থাম। (কোলে নিলেন)

অচলা : কৈলেস—গাড়ী বার কর। বাবুর সাজা হয়েছে—বেরুবেন।

কৈলাস : যাই বড় মা!

* *

*

শিবনগরের রাস্তা। সিদ্ধিনাথ বাবুর মত সাজসজ্জায় শিশু সত্যনাথ প্যারাম্বুলেটার গাড়ীতে বসে দু'দিক সাগ্রহে দেখতে দেখতে চলেছে। কৈলাস গাড়ী ঠেলে নিয়ে চলেছে কারখানার পথে।

কারখানা কমপাউণ্ডে সারি সারি কয়েকখানি নূতন নূতন মোটর গাড়ী দেখা যাচ্ছে। যুগল মোক্তার, গোবর্দ্ধন, তারক প্রভৃতি এসে গেছেন—ভূতনাথ এখনো কারখানায় আসেনি।....বাইরের একটা এনগেজমেণ্ট সেরে আসবে, কাছাকাছি এসেও পড়েছে। ওদিকে দাস-বাড়ী থেকে কৈলাস-চালিত গাড়ীতে খোকা বাবু আসছে এবং অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

কারখানার সেই নিভৃত খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কর্মচারিগণের একটি বৃহৎ দল জটলা করছে:

১ম: বছর কয়েক আগে—সেই যে দশ তারিখে মাইনে দেবার দিনটা ভেঙে দিলে, তা আর জোড়া লাগল না—ফি মাসে পিছু পেছুতে পেছুতে কোথায় এসে ঠেকেছে এখন? বল?

২য়: আর কি বলিবে ভাই—কাল বাদে পরশু এপ্রেল মাস খতম হবে, আমরা এখনো পর্য্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসের মাইনে পাইনি, দু দশ টাকা করে দিয়েছে—যেন ভিক্ষের মতন...

৩য়: ওদিকে মামা বাবুর বাড়ী কেনা হলো!

৪র্থ: সে আমলে কর্তারা পুরোনো কম্পাস্ গাড়ী চড়েই জীবন কাটালেন,...জলের ঢেউএর মতন তখন টাকা আসত। আর এখন হাওয়ার সনে পাল্লা দিয়ে হাওয়া গাড়ীর গাঁথি লেগেছে। মামাবাবুর গাড়ী—মিনেজার গোবর্দ্ধন বাবুর

গাড়ী—সেয়ার-কিপার তারক বাবুর গাড়ী—আর খোদ বাবুর গাড়ী তো আছেই—

ইয়াসিন : আর ছাখ—সাবেক বাবুর সেই নক্সীমস্ত কম্পাস গাড়ীর কি হাল করে রেখেছে। কেউ এখন ও গাড়ী চাপেনা!

কারখানার এক দিকে আস্তাবোলে সাবেক গাড়ীখানাকে দেখা যায়। তার পাশের ঘরে সেই ঘোড়া।

ইয়াসিন : ছাখনা—বড়বাবুর অত তোয়াজের ঘোড়া এখন ভাল করে খোরাক পায় না, কোচোয়ান মহাঙ্গীর মাইনে পায়না—তাইতো আজ সে বিদেয় নেবার তরে বড় মার কাছে বলতি গ্যাছে!

এই সময় ভূতনাথ অকুস্থলে এসেই সরোষে বলল :

ভূতনাথ : কি হচ্ছে তোমাদের এখানে?

এদিন আর কর্মচারীরা ত্রস্ত হলো না, বরং তাদের মুখ গুলোও শক্ত হয়ে উঠল।

প্রথমেই বৃদ্ধ ইয়াসিন হাত তুলে সেলামের পাঠ সেরে নির্ভীক ও সহজ কণ্ঠেই বলল :

ইয়াসিন : দুঃখের কথা কইছ গো ছোট কর্তা—

ভূতনাথ : এটা কি কথা কয়বার—আড্ডা জামাবার জায়গা নাকি? ভেতরে যাও সকলে—কাজ করগে—

১ম : এও কাজ—বাবু!

ভূতনাথ : কাজ?

১ম : হ্যাঁ। কাজ ফেলে বাইরে এসে কথা বলছি দেখলে আপনারা কাজের গাফলতি করছি ভেবে যেমন ঘাবড়ে যান, কাজের

মজুরীও ঠিক সময় না পেলে আমাদের মন মর্জিও তেমনি বিগড়ে যায়—

২য় : সেই কথাই আমরা বলছিলুম—বুঝেছেন ?

ইয়াসিন : মোদের হক্ কথা গো বাবু!

ভূতনাথ : কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমার মুখের ওপর তকরার ?

৩য় : সে দোষ আমাদের নয় বাবু—দোষ আপনাদেরই।

৪র্থ : বড়বাবু আর ভাস্কর বাবুর আমলে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে কথা কখনো বলিনি—তাঁরাও কেউ কোনদিন চোখ রাঙিয়ে আমাদের পানে তাকান নি।

ইয়াসিন : তেনাদের আমলে বছরে দুটো করে বোনাস পেয়েছি, দশ তারিখে ছুটি পড়লে ন' তারিখে মাইনে মিলেছে।

২য় : আর—আপনাদের আমলে—এপ্রেল মাস খতম হতে চললো, এখনো মার্চ মাসের মাইনে পাইনি—এর ওপর চোখ রাঙাচ্ছেন, কাজ দেখাচ্ছেন—যান্ যান্—

২৷৩ জন সমস্বরে : আগে পাওনা গণ্ডা—তার পর কাজ।

ভূতনাথ : আচ্ছা—এর বিহিত করছি—

ভূতনাথ নিজের ঘরে না গিয়ে সরাসরি যুগল বাবুর ঘরের দিকে দ্রুতপদে চলল।

ইসাসিন : কালনিমে মামার কামরায় গেলেন—ফইজৎ বাধাবার মতলবে। এখুনি তলব পড়বে দেখনা।

১ম : ডাকুক্ না—আজ আর ছেড়ে কথা বলব না—

২য় : হ্যাঁ, হ্যাঁ—হয় এস্পার, নয়—ওসপার্—

আফিসের খাস্-কামরা। যুগল মোক্তার ও গোবর্দ্ধন তাদের আসনে

উপবিষ্ট। তারক উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে কি বলছিল—এমন সময় ভূতনাথকে উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করতে দেখে সাময়িক তৎপরতার সঙ্গে বলল :

তারক : এই যে—ছোট বাবু এসেছেন!

ভূতনাথ প্রবেশ করেই যুগলবাবুর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল ; যুগলবাবু স্নিগ্ধ স্বরেই বললেন :

যুগল : একবারে বিকেল করে ফিরলে যে বাবাজী—খাবার দাবার সব এসে গেছে, তোমার জন্যেই....

ভূতনাথ : খাবার খাইয়ে ওদের আর তোয়াজ করে কাজ নেই মামাবাবু—তার চেয়ে বরং দরোয়ানদের ডেকে আচ্ছা করে চাবকাবার হুকুম দিন।

যুগল : ব্যাপার কি বাবাজী—হয়েছে কি?

ভূতনাথ : কাজকর্ম ফেলে বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল বলে ধমকাতেই আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে দুশো কথা শুনিয়ে দিলে! সাবেক আমলের সুখ মিলছেনা, বোনাস বন্ধ হয়েছে, মাইনে পেতে দেরী হচ্ছে—আমার মুখের ওপর বলতে সাহস পেলে! এত বড় ওদের আস্পর্দ্ধা হয়েছে—

যুগল : এই তো বাবাজী ··দুটো চড়া কথা শুনেই মেজাজ বিগড়ে ফেললে? তাহলে বলি—এ আস্পর্দ্ধা ওরা পেলে কোত্থেকে? যখন তখন সামনে গিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলেই তো তুমি ওদের ভরসা বাড়িয়ে দিয়েছ বাবাজী। আরে—আমি কি ওদের চিনি না? সাধ করে কি ভাতে মারবার ফন্দী বার করেছি? বোনাসের পাট তুলে তো দিয়েছিই · এখন দিই দিই করে মাইনে পর্য্যন্ত ঝাবিয়ে

রেখেছি। কেন বল তো? আর একটা মাস ফেলতে পারলেই…বাস। করুক না গিয়ে নালিশ, সেখানে দশ হাত জল, চিঁড়ের বাইশ ফের দেখিয়ে দেব না?

ভূতনাথ: তা বলে—ওরা যা ইচ্ছে বলবে, আর তাই সইতে হবে?

যুগল: আহাহা—গায়ে তো ফোস্কা পড়ছে না—না হয় সইলে। এই যে খাবার দাবার এনে মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করা হয়েছে—একি সত্যিকার দরদ দিয়ে করছি বাবাজী? এ হচ্ছে মিষ্টি জুতো…এখন লাগবে ভালো, এর পর দেখাব এর গুঁতো। যাক্—তুমি এখন মাথা ঠাণ্ডা করে তোমার ঘরে গিয়ে ব'স দেখি, না হয় একটু ঘুরে এস; আমি ওদের ডেকে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ভূতনাথ: তাহলে আমি একটু ঘুরেই আসি—ওদের মুখদর্শনও আমি করছি নে—আপনি যা করতে হয় করুন।

ভূতনাথ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। যুগল মোক্তার মুখখানার এক নূতন ভঙ্গি করে বললেন:

যুগল: এখনো ছেলেবুদ্ধি যায়নি বাবাজীর! যাক্—তারক, তুমি ওদের এখানে ডাক তো…ভালো ফ্যাসাদ—

* *

*

ভূতনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য পথে ফ্যাক্টরীর দেউড়ীর দিকে গেল। দেউড়ীর ভিতরেই তার মোটর দাঁড়িয়েছিল। নিজেই মোটর চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

কারখানার সেই অংশে কর্মচারীরা তখনো উত্তেজিত ভাবে জটলা করছিল। আর একজন কর্মচারী এসে বলল :

কর্মচারী : শুনচ, ছোটবাবু ও-ঘর থেকে এসেই মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। থানা পুলিস করতে গেলেন না তো?

১ম : যান না—আসুক না পুলিস? কি করবে শুনি?

২য় : তাইত—আমরা কি চোর?

এই সময় তারককে আসতে দেখেই সকলে থেমে গেল। তারক কাছে এসে মোলায়েমভাবে বলল :

তারক : মামাবাবু সব শুনে ছোটবাবুকেই দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। স্পষ্ট বললেন—এতে তাঁকেই অপমান করা হয়েছে। তিনি কোথায় সবাইকে মিষ্টিমুখ করাবেন বলে উসখুস করছেন, আর কিনা উনি এসেই এই কাণ্ড বাধালেন! যাক্—এখন আপনারা চলুন—মামা বাবু ডাকছেন আপনাদের।

কর্মচারীরা প্রথমে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করল, তারপর ইয়াসিনের ইশারায় আফিস ঘরের দিকে নীরবে চলে গেল!

* *

*

ওদিকে কারখানার সামনে কৈলাসবাহিত গাড়ীতে বসে পরিচিত দৃষ্টিতে রাস্তার দুই পাশের সব সাগ্রহে দেখছে শিশু সত্যনাথ। কৈলাস দেউড়ী দিয়ে গাড়ী নিয়ে ঢুকল। পুরাতন নেপালী দারোয়ান মহাবীর হাত তুলে সেলাম করতেই শিশুর মুখে হাসি ফুটল—তারপানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল :

সত্যনাথ : মহাবীর—

কৈলাস : বা-রে! খোকা বাবু তোমার নাম জানলে কি করে!"

মহাবীর : হামিও য়্যাসন ভাবছে। ক্যা তাজ্জব।

সত্যনাথ : কৈলেস—থাম। আমি নামব—

কৈলাস সত্যনাথকে কোলে করে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিল। কৈলাস গাড়ীখানা এক পাশে ঠেলে রাখল। সত্যনাথ চারদিকে তাকাতে তাকাতে কারখানার ভিতরে প্রবেশ করল।

সত্যনাথ : আমি চলব—পা পা করে যাবো কৈলেস!

আফিসের খাস কামরায় তখন যুগল মোক্তারের টেবিলের সামনে পূর্বোক্ত কর্মচারীবর্গ সমবেত হয়েছে। যুগলবাবু অত্যন্ত অমায়িক ভাবে মিষ্ট স্বরে তাদের বুঝাচ্ছেন :

যুগল : আর যে যাই বলুক না কেন—আমি জোর গলায় বলব—দেহের রক্ত জল করে তোমরাই দাস ফ্যাক্টারীকে কামধেনু বানিয়েছিলে—যার জন্যে দাসবাবুদের এত বোল বোলাও। এখানে সিধু বাবুই বল, আর ভাস্কর বাবুই বল—শুধু ছিলেন দর্শনদারি—চেয়ারে বসে বসেই—

ইয়াসিন : না না না—অমন কথা কইবেন না বাবু—গুণা হবে—ওনাদের মতন লায়েক মনিষ্যি মাথার উপরি ছ্যালেন বলেই না মোরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার মদৎ পেয়েছিনু

যুগল : আহাহা—আমিও তো সেই কথাই কইছি হে ইয়াসিন মিঞা! তুমিও বুড়ো হয়েছ, এই কারখানায় কাজ করতে করতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছ…বুঝতে তো তোমার বাকি নেই বাপু—হাওয়া এখন বদলে গেছে; কাজের বাজারে যেখানেই হাত বাড়াবে—দেখবে দশখানা হাত চিৎ হয়ে আছে—উপরি নেবার তরে। নৈলে এমন হাল

সিদ্ধিনাথ : এদিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার—আর আমাকেও ত তুমি ভাল করেই চেন !

ভাস্কর : তবে একথাও বলে রাখি—আমাকে যে এগিয়ে দিয়ে তুমি ঘরে বসে খবর নেবে কি হোচ্ছে, সেটি কিন্তু হবে না ভায়া ! নিজে খেটে আমাকেও খাটিয়ে নিতে হবে, বুঝলে ? নৈলে—খনাদেবীর ছড়াই ফলে যাবে—

বলেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে পেট ও কপাল দেখিয়ে ইঙ্গিতাভিনয় করে পূর্ববৎ জোরে হেসে উঠলেন।

সিদ্ধিনাথ : আর—নিজে কি পাটনার ফ্যাক্টরী থেকেই আমাদের বায় পোষ্ট তালিম দেবে ?

ভাস্কর : বিলক্ষণ ! তাহলে এত বড় কথা বলি ? আরে—গোড়াতেই তাহলে শুনলে কি ? ঘরের ছেলে ঘরেই এসে বসেছি যে—ওখানকার পাট তুলে দিয়ে !

সিদ্ধিনাথ : তাই নাকি—

ভাস্কর : এখন বুঝছি—এ ভগবানের মর্জি, আর তোমারই মনের টান। (আবার হাসলেন)।

সিদ্ধিনাথ : কিন্তু তুমি ত ওখানকার কারবারে পার্টনার ছিলে—

ভাস্কর : আমিও তাই জানতাম হে ! কিন্তু মালিক দেহ রাখতেই তাঁর ওয়ারিসানরা ভাবলেন—একটা স্থইস টিপলেই যখন কারখানা চলে, মিছিমিছি মাথার ওপরে হাজার টাকা মাইনে দিয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ার রাখাই আহাম্মুখী। ওঁদের মনমর্জি আর নারাজী-ভাব বুঝেই,—মানে মানে কেটে পড়েছি। আর—এ তাঁরই ইচ্ছা। ভালই হয়েছে—এখন

হয়? সব শুনে কি বকুনিই না দিলুম ছোটবাবুকে! বললুম, তুমি যাও এখান থেকে—আমার ছেলে পোলাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে তারপর এসো! তোমাদের দুঃখু ঘোচাব বলেই তো এ গাঁয়ে একটা ডেরা করলুম হে! এরপর সব হবে, সব ব্যবস্থাই তোমাদের করে দেব···ঘাবড়িও না, একটু রয়ে সয়ে নিতে হবে বাবারা! হ্যাঁ—তারক, ওদিকে দেখ—পাঁচটা তো বাজে—এখন ওদের খাবার ব্যবস্থা করে দাও, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াব—দেখব।

এই সময় শিশু সত্যনাথ ঠিক সিদ্ধিনাথের মত ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কৈলাস পিছন থেকে বলে উঠল:

কৈলাস: এদিকেও ছাখেন গো মামাবাবু—কেটা এসেছেন—

যুগল: আরে—কেও··কেও··খোকাবাবু যে! হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে—তোমাকেও নেমন্তন্ন করে এসেছিলুম বটে ·····

কিন্তু সত্যনাথ ঘরে ঢুকেই এমনি গম্ভীর ভাবে তন্ন তন্ন করে ঘরখানি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল যে, যুগল মোক্তারের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

গোবর্দ্ধন: দেখুন কাণ্ড! যেমন ভারিক্কি চালে এলো—তেমনি গম্ভীর হয়ে দেখবার কি কায়দা!

তারক: খোকার ধরণ ধারণ ঠিক বড় বাবুর মতন নয় মামাবাবু?

কিন্তু মামাবাবুর মুখভঙ্গি দেখে তারক চমকে উঠল—তিনি ঠায় চেয়ে আছেন খোকার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে।

কৈলাস: জানেন বাবু—দেওড়ীতে দরোয়ানজীকেও দেখে তারপর খানিকটা চেয়ে থেকে বলল—তুমি মহাবীর! অবাক্ কাণ্ড!

গোবর্দ্ধন: বল কি?

কৈলাস : গাড়ীতে কি বৈস বসে—বললে পা পা করে যাব। সে আসার—আর চেয়ে চেয়ে দেখবার ধুম যদি দেখতেন—যেন সবই ওর চেনা।

এই সময় ঘরের সকলকে পুনরায় অবাক করে দিল শিশু সত্যনাথের কতিপয় কথা।

সত্যনাথ : ভাস্কর কোথায়—ভাস্কর ?

কৈলাস : ও বাবা! মামাবাবু গো—শুহুন!

যুগল : ভাস্করকে তুমি দেখেছ নাকি খোকা বাবু? তাকে জান?

সত্যনাথ : হুঁ—ভাস্কর কৈ ?

গোবর্দ্ধন : ভাস্করকে চেন, আর তোমার দাদুকে চিনছ না ?

যুগল : কি করে চিনবে বল—ছোট বেলায় দেখিছি, তখন কোলে পীঠে করেছি। ইদানীং আর কাজের ভীড়ে দেখা সাক্ষেতই নেই।—দাদু-ভাই এসো—

কৈলাস : দাদু ডাকছেন—যাও।

সত্যনাথ : উহুঁ—

গোবর্দ্ধন : দাদুর কাছে যাবে না ?

সত্যনাথ : না—ও চোর।

গোবর্দ্ধন : ছি! ওকথা বলতে নেই।

সত্যনাথ গোবর্দ্ধনের টেবিলের সামনে গিয়ে তার চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে বলল :

সত্যনাথ : এতো ভাস্করের চেয়াল—তুমি কেন বসেছ? ভাস্কর কই?

গোবর্দ্ধন স্তব্ধ ভাবে যুগলের মুখের দিকে তাকাল। সত্যনাথ পুনরায় যুগলের টেবিলের সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল :

সত্যনাথ : আমার চেয়ার কই ? আমার চেয়ার ?

সবাই স্তব্ধ শিশুর কথায়। ইয়াসিন এগিয়ে এসে বলল :

ইয়াসিন : খোকা তো ধরেছে ঠিক—বড়বাবুর চেয়ার ছোটবাবুর ঘরে গেছে—

কৈলাস : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে চেয়ারে ছোটবাবু বসেন—তোমার বাবা !

হঠাৎ কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গম্ভীর করে বালক ডেকে উঠল :

সত্যনাথ : ভূতো—ভূতো—(কৈলাসকে) ভূতো কোথায় ?

ইয়াসিন এগিয়ে এসে সত্যনাথের মুখের পানে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বলল :

ইয়াসিন : আওয়াল লেড়কা মামাবাবু ! তাজ্জব···তাজ্জব···

ইয়াসিনকে দেখেই সত্যনাথ এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইয়াসিন : আমায় কিছু বলবে খোকাবাবু ?

সত্যনাথ : তুমি তো ইয়াসিন—

ইয়াসিন : ইয়ে আল্লা—খোকা আমাকে···

যুগল : ওসব বুজরুকি মিঞা—এক একটা ছেলে এমনি হয়—আবল তাবল বলে—এ ভালো কথা নয়।—তারক, এদের সব নিয়ে যাও।

সত্যনাথ : ভুতো কোথায়—ভুতো ?

যুগল : ভুতো আসছে—তুমি ততক্ষণ খাবার খাওগে খোকাবাবু ! কৈলেস, নিয়ে যাও।

কৈলাস তাড়াতাড়ি সত্যনাথকে কোলে তুলে নিল। সকলে চলে গেল। ঘরের মধ্যে যুগল ও গোবর্ধনকে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট দেখা গেল। উভয়ের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

গোবর্দ্ধন : কি বুঝলেন ?

যুগল : যাই বলে ধাপ্পা দিই না কেন—ভাবিয়ে দিয়েছে গোবর্দ্ধন ! সিধু বাবু কি শেষে দুর্গার গর্ভে—য়্যাঁ ! হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয় হে—এ রকম হয়। খবরের কাগজে তো হরদম খবর বেরুচ্ছে—জন্মান্তরে জাতিস্মর হয়ে ফিরে আসা য়্যাঁ !

গোবর্দ্ধন : কি সর্বনাশ ! তাহলে তো—

যুগল : চুপ্—এখন কংশের মতই আমাদের নৃশংস হতে হবে। তার জন্যে তৈরী হও গোবর্দ্ধন····নৈলে বাঁচোয়া নেই।

কারখানার প্রাঙ্গণ। তিনখানা মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীরের দিকে আস্তাবোলে পুরাতন কম্পাস গাড়ীখানাও দেখা যাচ্ছে। সত্যনাথ প্রাঙ্গণে ঘুরে ঘুরে দেখছে বিশৃঙ্খল ভাবে কারখানার মালপত্রাদি যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। কারখানার সকলেই একান্ত কৌতুহলের সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করছে। দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতেই গাড়ীখানার উপর সত্যনাথের দৃষ্টি পড়ল—অমনি চোখ দুটো বড় করে সে গাড়ীর কাছে ছুটে গেল।

প্রাঙ্গণের আর এক অংশে কৈলাস গাড়ীতে খাবারের একটি হাঁড়ী রেখে সত্যনাথকে খুঁজছিল। জনৈক কর্মচারী দেখিয়ে দিল—সত্যনাথ আস্তাবোলে গেছে। এই সময় যুগল মোক্তার, গোবর্দ্ধন ও তারক বাইরে এসেছেন।

কৈলাস : খোকাবাবু ! এসো—গাড়ীতে উঠবে।

সত্যনাথ : না—ও গাড়ী না—এই গাড়ী।

কৈলাস : ও গাড়ী এখন চলে না—এসো, লক্ষীটি।

সত্যনাথ : উঁহু—চলবে—মহাঙ্গীর ডাকো—

কৈলাস : শুনুন গো মামাবাবু—মহাঙ্গীরকে ডাকতে বলছে খোকা।

যুগল : হুঁ!—সন্ধ্যে হয়ে এলো, তুমি ওকে নিয়ে যাও কৈলেস—

কৈলাস এগিয়ে যেতেই সত্যনাথ বায়না ধরল :

সত্যনাথ : উঁহুঁ—আমি এই গাড়ী যাবো—এই গাড়ী—মহাঙ্গীর—মহাঙ্গীর—

বলতে বলতে গাড়ীর পা-দানিতে উঠে দরজা খোলবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

ইয়াসিন : মহাঙ্গীর ছুটি নেবার তরে বাবুদের বাড়ীতেই গেছে যে!

কৈলাস : তাহলে খোকাকে দেখ ইয়াসিন—আমি তারে আনছি।

দাস-বাড়ীর বাহির মহল। উঠানে দাঁড়িয়ে কোচোয়ান মহাঙ্গীর বড়মার কাছে তার আর্জী জানাতে এসেছে। উপরে চিকের আড়াল থেকে অচলা তার কথা শুনছেন, তাঁর সঙ্গে দুর্গা আছে।

মহাঙ্গীর : সে আমল ওনাদের সাথ চলে গেছে মা—ও গাড়ী ছাড়া বড়বাবু দোসরা গাড়ী থোড়াই কেয়ার করতেন। সেই থেকে গাড়ী পড়ে আছে মা—কেউ চাপে না, বসে বসে বেকাম হামি কেন তলব লিবে মা, হুকুম হয় তো দেশে চলে যাই—

এই সময় কৈলাস ছুটতে ছুটতে এসে মহাঙ্গীরের কথায় বাধা দিয়ে বলল :

কৈলাস : না গো না—তোমার যাওয়া হবে না; ঐ গাড়ী চাপবার লোক এসেছে—শীগ্‌গির গাড়ী জুতবে চল।

মহাঙ্গীর : আরে বাউরা কা মাফিক ক্যা বলতা হ্যায়—

অচলা : (চিকের ভিতর থেকে) হলো কি কৈলেস—খোক্কা কই ?

কৈলাস : সেই কথা তো কইতে এনু গো বড় মা ! খোকা বাবু ফেক্টরীতে গিয়ে সবাইকে তাজ্জব বেনিয়ে ছ্যাছেন গো ! গিয়েই দরোয়ান মহাবীরকে নাম ধরে ডাকলেন, আপিস্রে গিয়ে মামাবাবুকে পোছেন—আমার চোয়র কই—ভাস্কর কই ? ইয়াসিন সরদারকেও চিনে ফেললে বড় মা ! কিন্তু মামাবাবুরে ঘেঁষ দিলে না, বললে—তুমি চোর।

অচলা : য়্যাঁ—

দুর্গা : দিদি—

কৈলাস : তারপর গো বড় মা, মহাঙ্গীরের সেই পোড়ো গাড়ী দেখেই খোকাবাবু বায়না ধরলে—এই গাড়ীতে যাবো…মানা কি শোনে গো, যত বলি, ততই শক্ত হয়ে মহাঙ্গীরের নাম ধরে চেঁচাত্তে থাকেন—তাইতো তোমারে ডাকতে ছুটে এনু গো ! শীগ্‌গীর চল—ঘোড়া জুতে খোকা বাবুরে আনবে—

মহাঙ্গীর : য়্যাঁ—য়্যায়সা ! ম্যয় আবি যাতা হুঁ ! আদাব মাঙ্গী—

মহাঙ্গীর ও কৈলাস চলে গেলে দুর্গা অচলাকে বলল :

দুর্গা : এ কি কাণ্ড দিদি ?

অচলা : চুপ কর পোড়ারমুখী—এ নিয়ে গোল করিস নি, কাউকে কিছু বলিস নি, খোকার কথায় মুখ বুজে থাকবি—যদি ওকে বাঁচাতে চাস্।

দুর্গা : কি হবে দিদি ! একে ওঁর ভয়ে সারা—পাছে সামনে পড়লে নাম ধরে ডাকে, রেগে ওঠেন, সব সময় আগলে আগলে

বেড়াই। কিন্তু একি কাণ্ড আজ ওখানে করে ব'সল দিদি···কি হবে?

অচলা : অদেষ্টে যা লেখা আছে তাই হবে—ভরসা শুধু ভগবান।

কারখানা-বাড়ীর প্রাঙ্গণে তখন রীতিমত ভীড় জমে গেছে। বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন আকৃতির কর্মীরা খোকাবাবুর বিস্ময়কর আচরণ দেখবার জন্য তাকে পরিবেষ্টন করে চারদিকে জমায়েৎ হয়েছে। যুগল মোক্তার ও গোবর্দ্ধন ম্লান মুখে কৃত্রিম হাসি জোর করে টেনে এনে সমবেত সকলকে খাবার স্থানে যাবার জন্য অনুরোধ করলেও কেউই সে কথায় কাণ দিচ্ছে না, সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—মহাঙ্গীর এলে খোকাবাবু কি করেন, সেটা দেখবার জন্য। এমনই সময় মহাঙ্গীর এসে পড়ল কৈলাসকে সঙ্গে নিয়ে। ইয়াসিন খোকাবাবুকে ইতিমধ্যেই গাড়ীর ভিতরে বসিয়ে দিয়েছিল। মহাঙ্গীর এসেছে একথা ইয়াসিনের মুখে শুনেই খোকা গদী থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল : মহাঙ্গীর! এ ছাখ আমি আবার গাড়ীতে বসেছি—এ গাড়ী চড়ে বাড়ী যাব—গাড়ী চালাও। কৈলেস—এসো। মহাঙ্গীরও কথা শুনে স্তম্ভিত। তার মনে হলো যেন বড়বাবুর মুখের হুকুম শুনছে। বিস্ময়ে তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়—নীরবে আদাব জানিয়ে সে আস্তাবোলে ছোটে ঘোড়া আনতে। জনতার ভিতর থেকে চাপা গলায় মন্তব্য ওঠে—ওরে, বড়বাবু ফিরে এসেছেন।

* *
*

পরদিন—সকাল। দাস বাড়ীর অন্দরমহল। দোতালার. টানা

দালানে ভূতনাথের ঘরের সামনে— শিশু সত্যনাথের ক্রন্দন ও ভূতনাথের তর্জন শোনা যাচ্ছে। সত্যনাথ ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করছে— ভূতনাথ দরজার ভিতরে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুল ধরে টানছে এক হাতে, আর এক হাতে চাঁটি মারছে আর ধমকাচ্ছে। সত্যনাথের গায়ে একটা গলাবন্ধ কোট।—ভূতনাথের গায়ে গেঞ্জি।

ভূতনাথ : ভূতো? আমি তোমার ভূতো। এই বয়েসে জেঠামী শেখা হয়েছে—এ সব কার কাজ? পাজী,—ছুঁচো—ডেঁপো কোথাকার—

কথার সঙ্গে অবিরাম প্রহার চলতে থাকে; ফুলে ফুঁসে ক্রন্দনের সঙ্গে শিশু আহ্বান করে :

সত্যনাথ : উ! উ! বউ! এই ছাখ—ভুতো মারছে—

ভূতনাথ : আবার ভূতো—

দুর্গা ছুটে এসে আর্তকণ্ঠে বলতে থাকে :

দুর্গা : আহা—করছ কি! অমন করে মারে! ছাড়ো, ওগো তোমার পায়ে পড়ি—ছাড়ো।

ভূতনাথ : থামো— সরে যাও বলছি····নৈলে তোমাকে পর্য্যন্ত—

দালানের ওদিক থেকে অচলাও এই সময় চীৎকার করে ছুটে এলেন :

অচলা : কি হচ্ছে রে ভূতো—ছেলেটাকে মেরে ফেললি···কি ভেবেছিস্ তুই? ছেড়ে দে বলছি···

অচলা এসে এক রকম জোর করে ছেলেকে ভূতনাথের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। সত্যনাথ সরোদনে বলল :

সত্যনাথ : বৌ—বৌ! আমাকে নিয়ে চল—নৈলে ভূতো আমাকে আবার মেরে ফেলবে!

ভূতনাথ : ছেলের কথা শুনছ !

অচলা : শুনিছি—ছেলেবেলায় অমন কত কি বলে—তা বলে ছেলেকে মেরে খুন করতে হবে নাকি ?

ভূতনাথ : তুমিই তো ছেলেটার মাথা খেয়েছ পাকা পাকা কথা শিখিয়ে—এর জন্যে তুমি দায়ী !

অচলা : কি বললি ?

ভূতনাথ : ঠিক বলেছি—এমনি করে আদর দিয়ে তুমি আমার ছেলের মাথা খাচ্ছ !

অচলা : এই কথা !

কৈলাস এই সময় ক্ষিপ্রপদে এসে বলল :

কৈলাস : মামাবাবু বৈঠক ঘরে বসে আছেন ছোটবাবু—এখুনি যেতে বললেন, খুব দরকার।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি চলে গেল।

অচলা : ভূতো আমাকে এ-কথা বলতে পারলে—আমি ওর ছেলের মাথা খাচ্ছি ! হা ভগবান—

দুর্গা : আপনি কিছু মনে করবেননা দিদি, রাগ করবেননা দিদি, আপনার পায়ে পড়ি দিদি—

অচলা : না না, ভূতো ঠিকই বলেছে। জানিস্ ছোট বৌ, ভূতোর ছেলেবেলায় উনি বকলে মারলে আমি যেই বাধা দিতুম, উনিও ঠিক এই কথা বলতেন রে।

অতীতের সে কথা—সিদ্ধিনাথের সেই অনুযোগ—অচলার মনে পড়ল। সিদ্ধিনাথ যেন বলছেন :

"তুমি দেখছি এমনি করে আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খাবে।"

অচলা : না, না, আমি আর আদর দোব না, কিছু বলব না, তুই আমার কাছে আর আসিস্ নি—যা—যা—

সত্যনাথ আরো জোরে অচলাকে জড়িয়ে ধরে। সরোদনে বলল :

সত্যনাথ : আমি এ-ঘরে যাব না—ভূতো আমায় মেরে ফেলবে বৌ!

দুর্গা : ওর ওপর রাগ করে খোকার এ কি খোয়ার করছেন দিদি! কালকের কথা সব ভুলে গেলেন? মামাবাবু এই সকালেই বাড়ী বয়ে কেন এলেন দিদি?

অচলার যেন হুঁস হলো—ধড়মড় করে খোকাকে কোলে নিয়ে পরক্ষণে দুর্গার কোলে তাকে দিয়ে বললেন :

অচলা : খোকাকে একটু ভুলিয়ে রাখ ছোট বৌ—আমি—আমি—নীচে থেকে আসছি।

•

বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসে যুগল মোক্তার, গোবর্দ্ধন ও ভূতনাথ গভীর ভাবে পরামর্শ করছেন। ওদিকে উপর থেকে অন্য সিঁড়ি দিয়ে—গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে অচলাও হন হন করে নেমে বৈঠকখানার পিছনের দিকে একটা খুব আদাড়ে জায়গায় বন্ধজানালার কাছে কাণ পেতে দাঁড়ালেন, তারপর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তিনজনকে লক্ষ করে তাদের পরামর্শ শুনতে লাগলেন।

ভূতনাথ : শুনে অবধি কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি মামাবাবু! তাই না সকাল হতেই ছেলেটাকে সামনে পেয়ে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে দিয়েছি—

যুগল : যাঁ্যা! এরই মধ্যে এই কাণ্ড করে বসেছ বাবাজী! এ—হে-হে! তাহলে তো বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে দিয়েছ

হোল-হাটলি তোমার কারখানার চাকা ঠেলা যাবে। (পুনরায় হাস্য)।

সিদ্ধিনাথ : আরে—একথা আগে বলতে হয়? তাহলে কি বাজে কথা তুলে সময় নষ্ট করতাম ! .. হ্যাঁ, এখন একবার বাড়ীর ভিতরে চল দেখি—সেখানেও এক কাণ্ড বাধিয়ে এসেছি।

ভাস্কর : বুঝেছি—বৌমার এলাকায়ও তোমার ঐ ছাঁটায়ের কাঁচি চালিয়েছ! ভারি ভুল করেছ তাহলে। অচলা মা'র অন্তরের স্নেহ দরদ আমি চিনি। আর একটা কথা মনে রেখ সিধু—বাইরে ঝড় উঠলে, গৃহলক্ষীকে সে সময় কিছুতেই উতলা করতে নেই ; তাহলেই খেই হারিয়ে ফেলবে দুদিক দিয়ে হে ! চল, চল, দেখি—সেখানে কি করে বসেছ!

বলতে বলতে ভাস্কর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ভঙ্গিতে চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া গেল

বাড়ী ভিতরে সিদ্ধিনাথের সেই ঘর। টিপয়ের উপর চায়ের পিয়ালা জলখাবারের ডিস্। অচলা পাণের ডিপা এনে টিপয়ে রাখলেন। ভাস্কর ডিপা থেকে পাণ নিয়ে বলতে লাগলেন :

ভাস্কর : বৌমার কথা থেকে আমি এই বুঝছি সিধু, তোমাদের কারবারের খামতির জন্যে দুঃখের চেয়ে, ভুতোর মনের দুঃখটাই ওঁর মনে বেশী ঘা দিয়েছে। একেই বলে আঁতের দরদ, আর এটা মায়ের জাতেই সম্ভব।

মাথার ঘোমটা আরো একটু টেনে অচলা বললেন :

অচলা : আপনি ওঁকে জিজ্ঞেস করুন ত দেবতা, কারবারে মন্দা পড়েছে ব'লে এই-যে উনি দান ধ্যান পূজো পার্বণ সব বন্ধ

যে—তুমিও রীতিমত ভয় পেয়েছ! ছিছিছি, একটু আর তর সইল না—

গোবৰ্দ্ধন: মারলেন কেন!

ভূতনাথ: তাবলে কালকের কথা কিছু ভুলিনি—আমার নাম ধরে ডেকেছে এই কথাটা ধরেই....

যুগল: যাক্, যা করেছ, তার তো আর চারা নেই; এখন শোন, ব্যাপার যে-রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে আর ওটা বাড়বার ফুরসদ না দিয়ে—তোমার ছেলেকে চুপিসাড়ে এ-বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে....

ভূতনাথ: সরিয়ে ফেলতে হবে—এ বাড়ী থেকে?

যুগল: হ্যাঁ বাবাজী। আপাততঃ এ-বাড়ী থেকে—তারপর—এ দুনিয়া থেকে—কেউ টেরও পাবে না!

ওদিকে এ-কথা শুনেই অচলার দুই চক্ষু বড় হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে।

ভূতনাথ: য়্যাঁ—

যুগল: যদি নিজের জানের ওপর মায়া থাকে, ছেলের মায়া কাটাতে হবে বাবাজী! মনে রেখ—ও তোমার ছেলে নয় শত্তুর—ওকে পাচার করতে হবে—আমি জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

অচলার পক্ষে আর সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয় না; উঠি পড়ি অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে উপর তালায় ছুটতে থাকেন। তাঁর মুখ ও চোখের ভঙ্গিতে দারুণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পায়। তিনি যেন দিশেহারা হয়ে চলেছেন—মুখে কথা নেই, মুখখানা শুখিয়ে গেছে।

সত্যনাথের বায়না তখনো থামে নাই। এ-ঘরে সে কিছুতেই ঢুকবে না। দালানেই দুর্গা তাকে কোলে করে ভোলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু খোকার সেই এক কথা :

সত্যনাথ : বৌ কাছে যাবো। তুমি না—বৌ—বৌ—

এমনি সময় অচলাকে তকাতে দেখেই দুর্গা বলে উঠল :

দুর্গা : ঐ বৌ এসেছে!—জ্বালা ছেলে হয়েছে দিদি....বৌ বৌ করে কি বায়না...

কিন্তু ছেলেকে অচলার কোলে দিতে গিয়ে তাঁর মুখভাব দেখে দুর্গা শিউরে উঠে সুধাল :

দুর্গা : কি হয়েছে দিদি? অমন করছেন কেন?

অচলা : খোকাকে নিয়ে শীগ্‌গীর আমার ঘরে আয় ছোট বৌ! আমার হাতে পায়ে বল নেই, হয়ত ফেলে দেব।

বলেই অচলা নিজের ঘরের দিকে ফিরতেই খোকা চেঁচিয়ে উঠল :

সত্যনাথ : তুমি না—বৌ! আমায় নে, বৌ—

তখন অচলাকে ফিরে দুর্গার কোল থেকে খোকাকে নিয়ে চোখের ইশারায় দুর্গাকে ডেকে ক্ষিপ্রপদে ঘরের দিকে যেতে হলো।

অচলার ঘর। মেঝের উপর বসেছেন অচলা ও দুর্গা। সত্যনাথ দুর্গার কোলে বসে অচলার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। কান্নার পর ছেলেদের মনে শ্রান্তি আসে। সেই সুযোগে অচলা তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেন। খোকা ঘুমালে নীচের শোনা কথা অচলা দুর্গাকে সব বলেন। শুনে দুর্গার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে হয়ে যায়—দুজনেরই বয়স যেন এরই মধ্যে দু'বছর করে বেড়ে গেছে।

দুর্গা : কি হবে দিদি—কি করে খোকাকে বাঁচাবো ?

অচলা : বাঁচাবার কর্তা ভগবান—তিনিই বল বুদ্ধি দেবেন। নৈলে তিনি কি জানিয়ে দিতেন ? তোর মামা আসতেই ভাগ্যিস্ তুই সন্দ করেছিলি—

দুর্গা : আমি কিন্তু ভাবিনি দিদি—আপনি আড়ি পেতে ওঁর কথা শুনতে গেছেন ?

অচলা : কালকের কাণ্ড শুনেই মনে আমার ভয় হয়েছিল; কিন্তু এত শীগ্‌গীর যে ওরা…ওরে…য্যাদ্দিন পরে…এই সত্যকে দিয়ে ভগবান সত্যপ্রকাশ করে দিলেন…আমি এখন ভাবছি—

অচলার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে দুর্গা সাগ্রহে সুধাল :

দুর্গা : কি দিদি ? কি জেনেচেন, আমি—

অচলা কথাটা চাপবার জন্য একটু থেমে আগের কথা তুললেন :

অচলা : ভাবিস্‌নি—উপায় করতেই হবে। কিন্তু তোকেও শক্ত হতে হবে ছোটবৌ।

দুর্গা : আপনি যা বলবেন দিদি, আমি তাই করবো—আপনি খোকাকে নিন দিদি—খোকা আপনার—আপনি ওকে বাঁচান দিদি—বাঁচান। আমি সত্যিই শক্ত হব।

অচলা : চুপ্—চেঁচাসনি, আর কোন কথা নয়, কেবলই মনে মনে ভগবানকে ডাক্ ভাই—তিনিই আমাদের পথ দেখান।

* *

*

বৈঠক ঘরে এখন ভূতনাথ একা বসে কৈলাসের প্রতীক্ষা করছে।

পরামর্শ দিয়ে যুগল বাবু ও গোবর্দ্ধন চলে গেছেন। কৈলস এসে বলল:

কৈলাস: ডাকছিলেন ছোট বাবু?

ভূতনাথ: হ্যাঁ কৈলেস—তুমি দেশে যাবার জন্যে ছুটি চেয়েছিলে না?

কৈলাস: সে তো অনেক আগেই চেয়েছিনু গো, তা তো মঞ্জুর হয়নি; এখন খোকাবাবুর তরে—

ভূতনাথ: খোকাবাবুর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবেনা—তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, খাওয়াদাওয়ার পর মামাবাবুর কাছ থেকে মাইনে পত্র নিয়ে আজ বিকেলেই রওনা হবে, বুঝলে?

অন্দরমহল। অচলার ঘর। খোকা খাটের উপর ঘুমাচ্ছে। অচলা খোকার বাহারী কাঁথা জামা প্যাণ্টগুলি গুছাচ্ছেন ও কৈলাসের কথা শুনছেন।

অচলা: হুঁ। তুমি কিছু বললেনা ছোটবাবুকে?

কৈলাস: বলবার ফুরসদই দিলেন না; ওনার কথার ধাঁজো বুঝনু গো, এ হচ্ছে হুকুম—জবাব দেবারই সামীল। তাই আর ওনারে কিছু না ক'য়ে তোমারে কইনু বড়মা! মামাবাবুর কাছ থেকে হিসেব নেবার হুকুম হয়েছে—তাই যাচ্ছি গো!

অচলা: বুঝিছি। হিসেব তুমি নিয়ে এসো কৈলেস, এ হচ্ছে ঠাকুরের ইচ্ছে।

কৈলাস: বুঝিছি গো বড়মা, আমারে রাখতে তোমরা সবাই নারাজ—তাই কইলে এ কথা। কিন্তু খোকাবাবুর তরে আমার বুকের ভেতরটা কি রকম হাতারি পাতাড়ি করছে, সে কথা কে বুঝবে? ওরে ছেড়ে কি করে আমি যাব বড়মা—

কথাগুলি বলতে বলতে কৈলাসের দুই চক্ষু অশ্রুময় হয়ে উঠল।

অচলা : কেঁদনা কৈলেস—খোকাবাবুকে ছেড়ে যেতে হবেনা তোমাকে—ওকে নিয়েই তুমি যাবে বাবা!

কৈলাস : বড় মা—

অচলা : সেই সঙ্গে তোমার বড়মাকেও কৈলেস!

কৈলাস : কি কইছ গো এ সব—আমি যে বড়মা—

অচলা : আমাদের ভারি বিপদ বাবা! খোকাবাবুর কালকের কাণ্ড দেখে—যাদের টনক নড়েছে কৈলেস—তারাই তোমার বড়বাবুকে খুন করেছিল

কৈলাস : বড় মা! বড় মা! তবে কি—

অচলা : তুমি একলা কি করবে কৈলেস—আমরাও মেয়ে মানুষ! আমার কথা শোন বাবা—কিছু বলবেনা কাউকে, মুখ বুজিয়ে থেকো—মামা বাবুর কাছ থেকে হিসেব বুঝে নিয়ে এসো; আমি ততক্ষণ একটা মতলব ঠিক করে রাখি—তুমি এলে বলব।

* * *

*

সন্ধ্যা হয়েছে। দাসবাড়ীর নীচের বৈঠকখানায় ভূতনাথ ও গোবর্দ্ধন বসে পরামর্শ করছে। কৈলাস যাবার মত সজ্জায় এসে বলছে:

কৈলাস : বিদেয় হচ্ছি গো ছোটবাবু—

ভূতনাথ : তুমি এখনো যাও নি কৈলেস—তিনটের গাড়ীতে যাবার কথা ছিল না?

কৈলাস : তিনটের গাড়ীতে হয়ে উঠলো নি গো, রেতের গাড়ী ধরবো বলে যাচ্ছি—আটটায় গাড়ী কিনা। চলনু গো ছোটবাবু! গোবরবাবু! চলনু—গো।

মাথা হেঁট করে নমস্কার করে কৈলাস চলে গেল।

গোবর্দ্ধন : একটা আপদ খসল।····হ্যাঁ, বিশ্বাস মশাই—আপনাকে বলতে বলে দিলেন—সকালে খোকার সম্বন্ধে যে-কথা আপনাকে বলেছিলেন, সেটা—পরীক্ষে করবার জন্যে বললেন—হ্যাঁ, বাবাজীর মনে জোর আছে।

ভূতনাথ : তাহলে খোকাকে নিয়ে গিয়ে উনি কি করতে চান ?

গোবর্দ্ধন : এ-বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের মনের মতন করে তালিম দিতে চান !

ভূতনাথ : তাতে কিচ্ছু হবে না। জানেন—বাড়ীতে অনেক আগেই জানাজানি হয়ে গেছে ; সবাই জেনেছে, দাদা এসেছে শুধু আমার কাছেই চেপে রাখা হয়েছিল। আজ যখন ওর মাথার চুল টেনে ধরে থাপড়া মারলুম—এমন করে আমার পানে তাকাল গোবর্দ্ধন বাবু, আমার মনে হলো—দাদার সেই চোখ—মরবার আগে যে চোখ দেখেছিলুম। ও এসেছে আমাকে শাস্তি দিতে, ও মূষল হয়ে জন্মেছে··· আমার নিস্তার নেই।

গোবর্দ্ধন : আরে—ছি ! একটুতেই এমন করে ঘাবড়াচ্ছেন মামাবাবু আগেই এটা বুঝে তবে না ওকে সরাতে চেয়েছেন বেশতো, যদি সহজে বাগে আনতে না পারেন···আসল পথ তো খোলাই আছে। ধরুন, একটা শক্ত অসুখ হলো তাতেই খতম। ভাবনার কি আছে ! হ্যাঁ, আপনি এবার উঠুন, ভিতরে গিয়ে দেখুন—

ভূতনাথ : খবর নিয়ে জেনেছি—সন্ধ্যের পর বৌমার কাছে খোকা গল্প শোনে। ঘুমিয়ে পড়লেই তিনি উঠে ঠাকুর ঘরে যান

কিছুক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আচ্ছা—দু কাপ চা আনতে বলি!

দোতালার দালানের প্রান্ত ভাগে—কৈলাস গোটা দুই পুঁটুলি নিয়ে চলেছে। পিছনে খোকাকে নিদ্রিত অবস্থায় কাঁধে শুইয়েছেন অচলা—দুর্গা একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে দিতে সরোদনে বলছে :

দুর্গা : দিদি! কি করে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবো—কৈলেসের সঙ্গে আপনি কি করে খোকাকে নিয়ে—

অচলা : চুপ কর, কাঁদিস্নি—যাবার সময় তাহলে তোকে বলে যাই ছোট বৌ, যে বন্ধুর কলঙ্ক ঘোচাবার জন্যে উনি তোর ছেলে হয়ে জন্মেছেন, আমি সেই দেবতার দোরেই ওকে নিয়ে চলেছি!

দুর্গা : আ! দিদি—বাঁচালেন। আমি তাহলে সত্যিই নিশ্চিন্ত হলুম। এ কথা সত্যিই চেপে রাখতে হয় দিদি!

অচলা : পাছে তুই বলে ফেলিস, সেই জন্যেই—

দুর্গা : এখনো আমাকে অবিশ্বাস করছেন দিদি! আমি যে আপনার কথায় শক্ত হয়েছি দিদি! আমি এ কথা বলব না, কিছুতেই বলবনা, কাউকে বলব না—প্রাণ গেলেও না।

অচলা : তাহলে এখন আমাদের যেতে দে—আর, যেমন যেমন বলিছি—তাই করবি—

দুর্গা : হ্যাঁ দিদি—মনে আছে। এখন শুধু একটিবার খোকার মুখখানা দেখাও দিদি—ঘুমুচ্ছে, তবু দেখি—সারারাত ধরে ঐ চাঁদ মুখ ভাবব দিদি—

খিড়কার দরজার বাইরে একটা পুকুরের ধার দিয়ে ঘেঁসের রাস্তা। এ-বাড়ীর নিজস্ব পথ। এই পথটি বাগানের পাশ দিয়ে ঘুরে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এখানে আলো নেই। এই পথে অতি সন্তর্পণে চলেছেন অচলা ও তাঁর আগে আগে কৈলাস।

* *

*

অন্দর মহলের দালান। আলো নেই—অন্ধকার। পা টিপে টিপে একটা টর্চের আলো ফেলে ভূতের মত আসছে ভূতনাথ। অচলার ঘরের দরজায় শিকল লাগানো রয়েছে। ভূতনাথ টর্চের আলোকে দেখে শিকল খুলে ঘরে ঢুকল। বিছানায় টর্চ ফেলে দেখল—অচলার বিছানার পাশে আলাদা গদিপাতা বিছানা—দেখলেই মনে হয় যে, বিছানায় খোকা শুয়ে আছে, উপরে একখানা চাদর ঢাকা। ভূতনাথ খোকা মনে করে যে বস্তুটি চাদরে জড়িয়ে তুলতে গেল—তখনি তার ভুল ভাঙল—খোকার বদলে একটি বালিসকে ওভাবে রাখা হয়েছে দেখে! ভূতনাথ গুম হয়ে দাঁড়াল—টর্চ ফেলে ঘরখানা আগাগোড়া দেখে বেরিয়ে গেল। পুনরায় দালান দিয়ে ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো—ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বলছে—আসনে বসে আহ্নিক করছে একজন। অচলা ভেবেই ভূতনাথ নিজের ঘরে গেল; ভেবেছিল, সেখানে দুর্গাকে পাবে। কিন্তু কাউকে না দেখে তার তিরিক্ষি মেজাজে হাঁকল:

ভূতনাথ: গেল কোথায় সব? কোন চুলোয় আছ শুনি? দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুর্গা। এতক্ষন কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ তার ফুলে উঠেছে—এখন ভূতনাথের কথা শুনে ও তাকে দেখে চোখে মুখে যেন জ্বালা ধরেছে। এই প্রথম সে প্রখর স্বরে বলল:

দুর্গা: সে খবর তুমিই রাখ আমার চেয়ে বেশী।

ভূতনাথ ও! ছেলের তেজে নিজের তেজটাও খুলেছে দেখছি! খোকা কোথায়?

দুর্গা: খোকা কি আমার কাছে থাকে যে জিজ্ঞেস করছ?

ভূতনাথ: যেখানে থাকে—পাইনি বলেই জিজ্ঞাসা করেছি। ঠাকুর ঘরে বৌমা আছেন—ঝাঁ করে জেনে এস দেখি—খোকাকে কোথায় রেখেছেন তিনি।

দুর্গা: বৌমা ঠাকুর ঘরে নেই—আমিই ছিলুম, তোমার চীৎকার শুনে উঠে এসেছি।

ভূতনাথ: ঠাকুর ঘরে তুমি ছিলে? তাহলে বৌমা গেল কোথায়? খোকাই বা কোন্ চুলোয়?

দুর্গা: আহা! কথার ছিরি দেখনা—

ভূতনাথ: থাম! এই জন্যেই বলে—কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে। শোন—বৌমা যেখানেই থাকুক, খোকাকে তুমি এখনি আমার সামনে হাজির কর!

দুর্গা: কেন? এত রাত্তিরে খোকাকে তোমার কি দরকার?

ভূতনাথ: ফের তকরার? আনো বলছি খোকাকে—

দুর্গা: খোকা কি আমার যে আনব? সবাই জানে—খোকা তার বৌমার—খোকার খবর তিনি রাখেন, আমাকে বলছ কেন?

ভূতনাথ: বটে! হুঁ! বুঝিছি। বৌমা এ বাড়ীতে নেই—খোকাকে নিয়ে নিশ্চয়ই পালিয়েছে—

বলেই ভূতনাথ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দুর্গার দিকে তাকাল। আশ্চর্য্য যে, আজ দুর্গা সে দৃষ্টিতে অভিভূত হলো না—সেও ততোধিক তেজোদৃপ্ত

দৃষ্টিতে নিষ্পলক নয়নে একইভাবে চেয়ে রইল। ভূতনাথ চোখের দৃষ্টি আরো ক্রূর ও উগ্র করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল দুর্গার দিকে—একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ল...তার তপ্ত নিশ্বাস দুর্গার মুখমণ্ডলে অগ্নিকণার মত দাহের সঞ্চার করল। ক্রমে ভূতনাথ তার সবল দুটি হাত দিয়ে দুর্গার দুই কাঁধে ঝাঁকুনী দিয়ে বলল :

ভূতনাথ : বল বলছি—খোকাকে নিয়ে বৌমা কোথায় গেছে ?

দুর্গা নীরব—কোন উত্তর দিল না।

ভূতনাথ : (আরো জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে) জবাব দাও—বল বলছি কোথায় তারা ? বল ?

দুর্গা : জানি না।

ভূতনাথ : মিছে কথা—তুমি জানো।

দুর্গা : জানলেও বলব না।

ভূতনাথ : কী ! আমাকে চেননা—ভয় নেই ?

দুর্গা : না—তোমাকে চিনিছি বলেই আর ভয় নেই ! তাই তোমার মুখের ওপর বলছি—বলবনা, বলবনা, বলবনা।

ভূতনাথ : বলতেই হবে তোমাকে—নৈলে গলার নলি ভেঙ্গে দেব—

বলতে বলতে ভূতনাথ দু'হাতে দুর্গার গলা চেপে ধরে মোচড় দিতে লাগল—কিন্তু দুর্গা নীরব, নিশ্চল, নির্ভীক। ভূতনাথ দৃঢ়হস্তে নিপীড়ন করতে করতে শাসাতে লাগল :

ভূতনাথ : বল বলছি—বল—এখনো বলো—কোথায় বৌমা, কোথায় খোকা ?

ভূতনাথের দুই হাতের সবল বেষ্টনী মধ্যে পিষ্ট হয়ে দুর্গার মুখখানা বিকৃত ও দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সেই অবস্থায়

করেছেন – বলিছি আমি কোন কথা? কিন্তু তা ব'লে ভুতোর আবদারও যদি আমি না রাখতে পারি—আমার মরাই ভালো!

সিদ্ধিনাথ: বাবা থাকতে—তখন থেকেই ত আদুরে দেবরের আবদার সব মিটিয়ে আসা হয়েছে। আজই না হয়—

অচলা: ভুতোও ত সেই কথা বলে—বাবা থাকতে কোনদিন না বলো নি, এখনইবা দেবে না কেন? পঞ্চাশটা টাকার জন্যে যে কাণ্ড আজ করলেন—

ভাস্কর: আপনি ওর জন্যে দুঃখ করবেন না বৌমা! আমি বলছি—আপনার ভুতোর আবদার মেটাবার জন্যে একটা থোকথাক টাকা বরাদ্দ করে দেওয়া হবে।

সিদ্ধিনাথ: যাতে ওঁর আবদেরে দুলালটির বিগড়োবার পথটি খোলসা হয়?

অচলা: ঐ শুনুন দেবতা—

ভাস্কর: এ তোমার রাগের কথা সিধু। আরে—তাহলে আমরা আছি কি করতে? বিগড়োতে দেব কেন হে?—এখন ওঠ; তোমার মহাজনদের নেমন্তন্ন করে এনে মিটিংটা আগে করা চাই।

* *
*

সিদ্ধিনাথের বাড়ীর বৈঠকখানায় আহূত হয়ে পাওনাদার মহাজনরা এসেছেন। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধিনাথের পক্ষ থেকে ভাস্কর তাঁদের সিদ্ধান্ত জানালেন:

ভাস্কর: 'আমি আপনাদের সবই বললাম। এখন দুটো পথ খোলা

তাকে ঠেলে খাটের উপর ফেলে দিয়ে ভূতনাথ ঝড়ের মত বেগে বেরিয়ে গেল।

*   *
*

ভাস্করের বাড়ী। উপরতালার একখানি ঘরে এই সময় খোকা সত্যনাথকে ঘিরে—আরতি, অচলা, রবি ও কৈলাস আলাপ-আলোচনা করছেন। এ-বাড়ীতে কিছুক্ষণ আগে আসার পর সত্যনাথের ঘুম ভেঙ্গে যায়—আলোকিত ঘরে আরতিকে দেখেই সে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে ওঠে—কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বলে ওঠে যে সে তাকে জানে। সেই সম্পর্কে আলাপ চলেছে :

সত্যনাথ : হ্যাঁ গো—আমি তোমাকে জানি, খুব জানি।

আরতি : কি করে জানলে ? তুমি তো এ-বাড়ীতে এই প্রথম এলে ; তবে ?

সত্যনাথ : না গো—আগে এসেছিনু—মনে নেই ? আমি, আমার ঐ বৌ, (অচলাকে দেখিয়ে) ঐ কৈলেস—সেই যে গাড়ী আনলুম খোকার জন্যে তার পর···ভাস্কর এলো···· মনে নেই ?

আরতির কৌতুক-বিহসিত মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে—অচলার পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান ; উভয়ের চোখ ছল ছলিয়ে আসে। কৈলাস সোল্লাসে বলে উঠল :

কৈলাস : ওগো মা'ঠাকরুণ—শুনুন, শুনুন—আজো আমার চোখের ওপর জল জল করছে—বড়মাকে নিয়ে বড় বাবু এলেন, আমার সঙ্গে ঠেলাগাড়ী—রবিবাবু তখন এতটুকু—গাড়ীতে

চাপিয়ে টানতে নাগম্—তারপর এলেন বাবা ঠাকুর—সব মনে আছে গো!

সত্যনাথ: খোকা কই? তোমার ছেলে? আর—ভাস্কর? কোথা সে? (আহ্বানের সুরে ডাকতে লাগল) ভাস্কর! ভাস্কর!

বিহ্বল হয়ে দু'হাতে মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন আরতি:

আরতি: ওগো? তোমাকে ডাকছেন···তুমি কি শুনছ?

রবি: মা—

অচলা: এই যে সেই খোকা- কত বড় হয়েছে; চিনতে পারছ?

সত্যনাথ ফ্যাল ফ্যাল করে অচলার মুখের পানে চেয়ে থাকে।



সেই থেকে রবি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে আসছে। কৃচ্ছসাধনা ও আধ্যাত্মিকভাবের প্রভাবে বয়স বৃদ্ধির অনুপাতে তার দেহের তেমন বাড় বৃদ্ধি হয় নাই—দেখলেই তাকে হৃষ্টপুষ্ট নাদুস নুদুস এক অদ্ভুত কিশোর বলে ভ্রম হয়।

অচলা: জানেন দিদি, কৈলেস কাল খোকাকে আফিসে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ঠিক এমনি করে দেবতার নাম ধরে ডাকতে থাকে। তাতে যারা সত্যিকার পাপী—ভেবেছে, বুঝি য়্যাদ্দিন পরে ধর্মের কল নেড়ে দিতে তিনিই ফিরে এসেছেন!···তারপরই খোকাকে সরিয়ে দেবার জন্যে খুনের নেশা ওদের মাথায় চেপেছে। তা জানতে পেরেই তো একে নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি দিদি!

আরতি : য়্যাঁ—একি বলছ ভাই ! অ মা ! একি সর্বনেশে কথা গো !

অচলা : সব খুলে বলছি দিদি—শুনলেই বুঝবেন !

* *
*

ওদিকে এই সময় দাস-বাড়ীর সকল স্থানে অনুসন্ধান চলেছে। কৈলাসের উপর সন্দেহ করে তারক ও গুণ্ডাকৃতি দুই ব্যক্তিকে ষ্টেসনে পাঠানো হয়েছে। কোন রকম গোলমাল না করে নীরবে সন্ধান চলেছে।

কোথাও কোন রকম সন্ধান না পেয়ে অবশেষে যুগল মোক্তারেরর খরিদ করা বাড়ীতে সকলে সমবেত হয়েছেন। এ-বাড়ীতে যুগল বাবুর পরিবারবর্গ এখনো আসেনি দুর্গাপুরের বাড়ী থেকে। যুগল মোক্তার গোবর্দ্ধন ও জনকয়েক যণ্ডা ব্যক্তিকে নিয়ে এ বাড়ীতে থাকেন—বাড়ী দখলের সময় এদের আনা হয়...কতকগুলো সংস্কার কাজ বাকি থাকায় রয়ে গেছে। এরা প্রত্যেকে গুণ্ডা বদমাস দাগী, তবে যুগলের অনুগত ও হাতের লোক। একখানা ঘর গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে বৈঠক বসেছে। যুগল মোক্তার গম্ভীর মুখে সটকা টানতে টানতে প্রত্যেকের কথা নীরবে শুনছেন। ভূতনাথ, গোবর্দ্ধন, তারক উপস্থিত।

তারক : বাড়ীখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। রান্নাবাড়ীর লোকজনেরা পর্য্যন্ত কিছুই জানেনা, শুনে সবাই অবাক্ !

গোবর্দ্ধন : তাহলে গেল কোথায় ? ষ্টেসনেও আমি সন্ধান করেছি—সেখানে যায়নি।

যুগল : বাজে বকে চলেছ—সিধু বাবুর বৌ তেমন কাঁচা মেয়ে নয় যে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন কোন চাকর বাকরের সঙ্গে।

তিনি আছেন এমন জায়গায়—যেখানে থাকলে বদনামের ভয় নেই।

ভূতনাথ : মামাবাবু ঠিক বলেছেন। তবে আমার মনে হয়—আপনার ভাগনী জানেন—তিনি কোথায় গেছেন।

যুগল : তাহলে বাবাজী, তার কাছ থেকেই খবরটা না জেনে—

ভূতনাথ : সে বলে নি।

যুগল : বলে নি? মেয়ে মানুষ কথা হজম করে—

ভূতনাথ : কথা বার করবার জন্যে—আর একটু হলে তাকেও খুন করে ফেলেছিলুম!

যুগল : ভুল করেছ বাবাজী, গায়ে হাত বুলিয়ে ওসব কাজ আদায় করতে হয়—ঘাড়ে রদ্দা দিয়ে নয়। আমাকে বললেই পারতে—দেখতুম সুড় সুড় করে পেটের কথা উগ্‌রে দেয় কিনা! আচ্ছা, এখন থাক…আগে আমার হিসেবটা মিলিয়ে দেখ দেখি—

গোবর্দ্ধন : বলুন—

যুগল : আর কোন দিকে ছুটোছুটি না করে ভাস্করবাবুর বাড়ীর ভিতরে চুপি চুপি চড়াও হও দেখি—মাল ওখানেই পাবে।

তারক : ভাস্করবাবুর বাড়ীতে বড়মা যাবেন?

যুগল : আমি বলছি—গেছেন। আর দেরী নয়, এখনি বেরিয়ে পড়। বাবাজী, তুমি এখানে থাক। গোবর্দ্ধন আর তারক গেলেই হবে—ওরা তফাত থেকে দেখিয়ে দেবে।

চারজন ভীষণাকৃতি গুণ্ডাকে দেখা গেল—প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন :

যুগল : কাজ হাসিল করবে এরা…আমার এই দু'জোড়া বয়—

ভারি বাহাদুর ছোকরা এরা - এদের অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নেই।

* *
*

ভাস্করের বাড়ী। ভিতর থেকে দেউড়ীর দরজা বন্ধ। গোবর্দ্ধন, তারক ও গুণ্ডাগণ সন্তর্পণে বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রবেশ করল। ঈশারা ক'রে তারক দেখাল যে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গুণ্ডারা বন্ধ দরজা দেখে হাসল, তারপর টপাটপ করে কাঁধে কাঁধে উঠে প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রথম ব্যক্তি ভিতরে নামল—সেই লোক দরজা খুলে দিল। তারপর আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। উপরের দালানে কৈলাস শুয়েছিল। তাকে ডিঙিয়ে যাবার সময় সে জেগে উঠে চীৎকার করল:

কৈলাস: বড়মা! লোক এসেছে… শীগগীর দোরে খিল দাও—

বলতে বলতে কৈলাস উঠে দরজা আটকে দাঁড়াতে গেল! কিন্তু গুণ্ডারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত মুখ বেঁধে ফেলল। ভিতরে অচলা ও আরতি উঠেই ঘরে খিল দিলেন। কিন্তু গুণ্ডারা তাদের সহজসাধ্য কৌশলে খিল খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে বলল:

১ম গুণ্ডা: চুপ। চেঁচালেই কেটে ফেলব।

২য় গুণ্ডা: বাচ্চা কাঁহা হ্যায় রে—

অচলা খোকা সত্যনাথকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। আরতি সাহস সঞ্চয় করে বললেন:

আরতি: তোমরা কে? চাও কী?

২য় গুণ্ডা: চুপ—বাচ্চা কাঁহা দেখলাও।

এই সময় পাশের ঘর থেকে রবি মাটিতে বিছানো কম্বলের বিছানায় বসে চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করল :

রবি : কি হয়েছে মা ? কে ওরা—

৩য় গুণ্ডা : ঐ হ্যায়—

বলেই ৩য় গুণ্ডা রবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখ বেঁধে ফেলল, তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আরতি চীৎকার করবার উপক্রম করতেই ১ম গুণ্ডা একখানা ছোরা বার করে তাঁর গলার কাছে ধরল, তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। ইতিমধ্যে খোকা সত্যনাথ অচলার পায়ের কাছে উঠে বসে তাঁর পরণের সাদা সাড়ীর পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল, এখন ব্যাঙের মত থপ থপ করে গুণ্ডাদের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে সরে গেল।

* *
*

সিঁড়ির কাছে তারক মুখে চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে গুণ্ডার কোলে রবিকে দেখে বলল :

তারক : নেহি, নেহি, এ নেহি,—এতনা বড়া নেহি—বহুৎ বাচ্চা হ্যায়, ফিন্ দেখ—

৩য় গুণ্ডা : ম্যয় গলতি কিয়া—

বলেই সে পুনরায় রবিকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। তারক এই সময় দেখল—তফাতের একটা দরজা দিয়ে কালো রঙের একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কে একজন তাদের চোখ এড়িয়ে থপ্ থপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেছে। তারক সেখান থেকে চাপা গলায় হাঁকল :

তারক : 'আরে—বাচ্চা ভাগ্ তা হ্যায়—ধরো, ধরো—

তারকের কথায় গুণ্ডারা ছুটে এলো—তারক আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল—সবাই ছুটল তার পিছনে।

*   *
*

দেউড়ীর বাইরে ফুটপাথ। শিশু সত্যনাথ দেউড়ী থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে এসেই সামনের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। রাস্তায় লোকজন নেই। নির্জন রাস্তা ধরে সে একলাই ছুটছে।

ঘরের মধ্যে আরতি, অচলা, রবি ও কৈলাসের মুখগুলি বাঁধছে দুজন গুণ্ডা।

ওদিকে গোবর্দ্ধন, তারক এবং দেউড়ীর ভিতরে যে দুজন গুণ্ডা ছিল, তারা খোঁজাখুঁজি করছে।

একটু পরে তারক গোবর্দ্ধন ও গুণ্ডারা ভিতর থেকে বাহিরে ফুটপাথে দেউড়ীর সামনে এসে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। সত্যনাথ তখন ছুটেছে। একটু পরেই এদের নজর পড়ল তার দিকে—এরাও ছুটতে লাগল।

সত্যনাথও ছুটেছে। একটা গুণ্ডা তার কাছে এসে পড়ল—কিন্তু সত্যনাথ তার পায়ের ভিতর দিয়ে এমন একটা গোঁতা মেরে বেরিয়ে গেল যে, টাল সামলাতে না পেরে বে-কায়দায় পায়ে পায়ে জড়িয়ে গুণ্ডাটা পড়ে গেল। পরক্ষণে পিছন থেকে আর একটা গুণ্ডা লাফিয়ে এসে খোকাকে ধরতে গেল; কিন্তু এবারও খোকা তার লক্ষ্য ও নাগাল অতিক্রম করে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এক ছুটে রাস্তা পার হয়ে ওপারের ফুটপাথ ধরে ছুটল। যে গুণ্ডাটা লাফ দিয়েছিল তাকে ধরবার জন্য, সেও একটু পরে তাকে দেখতে পেয়ে পিছু নিয়ে ছুটছিল—হাত

বাড়িয়ে ধরে ধরে, এমন সময় খোকা ফুটপাথের মোড়ে বেঁকে যেতেই সেই গুণ্ডটার হাতের বাইরে চলে গেল। তখন ভীষণ রাগে ক্ষিপ্তের মত হয়ে খোকার গলাটা চেপে ধরতে গিয়েই—সামনে সাপ দেখলে সাহসী মানুষও যেভাবে ভয়ে পিছিয়ে আসে, সেই অবস্থা হলো গুণ্ডাটার···সে দেখল—রাতের পাহারাওয়ালাদের তদারককারী জমাদার তাদের দিকে পিছন ফিরে একটা গ্যাস-লাইটের পোষ্টে ঠেসান দিয়ে চুরুট ধরাচ্ছে। কাজেই সে শিউরে পিছিয়ে একটু তফাতে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। এদিকে খোকা হেঁট হয়ে সেই জমাদারের পিছন থেকে তার ছুটো পায়ের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল। জমাদারটিও এ-ব্যাপারে ত্রস্তভাবে—কোন জন্তু জানোয়ারের পাল্লায় পড়েছে ভেবে লাফিয়ে উঠে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। খোকা কিন্তু যথাস্থানে বসে প্যাট প্যাট করে চাইছে। জমাদারও যেই দেখল—জানোয়ার নয় একটা ছোট বাচ্চা ছেলে—তখন পুনরায় এগিয়ে এসে অপ্রস্তুতভাবে বলল :

জমাদার : আরে বাচ্চে—

খোকা তৎক্ষণাৎ পিছনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল :

খোকা : ঐ যে—খুন করবে।

ঝাঁ করে টর্চ জ্বেলে সেদিকে আলো ফেলতেই জমাদর দেখতে পেল—একটা গাছের তলায় জনকয়েক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে তৎক্ষণাৎ বাঁশী বাঁজিয়ে দিল, অন্য দিক থেকে তুজন পাহারাওয়ালা ছুটে এলো। কিন্তু তারা কাছে আসবার আগেই গুণ্ডারা অদৃশ্য হলো। জমাদার খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল :

জমাদার : ক্যা ভইল বা—বাতাও বাচ্চে—তুমি কোন আছে ?

খোকা : বড়বাবু।

জমাদার : য্যায়সা ? আপ্ বড়বাবু আছে ? বাড়ীমে কৌন আছে ?

খোকা : বৌ আছে—আমার বৌ।

জমাদার ও কনেষ্টবল দুইজন হো হো করে হেসে উঠল। জমাদার বলল :

জমাদার : থানামে চলিয়ে বড়াবাবু—হুঁয়া ভি বহু মিলবে।

* *
*

পুলিস থানা। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষাল এখানে সিনিয়ার ইনেসপেক্টর, প্রৌঢ় বয়স্ক সুপুরুষ। ইনি উচ্চশিক্ষিত এখনও অবসরকালে রীতিমত পড়া-শোনা করেন। বিশেষ করে জন্মান্তর ও কর্মবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় ও বিদেশীয় যাবতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করে এবং পরলোকতত্ত্বে অভিজ্ঞ স্বামী অভেদানন্দ ও অমৃতবাজার পত্রিকার ঘোষ মহাশয়দের সংস্পর্শে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। Calcutta Psychical Society নামক আধ্যাত্মিক আত্মানুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্যরূপে সুধী সমাজেও সুপরিচিত।

নৈশ ভোজনের পর শ্রীযুত ঘোষাল সাধারণত: তাঁর খাস কামরায় বসে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিবিধ গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করতে অভ্যস্ত। এরাত্রেও উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, এমন সময় জমাদার তাঁকে পথের বৃত্তান্তটি জানায়। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে বলে একটা প্রবাদ আছে। মিঃ ঘোষালের কাছেও এই সামান্য তথ্যটি অসামান্য মনে হলো,—ছেলেটির উক্তি সম্পর্কে। তিনি কৌতূহলী হয়েই জমাদারকে সুধালেন :

মিঃ ঘোষাল : লেড়কা কাঁহা হায় ?

জমাদার : হুজোরকা কামরামে।

মিঃ ঘোষাল : চলিয়ে।

উভয়েই কামরা মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ইনেসপেক্টর মিঃ ঘোষালের চেম্বার। ঘরের দেওয়ালের দিকে পাশাপাশি দু তিনটে র‍্যাক—তাতে বিবিধ ফাইল। অন্যদিকে লোহার আলমারী। মাঝখানে টেবিল, সামনে চেয়ার—অন্যদিকে দু খানা চেয়ার।

টেবিলের উপর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে রেণ্ডালের 'দি ডেড আর নেভার ডেড, স্যার অলিভার লজের 'ক্রিটিসিজম অফ হেকেনস্ রিডল্ অফ দি ইউনিভার্স,' কবি মৌলানা জালালুদ্দীন রুমিস 'বুস্তেশ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির উপর লক্ষ্য পড়লেই উপলব্ধি করা যায়, যিনি এখানে বসে পড়াশোনা করেন, পুলিস বিভাগের কর্মী হলেও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। মিঃ ঘোষাল ও জমাদার ঘরে ঢুকে দেখেন—শিশু সত্যনাথ টেবিলের উপর দিব্যি গম্ভীর মুখে স্থিরভাবে বসে আছে।

মিঃ ঘোষাল : এই লেড়কা?

জমাদার : জী হুজৌর—

মিঃ ঘোষাল : তুমি কে হে খোকা?

সত্যনাথ : আমি বড় বাবু—সিধু।

মিঃ ঘোষাল : বড় বাবু—সিধু?

সত্যনাথ : হুঁ—

মিঃ ঘোষাল : বাড়ী কোথায়?

সত্যনাথ : ঐ দিকে—

মিঃ ঘোষাল : কে আছে বাড়ীতে?

সত্যনাথ : আমার বৌ :

রয়েছে। একটা হোচ্ছে—বিজনেস লিকুইডেসনে দেওয়া; তার মানে—৮০ বছরের এই বনেদী প্রতিষ্ঠানটির গলা টিপে মারা। অপর পথ—একে ঢেলে সেজে নূতন ম্যাটমস-ফিয়ারে জাঁকিয়ে তোলা। প্রথম পথে গেলে আপনাদের পাওনার চার আনাও উসুল হবে না; কিন্তু বিজনেস্ বজায় থাকলে আপনাদের সমস্ত পাওনা-গণ্ডা ব্যাজশুদ্ধ উসুল হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং পরস্পরের সম্বন্ধে আরো নিবিড় হবে।

১ম মহাজন (পাকড়াসী): হ্যাঁ—সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি মূলে হাবাদ হবার ভয়ও আছে। আরও মাসকয়েক কারবার চালিয়ে যেটুকু রস আছে সব শুষে নিয়ে, শেষে যখন ছোবড়া ছেড়ে দেবেন—তখন তা থেকে আমাদের পাওনার এক পাইও উসুল হয়ত হবে না।

২য় (সারখেল): তবে একটা কথা আছে। সিধুবাবু সাবেক চালেই কারবার চালাবেন বলে যদি জানাতেন, তাহলে হয় ত এই ভয় থাকত। কিন্তু ভাস্করবাবু যখন ঢেলে সাজাবার কথা বলেছেন, আর নিজেও মাথা দিচ্ছেন—তখন ···

পাকড়াসী: বললেন ত অনেক কথাই, কিন্তু কথায় কি শুধু চিঁড়ে ভেজে বলতে চান? এই সঙ্গে টাকার বিলিবন্দেজ যদি কতক কতক করতেন, তাহলে ওকথা মানা যেত। আমি মশাই, রাজি নই।

সারখেল: আপনি যদি রাজী না হন ত, আমাদেরই বা দায় কিসের? আমিও রাজী নই।

আরো দুই তিনজন একসঙ্গে পাকড়াসীর উক্তির সমর্থন করিয়া 'রাজি

শুনেই মিষ্টার ঘোষাল হো হো করে হেসে উঠেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে সত্যনাথের পিঠ চাপড়ে বললেন :

মিঃ ঘোষাল : এরই মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছ খোকা? তা বৌ কোথায়?

সত্যনাথ : বাড়ী—কাঁদছে।

মিঃ ঘোষাল : কাঁদছে? সে কি! কেন?

সত্যনাথ : আমাকে খুন করবে বলে।

মিঃ ঘোষ : খুন করবে তোমাকে? কে?

সত্যনাথ : ভূতো—

মিঃ ঘোষাল : ভূতো কে?

সত্যনাথ : জাননা—ছোটবাবু। ঐত আগে আমাকে খুন করে।

মিঃ ঘোষাল : আগেই তোমাকে খুন করেছিল?

সত্যনাথ : হ্যাঁ গো—এখন আবার খুন করবে।

মিঃ ঘোষাল : বটে! দু' দু-বার খুন করবে তোমাকে? কেন বলত?

সত্যনাথ : আবার যে আমি এসেছি, তাই।

মিঃ ঘোষাল : আবার যে তুমি এসেছ....তাই? বটে! কিন্তু খুন করবে কেন?

সত্যনাথ : আমি যে বড় বাবু—তাই খুন করবে।

মিঃ ঘোষাল : তাইত! কেসটা যে মিষ্টিরিয়াস মনে হচ্ছে—এ ছেলে তো সাধারণ নয়। জমাদার, আমি নিজে এটা এনকোয়ারী করব—যেখান থেকে একে নিয়ে আসা হয়েছে, সেইখানে একে নিয়ে যেতে চাই।—ওহে খোকা, তুমি এখন কোথায় যেতে চাও?

সত্যনাথ : বৌ কাছে যাব।

মিঃ ঘোষাল : তাই চলো—

* *

*

যুগল মোক্তারের বাড়ী। যুগল মোক্তার, ভূতনাথ, গোবর্দ্ধন ও গুণ্ডাগণ। যুগলবাবু অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে করতে বলছেন :

যুগল : কি সর্বনাশ! পুলিসের খর্পরে পড়ে গেলে—হিতে বিপরীত হয়ে গেল যে!

গোবর্দ্ধন : তারককে পাঠিয়েছি—ফলো করে থানায় যেতে। ঐ যে—তারক এসে গেছে।

এই সময় তারক হন্তদন্ত হয়ে দ্রুতপদে এসে বলল :

তারক : বিচ্চু ছেলে মামাবাবু! থানায় কি বলেছে জানতে পারিনি; তবে থানা অফিসার তাকে কোলে করে নিয়ে চলেছে দেখে এলুম—

যুগল : বল কি? কোন দিকে গেল?—কোন রাস্তায়?

তারক : ভাস্কর বাবুর বাড়ীর দিকেই যেতে দেখে এলুম।

যুগল : ম্যাঁ—তাহলে সিধুবাবুর স্ত্রী···হ্যাঁ, এখনো একটা সুরাহা আছে! বাবাজী, তুমিই এখন শক্ত হয়ে কেসটা ঘুরিয়ে দিতে পার। গাড়ী নিয়ে তুমি এখনই বেরিয়ে পড়—একলাই ভাল। আচ্ছা—শুধু তারককে সঙ্গে নাও।

ভূতনাথ : তারপর—কি করব? কি বলব?

যুগল : কানে কানে বলে দিই, এসো; মুখস্থ করে নাও—

যুগল মোক্তার এগিয়ে গিয়ে ভূতনাথের কাঁধটা বাম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন।

* *

*

রাস্তার সেই সংযোগ স্থল। ইনেসপেক্টর ঘোষাল সত্যনাথকে কোলে করে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলেন। তাঁদের আগে আগে সেই জমাদার ও দুজন কনেষ্টবল পূর্বস্থানে এসে বলল:

জমাদার: হিঁয়াসে ইস্কো মিলা হুজৌর।

মিঃ ঘোষাল: এখন বলতো বড়বাবু—কোন্ বাড়ী?

সত্যনাথ: ঐ দিকে। (নীরবে হাত বাড়িয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিল; ইনেসপেক্টর ও পুলিসের লোকগুলি সেইদিকেই—রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকের ফুটপাথে উঠে—মোড় ঘুরে অদৃশ্য হলেন।)

এই সময় খানিক তফাতে ভূতনাথ মোটর চালিয়ে আসছিল। তার পাশে তারক উপবিষ্ট।

তারক: আর একটু আগে—ঐ মোড়টার কাছে।

ভাস্করের বাড়ীর দেউড়ীর সামনে—ফুটপাথের উপর ইনেসপেক্টর মিঃ ঘোষাল শিশু সত্যনাথকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে জমাদার ও কনেষ্টবলদ্বয়। রুদ্ধ দরজার কড়া ধরে নাড়া দিচ্ছেন ইনেসপেক্টর, তাঁর কোলে থেকে সত্যনাথও ডাকছে:

সত্যনাথ: বৌ! বৌ!, বৌ!

উপরের বারাণ্ডা থেকে কৈলাস উঁকি দিয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল:

কৈলাস: ওগো বৌমা—দেখেন দেখেন, খোকাবাবুকে কারা এনেছেন; ঐ শোনেন—খোকাবাবু ডাকছেন তোমাকে—

অচলাও বারাণ্ডায় এসে—উঁকি দিতেই পুলিস দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে পিছিয়ে গেলেন। সত্যনাথ তখনো ডাকছে :

সত্যনাথ : বৌ! বৌ! আমি এসিছি।

মিঃ ঘোষাল : (উপরের দিকে তাকিয়ে) ওহে বাপু—দরজা খুলে দাও, আমরা বড়বাবুকে এনেছি।

ততক্ষণে নীচে নেমে গিয়েছে কৈলাস। দরজা খুলে দিতেই ইনেসপেক্টর ঘোষাল বললেন :

মিঃ ঘোষাল : এই বাচ্চা বড় বাবুটির বৌটিকে একবার নীচে আসতে বলতো—কথা আছে।

কৈলাস : এজ্ঞে—

মিঃ ঘোষাল : বল তাঁকে, লজ্জার বা ভয়ের কিছু নেই—আমি ওঁর ছেলের মত।

ভিতরে গিয়েই পুনরায় বেরিয়ে এসে ইনেসপেক্টরকে কৈলাস বলল :

কৈলাস : আসুন—বৌমা এসেছেন।

নীচের ঘর। রবি পড়াশোনা করে এই ঘরে। একখানা টেবিল—সামনের চেয়ারে মিঃ ঘোষাল বসেছেন। ভিতরের দরজার কাছে খোকাকে কোলে করে মাথায় ঘোমটা দিয়ে অচলা মিঃ ঘোষালের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন :

মিঃ ঘোষাল : ছেলেটির সঙ্গে আপনার সত্যিকার কি সম্বন্ধ বলুন তো?

অচলা : আমার দেওরের ছেলে। দেওর আমাকে বৌমা বলে ডাকে, তাই শুনে খোকাও বৌ বলে।

মিঃ ঘোষাল : ও-হো—বটে। আচ্ছা—ভূতো কে?

অচলা : সেই আমার দেওর—ভালো নাম ভূতনাথ।

মিঃ ঘোষাল : আচ্ছা, ঐটুকু ছেলে যে সব কথা বললে—তার মধ্যে জানবার মত কিছু কিছু আছে। তাছাড়া আজকের ব্যাপারটাও শোনা দরকার—বলবেন আমাকে সব কথা?

অচলা : বলব। কিন্তু সে যে অনেক কথা—দারগাবাবু! আপনি—

মিঃ ঘোষাল : আপনি বলুন—আমি শুনবো। কিছুই চাপবেন না।

ভূতনাথ এই সময় পথের সেই সংযোগ-স্থানে মোটরে বসে সিগারেট টানছিল। তারক দ্রুতপদে কাছে এসে বলল :

তারক : সব গেঁজে গেছে। দরজায় কড়া পাহাড়া বসেছে। মনে হচ্ছে সব জানাজানি হয়েছে।

ভূতনাথ : তাহলেও যেতে হবে—মামাবাবু কাণে কাণে যে মন্তর দিয়েছেন, তাতেই সব মাত হয়ে যাবে। উঠে আয়।

ভূতনাথ মোটরে ষ্টার্ট দিল।

•

ভূতনাথ মোটর চালিয়ে এসে বাড়ীর দেউড়ীর সামনে গাড়ী থেকে নামল। দরজা আটকে জমাদার ও কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে ছিল। ভূতনাথকে মটর থেকে নামতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। ভূতনাথ রীতিমত আভিজাত্যের ভঙ্গিতে বলল :

ভূতনাথ : দারোগাবাবু কি একটা ছেলেকে নিয়ে এ বাড়ীতে এন-কোয়ারী করতে এসেছেন?

জমাদার : জী। লেকেন ইসমে আপকো ক্যায়া জরুরৎ?

ভূতনাথ : ও ছেলে আমার—আমি থানা থেকেই আসছি।

জমাদার : তব চলিয়ে।

জমাদার ভূতনাথকে ভিতরে নিয়ে গেল।

বাহিরের ঘরে বসে তখনো মিঃ ঘোষাল অচলার চাপা কণ্ঠের কথা শুনছিলেন। এই সময় বললেন :

মিঃ ঘোষাল : দাস ফ্যাক্টরীর সেই দুর্ঘটনার ব্যাপারে মামলার খবর আমি খবরের কাগজে পড়েছিলুম। এখানে এসেও শুনেছি। কিন্তু আজ—'

এই সময় বাহিরের দরজার কাছে ভূতনাথকে সত্যনাথ দেখতে পেয়েই সভয়ে চীৎকার করে উঠল :

সত্যনাথ : বৌ! বৌ! ভূতো। ঐ ছাখ্—আবার আমাকে খুন করবে।

মিঃ ঘোষাল দরজার দিকে চাইতেই ভূতনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করে তাড়াতাড়ি বলল :

ভূতনাথ : আমারই ছেলে দারগাবাবু! সন্ধ্যা থেকে একে খুঁজে হায়রান! আপনি হয় তো ঐটুকু ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা শুনে অবাক হচ্ছেন! কিন্তু ওসবই শেখানো—পাগলের কাণ্ড।

মিঃ ঘোষাল : তার মানে—

ভূতনাথ : দাদার অপমৃত্যুর পর বৌমার মাথা খারাপ হয়ে যায়; তার পর—আমার ছেলে হবার পর উনি ধরে নেন—আমার দাদাই ফিরে এসেছেন; ছেলের জ্ঞান হতেই ঐ কথা তাকে

বোঝাতে থাকেন। এখন উনি ঘোর উন্মাদ—আপনি একটা ভীষণ প্রকৃতির পাগলীর সঙ্গে কথা বলছেন!

এ-কথা শুনে চোখ দুটো বড় করে ভূতনাথের মুখে রেখে অচলা বলে উঠলেন:

অচলা: ভূতো—

মিঃ ঘোষালও এমন একটা বিকৃত ভঙ্গিতে তাকালেন যে, দেখলে মনে হয় তিনিও যেন ভয় পেয়েছেন!

মিঃ ঘোষাল: ইনি পাগলী? প্রকৃতিস্থা নন? তা হলে—

ভূতনাথ: ঘরে বন্ধ করে রাখতে হয়—এমনি অবস্থা স্যার! আজ সন্ধ্যের দিকে ঘর খোলা পেয়ে খোকাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। সেই থেকে আমরা চার দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। উঃ! কি ভোগান্তি। এখন আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন, আমি এঁদের বাড়ী নিয়ে যাই।

মিঃ ঘোষাল: আপনিই যখন বর্তমানে এঁদের অভিভাবক, তার ওপর যে কথা বললেন, আইনের দিকে চেয়ে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য। বেশ, আপনি—

অচলা: দারোগাবাবু—

আরো কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল অচলার, কিন্তু কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। ভূতনাথ তৎক্ষণাৎ তৎপরতার সঙ্গে বলে উঠল:

ভূতনাথ: এঁকে খোলা অবস্থায় রাখাও নিরাপদ নয় স্যার! হয়তো এখুনি—

মিঃ ঘোষাল: তাই নাকি—

সন্দিগ্ধ ও সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মিঃ ঘোষাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অচলার দিকে চেয়ে বললেন:

মিঃ ঘোষাল : মা, আপনার দেবরের সঙ্গে খোকাকে নিয়ে বাড়ী যান! বড়বাবু—বাড়ী যাও, বাবা নিতে এসেছে।

সত্যনাথ : বাবা না—ভূতো। যাব না—আবার খুন করবে। আমি যাব না—বৌ! আমি যাব না—

সত্যনাথ দুহাতে অচলার গলা জড়িয়ে ধরল। অচলা এবার ঘোমটা খুলে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চেয়ে অস্বাভাবিক স্বরেই বলে উঠলেন :

অচলা : দারগাবাবু—এ দেখেও আপনি! উ! সব শুনেও আমাকে পাগল ভেবে— হা ভগবান! বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, সত্যিই আমি পাগল নই! বিশ্বাস করুন—আমাদের নিয়ে গিয়ে খুন করবে—সত্যিই খুন করবে।

সত্যনাথ : আমি যাব না—ভূতো আমাকে খুন করবে।

ভূতনাথ : দিনরাতই এই বুলি হয়েছে স্যার!

মিঃ ঘোষাল : বুঝেছি!—হ্যাঁ, ভয় নেই আপনার মা, সব কথাই তো শুনিছি। আমি বলছি—খুন করবেন না, বা, কোন রকম অন্যায়ও কিছু করবেন না উনি। আর দেখুন, ওঁরই যখন ছেলে, আমরা তো আটক করে রাখতে পারিনে। আপনারও উচিত নয়—এভাবে বাইরে থাকা। আপনি এঁদের নিয়ে যান ভূতনাথ বাবু। আর—মা, ছেলে ভেবে আমার কথা রাখুন; আপনার দেবরের সঙ্গে বাড়ী যান—আমি বলছি।

* *
*

ভাস্করবাবুর বাড়ীর সামনে—মোটরের ভিতরে সত্যনাথকে নিয়ে অচলা বসেছেন। ভূতনাথ মোটরে ষ্টার্ট দিচ্ছে—পাশে তারক। ফুট

পাথের উপর মিঃ ঘোষাল, জমাদার ও কনেষ্টবলেরা দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রাকালে ভূতনাথ অভিবাদন জানাল—মিঃ ঘোষালও সহাস্যে প্রত্যভিবাদন করলেন। গাড়ীর ভিতর থেকে সত্যনাথ চীৎকার করছিল বরাবর।

সত্যনাথ: আমি যাব না—ভুতো আমাকে আবার খুন করবে! আমি যাব না—আমি যাব না—বৌ! আমি যাব না।

গাড়ী চলেছে—সত্যনাথের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ক্রমশঃ মিঃ ঘোষালের মুখখানা গম্ভীর হতে লাগল। এই সময় জমাদার বলল:

জমাদার: য়্যায়সা হাল কভি দেখা নেহি। মালুম হায়—হুজুর কুছ গলতি কিয়া...

মিঃ ঘোষাল: নেহি—ঠিক হায়, ঘাবড়াইয়ে মত!

জমাদার: হুকুম ফরমাইয়ে তো উনকো পিছে তন্‌কি লাগানেসে ইস্তেজাম—

মিঃ ঘোষাল: কুছ জরুরৎ নেহি—ওহি আওরত কো দেমাক সুস্থ নেহি হায়—বাওরা বন্ গিয়ে। জল্‌দি থানেমে চলিয়ে—জরুরী কাম হায়।

দাস-বাড়ীর দেউড়ীর সামনে মোটর এসে থামল। ভূতনাথ নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল:

ভূতনাথ: নাম। খোকা বুঝি ঘুমিয়েছে? চেঁচিয়ে গলাখানা চিরে যায় নি তো?

অচলা সত্যনাথকে কোলে করে নীরবে নেমে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। ভূতনাথ তারককে বলল:

তারক: ঝাঁ করে মামাবাবুদের নিয়ে এসো; আমি ওদের হাজতের ব্যবস্থা করেই আসছি।

তারক গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী কিছুদূর যেতেই পুলিসের দলটির সঙ্গে দেখা হলো। মোটর থামিয়ে মিঃ ঘোষাল সদলবলে গাড়ীতে উঠে বললেন: আমাদের থানায় নামিয়ে দেবেন। চলুন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে করতে যাই।

দাসবাড়ীর অন্দরমহলের সেই দালান। একটা ঘড়ি থেকে বারোটা বাজল। নিদ্রিত সত্যনাথকে কোলে করে অচলা তাঁর ঘরের দিকে চলেছেন—পিছনে ভুতনাথ। দালানে আলো নেই—ভুতনাথ টর্চের সুইচ টিপে আলো দেখাচ্ছিল। এই সময় দালানের ইলেকট্রিক সুইস খুলে দিল—আলোকিত হলো দালান। ঘরের দরজায় ভুতনাথ তালা লাগিয়ে গিয়েছিল। অচলা দরজার কাছে এসে ফিরে তাকাতেই ভুতনাথ বলল:

ভুতনাথ: আমি ঘরে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলুম—খুলে দিচ্ছি।

বলেই ভুতনাথ চাবি বার করে তালা খুলে দিতে অচলা ঘরে ঢুকল। ভুতনাথ তাড়াতাড়ি সুইস টিপে আলো জেলে দিয়েই—ঝাঁ করে অপ্রস্তুত অচলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অচলা তখন খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দেবার জন্য কোল থেকে নামাবার উদ্যোগ করছেন এবং বিছানার তছনছ অবস্থা দেখে শিউরে উঠছেন—ঠিক সেই সময় ভুতনাথ তাঁর কোল থেকে খোকাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা টেনে তালা লাগিয়ে দিল। অচলা প্রথমে হতচকিত হ'লেও পরক্ষণে সামলে নিয়ে দরজার উপর পড়ে চীৎকার করে উঠলেন:

অচলা: খোকাকে দে ভূতো—তোর পায়ে পড়ি, খোকাকে দে—

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় জোরে জোরে ঘা দিতে লাগলেন। বাইরে থেকে ভুতনাথ মুখখানা বিকৃত করে শ্লেষের সুরে উত্তর দিল:

নই' বললেন। প্রবীণ মহাজন রামলোচন শেঠজী এতক্ষণ নীরবে এঁদের কথা শুনছিলেন। এই সময়ে তিনি বললেন :

শেঠজী : হাঁ-হাঁ—গোস্মা মত করিয়ে বাবুজী! একবার ত ইয়াদ করেন—সিধুবাবু বহুৎ সিধা আদমী আছেন, উনার নিয়ত ভি খাঁটি আছে। হামি লোক বাবুজীর পিতাজীকে রূপিয়া দিল—সেই দেনা উনির উপর চাপিল। রামজীর ইচ্ছা হইল—ভাস্কর বাবু মদত দিতে আসিল, হামিলোকের ভি মদত মাঙিল। এখন আপনে আপনে দিলসে বিচার করিয়ে কহেন—হামি লোক কি করবে?

সারখেল : তাইত! শেঠজী যে আবার নতুন করে ভাবিয়ে দিলেন।

শেঠজী : আগাড়ি হামিলোক আপনকার মধ্যে সলা করিবে—পিছে রায় দিবে—

পাকড়াসী : ভাল কথা—চলুন আমরা ওদিকে গিয়ে পরামর্শ করি।

বাহিরের দরদালানে গিয়ে মহাজনরা পরামর্শ করতে লাগলেন :

পাকড়াসী : আমার সাফ্ কথা হোচ্ছে—টাকা চাই।

বক্সী, মিহির প্রভৃতি : আমাদেরও ঐ কথা—টাকা চাই।

শেঠজী : টাকা হামিও চায়। লেকেন কে দিবে টাকা? কারবার দেওলা মরিলে হামিদের টাকা দরিয়ার বিচমে গির যাইবে।

পাকড়াসী : শেঠজী কি করতে বলেন?

শেঠজী : দেখিয়ে—আপনকার পাওনা ২০ হাজার। হামি পাবে তিন লাখ। হামি চায়—কারবার জিন্দা রহে। লেকেন হামি জানে—ভাস্কর বাবু বহুৎ লায়েক আদমী আছেন, পাটনা ফ্যাক্টরীর খবর হামি রাখে—বিশশোয়াস্ হামি করে ভাস্কর

ভূতনাথ : আর খোকাকে নিয়ে তুমি ভূতোকে খুনের দায়ে ফেলবার মতলবটা চুটিয়ে চালাও—কেমন ? পাগলামী ঢের হয়েছে, এখন ভালো চাও তো মুখ বুজিয়ে ... ঘরের মধ্যে বসে থাক।

ইতিমধ্যে সত্যনাথ জেগে উঠে ভূতনাথের কোল থেকে চেঁচিয়ে উঠল :

সত্যনাথ : বৌ! বৌ! এই ছাখ—ভূতো—

ভূতনাথ ঠাস করে খোকার গালে সজোরে এমন একটা থাপড়া লাগালো যে, আর্তস্বরে সে ককিয়ে উঠল :

সত্যনাথ : উঃ! বউ গো—

বাড়ীর ঝি রাঁধুনি সব গোলমাল শুনে তখন ছুটে এসেছে। ভূতনাথ তাদের লক্ষ্য করে বলল :

ভূতনাথ : বৌমার মাথা বিগড়ে গেছে—বদ্ধ উন্মাদ এখন। গোল কোর না—নীচে যাও ...

তাদের মুখে কথা নেই—নীরব নিস্তব্ধভাবে চেয়ে রইল। ভূতনাথ খোকার মুখখানা চেপে নিজের ঘরের দিকে দ্রুতপদে চলে গেল।

নিজের ঘরের দরজার সামনে খোকাকে নিয়ে ভূতনাথ এসেছে এবং দুর্গাও গোলমাল শুনে বেরুবার জন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে—সেই অবস্থায় স্বামীকে দেখে স্তব্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল। ভূতনাথ তাকে ঠেলে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগল :

ভূতনাথ : আর যেতে হবে না—বামাল নিয়ে গুজরত খোদ ফিরে এসেছে—দেখছ তো! বৌমা খোকাকে নিয়ে কোথায় পালিয়েছিল, জেনেও বলবে না বলে কোট ধরেছিলে না?

এখন দেখছ ? বৌমাকেও ধরে এনেছি, তারপর—তালাবন্ধ করে রাখতে হয়েছে তার ঘরে। ক্ষেপে উঠেছে কিনা—যাকে বলে বদ্ধ পাগল !

দুর্গা : না, না, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না !—দিদি—হ্যাঁ, আমি দিদিকে—

ভূতনাথ : থাক্—দিদির সঙ্গে সলা করে নিজের স্বামীকে ফাঁদে ফেলবার মতলব ফাঁস হয়ে গেছে। এখন তুই ঘরে তুই জায়ের হাজতবাস চলুক—বসে বসে ঘরের কড়িকাঠ গুণতে থাক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে—পাগলা গারদে পাঠাতে হবে জেনো। ···চললুম।

সত্যনাথ এই সময় একটু ফাঁক পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

সত্যনাথ : বৌ কাছে যাবো—ভূতো না, ভুতো না, আবার আমাকে খুন করবে—

ভূতনাথ খোকার মুখ চেপে ধরে—

ভূতনাথ : চুপ—বলছি।

দুর্গা : ওগো তোমার পায়ে পড়ি—খোকাকে দাও আমার কাছে, তোমার পায়ে পড়ি—

দুর্গা ভূতনাথের পদতলে বসে পা দুটো আঁকড়ে ধরলো।

ভূতনাথ : ভূতোর পা দুটো ভুতোর চেয়েও শক্ত—এই ত্যাখ—

এমন জোরে পা ছাড়িয়ে নিল যে দুর্গা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে 'মাগো' বলে পড়ে গেল। খোকাও চীৎকার করবার চেষ্টা করল—কিন্তু ভূতনাথ তার মুখ চেপে ধরে ঘরের বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

তালার শব্দের সঙ্গে বাইরে থেকে চিমটার আঙটা বাজার শব্দ মিলিয়ে গেল।

* *

*

বাড়ীর বাহিরে রাস্তা। কালো পোষাক পরা কালো চুল দাড়ী-ওয়ালা এক মুস্কিল আসান ফকির। এক হাতে আঙটাওয়ালা চিমটা বাজাতে বাজাতে—অন্য হাতে একটা পাত্রে বসানো প্রদীপ নিয়ে চলেছে। তার মুখের বুলি হচ্ছে—"মুস্কিল আসান হোক, মুস্কিল আসান!"

রাস্তার আর এক অংশ। তারক চালিত মোটরে যুগল মোক্তার ও গোবর্ধন দাসবাড়ীর অভিমুখে আসছে।

'মুস্কিল আসান' ফকির এমন ভাবে দাসবাড়ীর সন্নিহিত পথের উপর দাঁড়িয়ে মুস্কিল আসানের বয়েৎ বলছেন—তারক গাড়ীর গতি যেজন্য কমাতে বাধ্য হলো। ফকিরও সেই ফুরসদে গাড়ীর পাশে এসে হাতের প্রদীপ্ত চেরাগটি গাড়ীর মধ্যে ধরে যুগল মোক্তারকে দেখল ও তাঁকে উদ্দেশ করে বলল :

ফকির : য্যায় খোদা—তেরা মুশকিল সব আসান করে—

যুগল মোক্তার সক্রোধে বললেন :

যুগল : ভাগো—পাজী বদমাস চোট্টা—

ফকির কোমর থেকে চামর খুলে তাঁর মাথায় বুলিয়ে দিলেন। যুগল সেটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন :

যুগল : ভাগ্—হিঁয়াসে ভাগ্। জালাতন—রাতেও নিস্তার নেই।

গাড়ী দাসবাড়ীর দেউড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। ওদিকে দেখা গেল, ফকির বাড়ীর বাহিরের দিকে রকের উপর উঠে জ্বলন্ত প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিচ্ছে।

* *
*

নীচের বৈঠক ঘরে যুগল মোক্তার, গোবর্দ্ধন, তারক, ভূতনাথ, খোকা সত্যনাথ প্রভৃতি সবাই উপস্থিত। সত্যনাথকে নিজের কাছে বসিয়ে যুগল মোক্তার ভোলাবার চেষ্টা করছেন, কারণ ভূতনাথ খোকার মুখ চেপে এঘরে আনার পর—সেই-যে সে কান্না সুরু করেছে, সে কান্না এখনো থামে নি। যুগল মোক্তার পকেট থেকে কাগজে মোড়া লজেন্স বার করে খোকার হাতে দিয়ে বললেন :

যুগল : এই নাও দাদু—লেবনচুষ খাও—দেখ, কেমন লাল টুক্ টুক্ করছে—

সত্যনাথ নেবার আগ্রহ দেখাল না। সরোদনে বলল :

সত্যনাথ : উঁহু—না—

পিঠে আদরের ভাবে হাত রেখে—

যুগল : না কেন দাদু—খাও, খেয়ে দেখ কেমন মিষ্টি—

খোকার হাতে গুঁজে দিলেন। সত্যনাথ ড্যাপ ড্যাপ করে চেয়ে বলল :

সত্যনাথ : বৌ কাছে যাবো।

যুগল : বাবার কাছে যাবে না দাদু?

সত্যনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানালো—যাবে না।

তেমনি করে গায়ে হাত বুলিয়ে যুগল মোক্তার বলতে থাকেন :

যুগল : ছিঃ দাদু! ও কথা কি বলতে আছে? বাবা কত ভালবাসবে—খাবার দেবে, খেলনা দেবে—ঐ দেখ দাদু—বাবা তোমাকে—

সত্যনাথ : বাবা না—ভূতো। বৌকে মেরেছে, আমাকে মারবে, আমি যাব না, আমি যাব না—

গোবর্দ্ধন : তাহলে আমার কাছে এসো খোকা!

গোবর্দ্ধনকে চোখ তুলে দেখে শিউরে উঠে বলল :

সত্যনাথ : না-না-না—তুমি না—তুমি না—যাব না—

যুগল : ওকে দেখে অমন করে উঠলে কেন দাদু? ওকে চেন?

সত্যনাথ : হুঁ। গোবরঢোন্—দুষ্টু—মিথ্যুক—পাজী—

একথা শুনে সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন।

যুগল : কেন—গোবর্দ্ধন কি করেছে?

সত্যনাথ : ঐ তো মিথ্যে করে ভূতোকে…(সহসা উত্তেজিত হয়ে) ভাস্কর কই—ভাস্কর? ভাস্কর… ভাস্কর—

কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিকৃত করে সত্যনাথ ঢলে পড়ল। যুগল মোক্তার দুই হাতে তাকে ধরে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগলেন : দাদু—দাদু। কি হলো?—ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি।

ভূতনাথ : এমনি হচ্ছে ইদানীং। জোরে জোরে তড়বড় করে আবল তাবল বকেই ঝিমিয়ে পড়ে—

যুগল : আবল তাবল বকুনি নয় বাবাজী—তোমার ছেলের কাণ্ড দেখে আমার পীলে পর্য্যন্ত কেঁপে উঠছে আশঙ্কায়। ঐযে দেবতার ভর হয় শোননি, এও সেই রকম।…এখন কি

করেই বা না বলি—সিধু বাবুই তোমার ছেলে হয়ে দুর্গার গর্ভে জন্মেছেন? ওর কথার ভাব হোচ্ছে—মরে গেলেও ওর আত্মা জেনেছিল—গোবর্দ্ধন পুলিসকে যা বলেছে মিথ্যে অর্থাৎ কি না, ভাস্কর সিধুকে মারেনি; কিন্তু মৃতের আত্মা তো কথা বলতে পারে না, তাই আবার এসেছে সে কথা বলবার জন্য। তাহলেই বোঝ ব্যাপার বাবাজী—

ওদিকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্রোটন গাছের ডালপালায় আবৃত বাহিরের বারাণ্ডায় উপবিষ্ট 'মুস্কিল আসান' উৎকর্ণ হয়ে ভিতরে এঁদের সংলাপ সব যে শুনছিলেন, সেদিকে কারও লক্ষ্য পড়েনি।

ভূতনাথ: এখন কি করতে বলেন?

যুগল: এ ছেলেকে যদি না সরাও কিছুই চাপা থাকবে না। উপস্থিত যে ব্যাপার—তাতে আমরা ক'জন ছাড়া আসল ব্যাপার আর কেউ জানে না, এরপর সবাই জানবে, আর পুলিসের কানে উঠতেও দেরী হবে না।

ভূতনাথ: তাহলে আপনি কি ওকে মেরে ফেলতে চান?

যুগল: বুঝতেই তো পারছ বাবাজী—জানাজানি হোলে বিপদ শুধু তোমার একারই নয়—সবাই আমরা জড়িয়ে পড়ব। কাজেই প্রয়োজন হলে হাত ঘুরিয়ে নাক দেখাতে হবে বৈকি। তবে এবাড়ীতে কিছুতেই ছেলেকে রাখা হবে না।

ভূতনাথ: তাহলে—

যুগল: যেমন যুক্তি দিয়ে তোমার বৌমাকে পাগল সাজিয়েছি; তেমনি কাল সকালে সবাই জানবে—রাতে খোকার শক্ত ব্যামো হয়, তাই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার মানে, এই রাতেই আমি একে এই ঘুমন্ত অবস্থায় আমার

দুর্গাপুরের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই—সেইখানেই খোকা থাকবে। আর দেরী নয়—গোবর্দ্ধন, খোকাকে কোলে নাও হে!

বাড়ীর ফটক থেকে একটু তফাতে একটা গাছের তলায় রাস্তার একপার্শ্বে মটরখানা দাঁড়িয়ে আছে। গোবর্দ্ধন নিদ্রিত সত্যনাথকে কোলে করে মোটরের কাছে এসেছে—পিছনে যুগল মোক্তার। তারক গাড়ীতে আলো জ্বেলে ষ্টার্ট দিচ্ছে—এমনি সময় কতিপয় পুলিস প্রহরী এসে ঝাঁ করে খোকাকে তুলে নিয়ে স্তম্ভিত গোবর্ধনের হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ঘোষাল নিজেই যুগল মোক্তারের হাতে হাতকড়ী লাগালেন। যুগল মোক্তার এই অবস্থায় ক্রুদ্ধস্বরে বললেন:

যুগল মোক্তার: জানো আমি কে?

মিঃ ঘোষাল: জানি। খানিক আগে যে মুস্কিল আসানের সঙ্গে পথে আপনার মুলাকাৎ হয়েছিল, সেলামী চাইতে গাল দিয়ে ভাগাতে চেয়েছিলেন, সে কিন্তু আপনাকে ফলো করে ঐ এঁদো বকটার ওপরে বসে ঘরের ভিতরের সব কথা শুনেছিল। এই দেখুন—তার পোষাক আর প্রদীপ! বুঝতেই পারছেন, এরপর আপনাকে জানতে আর বাকি নেই।

তারক ইতিমধ্যে চুপি চুপি সরে পড়ছিল—কিন্তু সতর্ক পাহারাওয়ালারা তাকে ধরে ফেলল। মিঃ ঘোষাল তার দিকে চেয়ে বললেন:

মিঃ ঘোষাল: তুমি তো আমাদের চেনা হে। এই গাড়ীতে থানায় নিয়ে গিয়েছিলে, এখন আর একবার নিয়ে চলো। তোমার ভয় নেই, সব ব্যাপারটা খুলে বললে তোমাকে য়্যাপ্রুভার অর্থাৎ রাজার সাক্ষী করে নেওয়া যাবে।

যুগল মোক্তার এই সময় মিষ্টার: ঘোষালকে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন:

যুগল: একটা কথা আমি বলতে চাই আপনাকে—

মি: ঘোষাল: স্বচ্ছন্দে বলুন। একটা কেন আপনার হাজার কথা এখন আমি শুনতে বাধ্য।

মি: ঘোষালের কানের কাছে মুখ রেখে চাপা গলায় যুগল মোক্তার বললেন:

যুগল: রাতারাতি বড়লোক হোতে চান দারোগা বাবু? এক থোকে পঞ্চাশ হাজার পাবেন—কেসটা আপনি···

মি: ঘোষাল: বুঝেছি! এমনি হাত দরাজ করে আ[illegible] ব্যাপারে 'উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়েছিলেন! [illegible]র্ষ— সেই লোকই আপনি—মুস্কিল আসানকে একটা পয়সা দিতেও হাত তোলেন নি!

যুগল: ভালো, পঞ্চাশের ওপর আরো পঞ্চাশ—রাজী হোন [illegible]ার ইনেসপেক্টর!

মি: ঘোষাল: তাহলে আমাকেও বলতে হয় মিষ্টার বিশ্বাস পুলিস অফিসার হোলেও ও-ভাবে বড় মানুষ হবার স্বপ্ন আমি কখনো দেখিনি। তার ওপর—আমি হচ্ছি একজন পাকা স্পিরিচুয়ালিষ্ট—জাতিস্মর হয়ে জন্মানো যে সম্ভব, আর তার পিছনে এই ধরণেরই কোন সমস্যা প্রচ্ছন্ন থাকলে, তার সমাধানের জন্যই আত্মা জন্মগ্রহণ করে, আমি যে শুধু এসব বিশ্বাস করি তা নয়, তারই চর্চা করে আসছি দীর্ঘ একটা যুগ ধরে। আমার এই সাধনা সত্য প্রতিপন্ন করার

আনন্দের কাছে আপনার এই প্রলোভন তুচ্ছ মনে করি। গাড়ীতে ষ্টার্ট দাও হে!

* *

*

জেলের মধ্যে স্পেশ্যাল বেঞ্চ বসিয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপারটি সম্পর্কে গঠিত মামলার শুনানী চলেছে। আসামীর কাঠগড়ায় যুগল মোক্তার ও গোবর্দ্ধনকে দেখা যাচ্ছে। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে বহু ব্যক্তি বিচারকক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টারগণও কৌতূহল সহকারে এই অভিনব অপরাধের বিচার দেখতে উপস্থিত। বিচারাসনে তিনজন বিচারপতি সমাসীন। সরকার পক্ষ থেকে ইনসপেক্টর ঘোষাল যে দীর্ঘ জবানবন্দী দেন এবং তারই উপর নির্ভর করে শিশু সাক্ষী সত্যনাথকে বিচারালয়ে এনে সরকারী ব্যারিষ্টার—সিদ্ধিনাথের অপমৃত্যু ও ভাস্কর গাঙ্গুলীকে সে সম্পর্কে জড়িত করবার জন্য চক্রান্ত এবং জাতিস্মর শিশু সত্যনাথকে হত্যা করবার প্রচেষ্টার ব্যাপারে আদালতকে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে—চার্জ গঠনে বাধ্য করেছেন। সেগুলি এতই যুক্তিসহ ও অকাট্য যে, আদালত তাদের জামীন পর্য্যন্ত মঞ্জুর করেননি। এদিন মামলার শুনানী আরম্ভ হতেই আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার বললেন :

আসামীর ব্যারিষ্টার : অত্যন্ত বিস্ময় ও রহস্যের কথা এই যে, আমরা দেখছি—বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে—৫।৬ বছর বয়সের এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর কণ্ঠস্থ করা গুটি কয়েক কথার উপর নির্ভর করে—প্রায় ছ' বছর আগে নিষ্পত্তি করা একটা মামলার পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এই সূত্রে—যাঁকে এখন প্রধান অপরাধীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত করা

হয়েছে—তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং আইনজ্ঞরূপেও তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক এই সম্ভ্রান্ত সদাশয় ব্যক্তিই নাকি স্বার্থের খাতিরে চক্রান্ত করে গত মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ভাস্কর গাঙ্গুলীকে অনর্থক অপরাধী সাজিয়েছিলেন; পরে প্রকাশ্যে তাঁরই পক্ষ সমর্থন করে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক তলে তলে নিজের সেই মক্কেলকেই অপরাধী সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং বর্তমানে এই শিশু সত্যনাথের মুখে সেই গুপ্তকথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে তাকে জাতিস্মর জেনে তার হত্যা সাধনে পুনরায় সচেষ্ট হন!—উভয় অভিযোগের মূলেই রয়েছে—এই রহস্যময় শিশুকে শেখানো ও কণ্ঠস্থ করানো কতিপয় প্রাসঙ্গিক কথামাত্র, যেগুলি বিশেষ চেষ্টার দ্বারায় কোন পাখীর মুখ দিয়েও আবৃত্তি করানো কঠিন নয়। আমার উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞ বন্ধু—মহোৎসাহে যিনি রূপকথা শ্রেণীর এই অবিশ্বাস্য অভিযোগমূলক মামলা সরকারপক্ষ থেকে পরিচালনা করছেন, আমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করছি, তিনিই বলুন—এই রূপকথা কি সত্যই তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে? তিনি কি এই অভিযোগকে সম্ভব ও বাস্তব বলে স্বীকার করেন?

* *

*

সরকারী ব্যারিষ্টার: আদালতের অনুমতি নিয়ে আমার বিজ্ঞানবিদ্ বিজ্ঞ বন্ধুকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আলোচ্য এই অভূত-পূর্ব বিস্ময়কর মামলাটির যে অভিযোগকে তিনি অবিশ্বাস্য,

বাবুকে। হামি লোক মদত দিলে কারবার জরুর খাড়া হোবে বাবুজী! হামিলোকভি পাওনা তুলিয়ে লিবে বিয়াজ সাথ।

পাকড়াশী: কিন্তু কারবারের এই অবস্থায় কে ভরসা করে মদত দেবে?

শেঠজী: হামি দেবে। আপনে নারাজ হোনে সে, আপনাকার বিশ হাজার টাকার রিস্ক ভি হামি লিতে তৈয়ার আছে। চলিয়ে—সিকিউরিটি দলিল হামি লিখবে—লেকেন দাস ফ্যাক্টরী জিন্দা থাকিবে।

পাকড়াশী: আপনি যখন এতটা ডেসপ্যারেট হয়েছেন শেঠজী, তখন আমরা আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। আর, আমার পাওনা সামান্য, এর জন্যে আপনাকে রিস্ক্ নিতে হবে না।

সারখেল প্রভৃতি: আমাদেরও ঐ কথা শেঠজী!

শেঠজী: রামজীর ইচ্ছা। চলিয়ে বাবুজী!

দরদালান থেকে সকলে ভিতরে এসে বসলেন। তারপর শেঠজীই বললেন:

শেঠজী: আপনে মিনেজারী লিয়ে খুশিসে কারবার চালিয়ে যান ত ভাস্কর বাবুজী! হামিলোক কারবারী আদমি আছে বাবুসাহেব, যেখনই দেখবে আপনকার মিনেজারিসে কারবারকা হালচাল বহুৎ আচ্ছা মালুম হচ্ছে—উসি বখত্ হামি লোক ফিন মদত দিবে।

আর সকলে: জরুর—জরুর—

সিদ্ধিনাথ: দেখুন, আমি এই কারবারের নামেই মালিক রইলাম বটে, কিন্তু এর সর্বময় কর্তা হলেন—আমার পরম বন্ধু এই

অবাস্তব ও হাস্যকর বলে উপেক্ষা করে তার গুরুত্ব লাঘব করতে চাইছেন, তাঁর সেই প্রচেষ্টাই দুর্বল, অসার ও ভিত্তিহীন। এই জাতিস্মর শিশুর উক্তিগুলি নিরর্থক বা তোতা-পাখীর বুলির মত মুখস্থ করা ত নয়ই—বরং এক গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত অপরাধের প্রকাশক। জন্মান্তরবাদ ও জাতিস্মরতত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাক্ষী মিঃ ঘোষাল বহুতথ্য ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে, মানুষের জ্ঞান পূর্বজন্মের স্মৃতির উপর নিহিত ও এই জাতীয় অপরাধ-মূলক ঘটনা সংক্রান্ত সত্যতথ্য প্রকাশের আকর্ষণে সংশ্লিষ্ট আত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং পূর্বজন্মের স্মৃতি জ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। আমার অবিশ্বাসী বিজ্ঞ বন্ধুর ভ্রম দূর করবার জন্য আমি গভীরভাবে অনুরোধ করছি—এই বিশেষ বিচারালয়ে তিনি ঐ দুগ্ধ-পোষ্য শিশুটিকে তাঁর উচ্চশিক্ষালব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি ও স্থির মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজ্ঞানসিদ্ধ যুক্তি-সহকারে জেরা করে প্রতিপন্ন করুন যে, শিশুর উক্তিগুলি বিচার সহ নয়—অলিক, কল্পিত বা কণ্ঠস্থ করা। ঐ শিশুর পক্ষ থেকে আমার বিচক্ষণ বন্ধুকে আমি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ করছি।

আসামীর ব্যারিষ্টার: আমার সুবিজ্ঞ বন্ধুর এই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করবার আগে···আমি মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণের সমক্ষে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, পূর্বতন মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ভাস্কর গাঙ্গুলী যখন এই জেলের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে দণ্ড ভোগ করছে, তখন তাকে এখানে উপস্থিত করবার আগে—জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিলিত

অবস্থায় এজলাসের বাইরে কোন ওয়ার্ডে হাজীর করা
হোক এবং মাননীয় বিচারপতিগণের সমক্ষেই ঐ জাতিস্মর
শিশু সত্যনাথ তাকে সোনাক্ত করুক।

বিচারপতিগণ: ইয়েস্, ইয়েস্—

সরকারী ব্যারিষ্টারকেও এ-অবস্থায় উক্ত প্রস্তাবে সম্মতিদান করতে হলো।

* *

*

জেলখানার মধ্যে একটা লম্বা চওড়া টালির সেড্ বা দালান। তার একপার্শ্বে পাশাপাশি দশ জন কয়েদীকে দাঁড় করানো হয়েছে। সবারই পরণে জেলখানার পোষাক। প্রত্যেকেই নির্বাক অবস্থায় দণ্ডায়মান—কয়েদীদের চোখে মুখে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী ভঙ্গি। আটজন কয়েদীর পর ভাস্করকেও ঐ অবস্থায় দাঁড় করানো হয়েছে। সাধারণ জেলখানায় ভাস্কর আপন মনে বিড় বিড় করে বকেন এবং বিস্ময়াতঙ্কের মুখভঙ্গিও তখন ফুটে উঠে—কিন্তু জেলের মেট তাঁকে বলে দিয়েছে—'কর্তারা কয়েদীদের দেখতে আসছেন—খবরদার! চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, কথা তো বলবেই না—হাত মুখও নাড়বে না।" সুতরাং ভাস্কর যেন জোর করে নিজেকে সামলাতে সচেষ্ট হয়েছেন। ক্রমে খোকা সত্যনাথকে নিয়ে তিনজন স্পেশাল বিচারপতি, উভয়পক্ষের ব্যারিষ্টার এবং কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ এই দালানে এসে অন্য-দিকে একটু তফাতে সাজিয়ে রাখা বেতের চেয়ারে বসলেন। তখনও অপরাহ্ন হয় নাই—সূর্য্যালোকে আকাশ ঝলমল করছে।

এই সময় বিচারপতিগণের নির্দ্দেশে সত্যনাথকে তাঁদের কাছে আনা হলে প্রথম বিচারপতি তাকে বললেন:

১ম বিচারপতি : দেখতো বাবু · ঐ ওদের মধ্যে তোমার সেই (আরো চাপাস্বরে) "ভাস্কর" আছে কিনা ?

ভাস্করের নামেই শিশুর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল—আনন্দ-দীপ্ত চোখে নীরবে বিচারপতির মুখের দিকেই চেয়ে রইল। তখন তিনজন বিচারপতিই বিভিন্ন ভাবে কেউ পীঠে হাত দিয়ে, কেউ কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে, কেউবা কয়েদীদের দিকে ফিরিয়ে তার কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন।

ধীরে ধীরে শিশু সত্যনাথ কয়েদীদের দিকে ফিরে আর একবার বিচারকদের মুখের পানে তাকাল, তাঁরা পূর্ববৎ নির্দেশ দিলেন। খোকা এগিয়ে চলল খুব ধীরে ধীরে ধীরে···

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি খোকার দিকে কয়েদীরাও অবাক হয়ে গেছে—ছোট একটি খোকাকে তাদের দিকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে।···খোকা কয়েদীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল প্রথম কয়েদিকে। লোকটা খুব ঢেঙ্গা। খোকা মুখ তুলে মাথাটা পীঠের দিকে অনেকটা নামিয়ে তার মুখখানা দেখল—সেই সঙ্গে আপনমনে ঘাড় নেড়ে পাশের কয়েদীর পানে তাকাল। তারপর তাকেও ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। এতগুলি লোকের সমন্বয়েও স্থানটি এত নিস্তব্ধ যে বিস্মিত হতে হয়।

এক এক করে সাত জন কয়েদীকে দেখার পর ৮ম কয়েদীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল খোকা। এই কয়েদীর পাশেই ছিলেন ভাস্কর—দু'জনের চেহারায় কিছুটা সাদৃশ্য থাকায় কর্তৃপক্ষ সোনাক্ত ব্যাপারে তার সুযোগ নিয়েছিলেন। যতটা পারা যায়, পাশাপাশি দুই ব্যক্তিকে এমন ভাবে সাজিয়েছিলেন—খুব পরিচিতদের পক্ষেও চিনতে অসুবিধা হয়। ভাস্করের মুখে দাড়ি ছিলনা, এখন দাড়ি হয়েছে—বয়সও আগের তুলনায়

অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু বড় বড় দুটো চোখ ঠিক আছে আগেকার মত—কর্তাদের পক্ষে তো আর চোখ বদলানো সম্ভব হয়নি। খোকা অষ্টম কয়েদীকে একটু বেশীক্ষণ ধরে দেখল—কিন্তু তার চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে তার পাশের কয়েদী—ভাস্করের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিল। তারপর—ঝাঁ করে ভাস্করের ডান হাত খানা নিজের ছোট ছোট হাত দু'খানির মধ্যে ধরে জোরে টানতেই ভাস্কর মুখখানা একটু নীচু করে বিস্ফারিত চোখে খোকার মুখের দিকে চেয়ে রইল। এইভাবে চোখো-চোখী হতেই খোকার বিহ্বলভাব কেটে গেল এবং বিপুল উল্লাসে তার ছোট ছোট দুখানি হাতে দেহের যতটুকু অংশ ধরতে পারা যায়—জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল:

খোকা: ভাস্কর! তুমি ভাস্কর! হ্যাঁ—তুমি···তুমি · ভাস্কর!

ভাস্করও যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন, কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না; খোকার মুখে নিজের নাম এভাবে শুনে এলোমেলো ভাবে বললেন:

ভাস্কর: আমার নাম··য়্যাঁ···আমার নাম····কি করে···য়্যাঁ—
তুমি—তুমি—

অতি আনন্দে খোকার চোখ মুখ এখন ঝলমল করছে। বি[illegible] মত মুখখানা গম্ভীর করে সে বলল:

খোকা: আমি—সিধু। ভাস্কর—আমি সিধু।

ভাস্কর: য়্যাঁ—কি বলছ····তুমি··তুমি····হ্যাঁ···হ্যাঁ...খোকা হলেও
তোমার কথা · তোমার সেই গলা···

খোকা: ভাস্কর···ভাস্কর···

১ম বিচারপতির নির্দ্দেশে এই সময় জেলের মেট খোকাকে ঝাঁ করে কোলে তুলে নিয়ে বলল:

জেলের মেট : সবুর···চলিয়ে বাবু।

* * *

*

পূর্বের এজলাস। পূর্ববৎ সকলেই সমবেত হয়েছেন। বিচারপতিগণ, ব্যারিষ্টারদ্বয়, শ্রোতৃবর্গ। আসামীর কাঠগড়ায় যুগল মোক্তার ও গোবর্দ্ধন। আর এক দিকে ভাস্কর গাঙ্গুলী। দর্শকদের আসনে বহু ব্যক্তির মধ্যে ভূতনাথকে দেখা যাচ্ছে। তারক এখন য়্যাপ্রুভার হয়েছে। দু'জন কনেষ্টবল পরিবেষ্টিত অবস্থায় একদিকে সেও দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে খোকা ব্যারিষ্টারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে; অর্থাৎ তার জবানবন্দী নেওয়া হোচ্ছে।

একখানি দলিল দেখিয়ে সরকারী ব্যারিষ্টার খোকাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

সঃ ব্যারিষ্টার : এই কাগজখানা কি বল তো বাবু?

কাগজখানার দিকে তাকাতেই খোকার চোখ দুটো দীপ্ত ও অত্যন্ত বড় হয়ে উঠল। তার মুখ থেকে কথা নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সেই তারা দুটোর ভিতর দিয়ে সেই রাত্রির পরিচিত দৃশ্যটি বুঝি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতেই ভাবাচ্ছন্নের মত সে বলতে লাগল :

খোকা : ঐ তো আমার সেই দলিল। ভূতোকে দিলুম, বললুম—সহী কর্—সে তখন···

সরকারী ব্যারিষ্টার এই সময় অপর দলিলখানি তুলে ধরলেন খোকার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। খোকার দুই চক্ষু আবার বড় হলো, আবার তেমনি উচ্ছ্বাসের স্বরে বলল :

খোকা : ঐটে আমাকে দিয়ে বলল—সহী কর।

সঃ ব্যারিষ্টার : তার পর কি হলো বাবু?

বিচারপতি : তাহলে ভাস্করবাবু আপনার দাদাকে খুন করেছেন বলে গোবর্দ্ধনবাবু যে সব এজেহার নিয়েছিলেন—মিথ্যা ?

ভূতনাথ : হ্যাঁ হুজুর—হ্যাঁ ধর্মাবতার—মিথ্যা, মিথ্যা, হ্যাঁ—সাজানো। দাদা পড়ে গিয়ে মারা যান। আর, সে ব্যাপারে, শুধু তাই নয়—দাদার মৃত্যুর পর থেকে আমি হুজুর 'জিরো' হয়ে আছি—একটি যন্ত্র ছাড়া আমি কিছু নই—এই জিরোটির আগে পিছনে বসাতে, কিম্বা ইচ্ছা মত চালাতে দাদার চেয়ারে যিনি জেঁকে বসেছিলেন, তিনি ঐ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

ভূতনাথ কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান যুগল মোক্তারকে নির্দেশ করল। যুগল মোক্তারের মুখখানা ভীমরুলের চাকের মত বীভৎস হয়ে উঠল।

সঃ ব্যারিষ্টার : আপনার মামাশ্বশুর—

ভূতনাথ : আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! কিন্তু আসলে উনি মহাভারতের শকুনী মামা—আমি চিনতে পারিনি।

প্রথম বিচারপতি আসামীর ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন :

বিচারপতি : আপনি খোকাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে চা[illegible] মিঃ সান্যাল—জেরা—

আঃ ব্যারিষ্টার : খোকার বাবা আমাদের এবং আদালতের সময় ও শ্রম এখানেই শেষ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায়, আসামীপক্ষ থেকেই আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই মামলার সূত্রধার ইনেসপেক্টর মিষ্টার ঘোষালকে ধন্যবাদ দিচ্ছি!

মিষ্টার ঘোষালের সময়োচিত পরিচর্য্যায় শিশু সত্যনাথ এতক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাকে কোলে করে মিঃ ঘোষাল বললেন : কিন্তু

প্রকৃত ধন্যবাদ পাবার পাত্র এই জাতিস্মর শিশু—ইনিই ভাস্করবাবুর মুক্তিদাতা।

বিচারপতি : ভাস্করবাবু! আপনি এখন আপনার মুক্তিদাতা ঐ বন্ধুটির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারেন—খোকাকে ওঁর কাছে দিন মিঃ ইনেসপেক্টর। হ্যাঁ, আপনাকে এখনই সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হলো। গ্রহবৈগুণ্যে আপনি যে কঠোর দণ্ড ভোগ করেছেন, তার জন্য আমরা সকলেই অনুতপ্ত। অবশ্য, আপনার ক্ষতিপূরণ এবং অপরাধীদের শাস্তি—সে সব যথাসময় সিদ্ধান্ত হবে। আর এই মামলার ব্যাপারে মিঃ ঘোষালকে তদন্তকারী ইনেসপেক্টর রূপে আমরা যেমন সুখ্যাতি ও তাঁর পদোন্নতির সুপারিশ করছি, তেমনি তৎকালীন ইনেসপেক্টরকে জবাবদিহির জন্য রুল জারি করতে বাধ্য হচ্ছি।

খোকা ধীরে ধীরে ভাস্করের কাছে গেল—ভাস্কর তাকে কোলে করে নিলেন। যুগল ও গোবর্দ্ধন ভিন্ন আদালত শুদ্ধ সকলেই—এমন কি, ভূতনাথ পর্য্যন্ত উল্লাসে বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

*

* *

খোকা : ভাস্কর, ভাস্কর, আমার ভাস্কর, আমার ভাস্কর!

খোকা আবেগের সঙ্গে দু'হাতে ভাস্করের কোলে থেকে তাঁর মুখে মাথায় দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল। ভাস্করও আনন্দে বিস্ময়ের ভাবটি কাটিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বরে এতদিন পরে বলে উঠলেন :

ভাস্কর : আমি এখন বুঝতে পারছি, হ্যাঁ এখন স্পষ্ট জানতে পারছি—সত্যের সন্ধান দিতে, সত্য প্রকাশ করতে—আমার সিধু

সত্যনাথ হয়ে এসেছেন—ধর্মাবতারগণ! আমি—খোকার চোখে মুখে দেখছি আমার পরম বন্ধু সিধুর স্পষ্ট ভঙ্গি! ঐ মিষ্টি ডাক শুনে কানে আমার বাজছে—যেন সিধুই ডাকছে! সব ভুল ভেঙ্গে দিয়ে—ভুলের মাশুল দিতে আমার সিধুই এসেছে জন্মান্তরে জাতিস্মর হয়ে।

বলেই ভাস্কর খোকাকে পুনরায় সাদরে জড়িয়ে ধরলেন।

শেষ

ভাস্কর বাবু। উনি ওঁর ইচ্ছামত এই কারবার চালাবেন, দেনা দেবেন, আমাদেরও দেখবেন। আর—আপনাদের সামনেই আমি বলছি—কারবার নির্দায় হয়ে লাভে দাঁড়ালেই—

ভাস্কর : ও কালনেমীর লঙ্কাভাগের কথা এখন থাক সিধু। আমি তোমাকে চিনি হে! চিনি তুমি একলা খাবে না, আর—কাউকে ঠকাবার মতলব তোমার কুষ্টিতেও লেখেনি—তাও জানি—(বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।)

* *

*

দাস-বাড়ীর অন্দরমহল। অচলার ঘর। ঘরের কাজকর্ম করছিলেন অচলা নিবিষ্ট মনে। নূতন রঙিন সুট পরে ঘরে ঢুকল তাঁকে ডাকতে ডাকতে ভূতনাথ।

ভূতনাথ : বৌমা, বৌমা, বৌমা—এই ত্মাখ!

অচলা : অ—মা! তুই? আমি চমকে উঠেছিলুম—কোন্ সাহেব এলো মনে করে!

কাছে এসে ভূতনাথকে দেখতে দেখতে প্রসন্নমুখে বললেন :

অচলা : সত্যি, তোকে ভারি মানিয়েছে ভুতো! হ্যাঁরে, তোর দাদা দেখেছে?

ভূতনাথ : আমি দাদাকে দেখিয়েছি নাকি? তুমি দর্জি ডেকে মাপ দিয়ে সুট তৈরী করতে দিয়েছ শুনে দাদা চটে গিয়েছিল মনে নেই? এখন দেখলে হয়ত বলবে—খুলে ফেল

অচলা : হুঁ—অমনি বললেই হলো। কে তোকে একথা বলেছে শুনি?

ভূতনাথ : তুমিই বলনা বৌমা, দাদা এ রকম সুট কোনদিন পরেছে?

অচলা : তা সত্যি।

ভূতনাথ : পরবেন কোত্থেকে ? আমার মতন ওঁর কি বৌমা আছেন—যে দর্জি ডেকে সুট তৈরী করিয়ে দেবে ?

অচলা : ও ! এই কথা—

ভূতনাথ : তোমার যখন ভালো লেগেছে বৌমা, এখন কিন্তু ভালো মন করে আমার দুটো কথা রাখতে হবে ?

অচলা : অ-মা ! আবার কি কথারে ?

ভূতনাথ : সেই যে—তুমি বলেছিলে পিকনিকের দরুণ বাকী পঁচিশ টাকা আমাকে পরে দেবে—

অচলা : সে ত আমি দেব না বলেছিলুম রে !

ভূতনাথ : বা-রে ! আমি বলেছিলুম না—দিতে হবে ! জানো বৌমা, আমরা পঁচিশ টাকাতেই পিকনিক করে বাকি পঁচিশ টাকায় সদরে গিয়ে সার্কেস দেখে আসব। আর—তুমি বলেছিলে বৌমা, আমাকে একদিন সার্কেস দেখতে পাঠাবে। তবে ?

অচলা : না, তুই দেখছি আমাকে আর এখানে টেঁকতে দিবিনে—ভূতো !

ভূতনাথ : তার চেয়ে বল না কেন, আমিই চলে যাই—যেদিকে দু-চক্ষু যায়—

অচলা : বালাই, বালাই, ষাট ! ওসব অলুক্ষণে কথা বলিস নি ভূতো—

ভূতনাথ : তাহলে আমার কথা রাখো। হ্যাঁ, আরো একটা কথা বৌমা !—আগেই বলেছি—দুটো কথা বলব। শোন—দাদার গাড়ীখানা এক বেলার জন্যে দিতে হবে বৌমা !

অচলা : গাড়ী—

ভূতনাথ : *বা রে! এই স্যুট পরে কি পায়ে হেঁটে সার্কেস দেখতে যাব?* না—গরুর গাড়ীতে চাপব! লক্ষ্মীটি বৌমা—

অচলা : তোর ভাস্করদাকে নিয়ে উনি যে এখন গাড়ীতে ভারী ঘোরাঘুরি করছেন রে—

ভূতনাথ : তাবলে আমি একদিন গাড়ী চড়তে পাব না বৌমা!

অচলা : তা'হলে, এক কাজ কর—তোর ভাস্করদাকে ধর—তাঁকেই বল গাড়ীর কথা।

ভূতনাথ : সে আমি পারব না বলে রাখছি। আমি ভাস্করদা জানিনা, সিধুদা জানিনা, কোনদা'কে জানি না, শুধু জানি তোমাকে বৌমা।

বলেই ভূতনাথ এমন আবদারের ভঙ্গিতে অচলাকে জড়িয়ে ধরল যে অচলা ভাবাত্র নির্বাক দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে রইলেন।

* *
*

দাস ফ্যাক্টরী। পূর্বাহ্ন—১০টা আন্দাজ। ফটকের সম্মুখ এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ—এখন যেন জমজম করছে। সে থমথমে ভাব আর নেই। লোকজন ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। প্রাঙ্গণে সারি সারি মালবাহী লরী দাঁড়িয়ে আছে—মালপত্র আসছে; তৈরী মাল যাচ্ছে। ফটকের সামনেও এই ভাব।—কারখানা থেকে কলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সেই অফিস ঘর। এখানেও কর্ম চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছে। সিদ্ধিনাথ সামনের টেবিলে রাখা কাগজপত্র দেখছেন—তাঁর মুখ আজ উৎফুল্ল। ভাস্কর ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করতেই সিদ্ধিনাথ বললেন :

সিদ্ধিনাথ: এ যে দেখছি মিরাক্যল ব্যাপার হে ভাস্কর! তুমি কি যাদু বিদ্যার জোরে এ কাণ্ড করলে—অ্যাঁ! এক সঙ্গে পাঁচ. পাঁচটা জাঁদরেল ফারম তোমার টেণ্ডার য়্যাকসেপ্ট করেছে!

ভাস্কর: সব কাজেরই একটা আর্ট আছে জেনো। বিদেশী ফারমের কর্মকর্তারা সেটা বোঝে। অথচ, দেখেছ—লো-রেটে আমি কোন টেণ্ডার পাঠাইনি। ঠিক মত সাপ্লাই দিতে পারলে মুনাফাও যথেষ্ট, সেই সঙ্গে ফ্যাক্টরীর সুনামও কম নয়।

ভাস্কর ও সিদ্ধিনাথ আফিস-ঘরে টেণ্ডার নিয়ে আলোচনা করছেন। ওদিকে আফিসের বাহিরে কারখানার ফোরম্যান ও তার সহকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সাব্যস্ত করেছেন যে, এত কাজ এই সময়ের মধ্যে কিছুতেই হতে পারে না। এর পর ফোরম্যান তার প্রথম সহকারীকে নিয়ে অফিস-ঘরে এসে সে কথা জানালেন:

ফোরম্যান: এত কাজ—এই টাইমের মধ্যে—কিছুতেই হবে না স্যার!

সিদ্ধিনাথ: কেন, হবে না শুনি? এই তখন কাজ নেই, কাজ নেই, বলে চীৎকার তুলে কারখানা মাথায় করতে, আর এখন কাজ পেয়েও বলছ—হবে না?

ভাস্কর: ওরা অন্যায় বলেনি সিধু! পেটে যতখানি ধরে, তার বেশী চাপালেই বদহজম হয়—এও তাই। এই সময়ের মধ্যে পাঁচটা টেণ্ডারের মাল তৈরি করবার ক্যাপাসিটি আমাদের ফ্যাকট্রির নেই—বুঝলে?

১ম সহকারী: ঠিক ধরেছেন স্যার! চব্বিশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে ডবল সেটে কাজ চালালেও আমাদের মেশিন থেকে এতকাজ বেরুবে না।

সিদ্ধিনাথ: তাহলে—উপায়? এত টাকার কাজ পেয়েও শেষ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হবে?

ভাস্কর: চেষ্টা করে দেখতে হবে—এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে।

ফোরম্যান: একটা উপায় হতে পারে স্যার—ফোর হুইলের খুব বড় মেসিন যে ফ্যাক্টরীতে আছে, সেখান থেকে কতক কাজ করিয়ে আনলে—

আর সকলে ফোরম্যানের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

সিদ্ধিনাথ: হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক বলেছ। বাবার আমোলেও বেশী কাজ এলে বাইরে থেকে করিয়ে এনে সাপ্লাই দেওয়া হোত।

ভাস্কর: সেইজন্যেই ফ্যাক্টরী ওভাবে ঝুলে পড়েছিল হে!

সিদ্ধিনাথ: এ কথার মানে?

ভাস্কর: মানে হচ্ছে—ঘরের লক্ষ্মীকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া—মুনফার 'লায়ন সেয়ার' তাদের দিয়ে যেটুকু পাবে, তাতে কাদা ঘাঁটাই সার হবে।

সিদ্ধিনাথ: তাহলে কি করবে বল?

ভাস্কর: সেই মেসিন আনিয়ে আমাদের ফ্যাক্টরী থেকেই সমস্ত কাজ তৈরী করাতে হবে।

ভাস্কর সিদ্ধনাথের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তারপর—একই ভাবের চেয়ার টেবিল্ দেওয়া—সিদ্ধিনাথের পাশের সিটে বসলেন।

সিদ্ধিনাথ: সে ত বড় সাধারণ কথা নয়—লাখ দু'লাখের ব্যাপার—

ফোরম্যান: তা ছাড়া—বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে আনাতেই দু'মাস কেটে যাবে।

ভাস্কর: বটেই ত! প্রচুর টাকাও চাই, আর সময়ও নেই। তাই,

কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যেতে পারে জেনেই আমি কথাটি বলেছি।

সিদ্ধনাথ : সে কি হে! তুমি কি তাহলে—

ভাস্কর : দেখ, আমার গুরু বলতেন—কোন কাজে নামবার আগেই ধ্যানদৃষ্টিতে ভবিষ্যতটি দেখে নিলে পরে কাজে নেমে আর পস্তাতে হয় না। এই টেণ্ডারগুলো পাঠাবার সময় আমাকেও তাই ভাবতেও হয়েছিল—মঞ্জুর হোলেই ঠিক সময়ে সাপ্লাই দেবার জন্যে একস্ট্রা মেসিন আনাতেই হবে। বাইচান্স—ঠিক সেই সময়েই খবর পাই…ঐ ধরণের একটা বিরাট মেসিন আমাদের সদরেই আছে, আর খুব সুবিধায় পাওয়া যেতে পারে।

ফোরম্যান : আপনি কি আলিপুর ফ্যাক্টরীর কথা বলছেন স্যার?

ভাস্কর : হ্যাঁ। ওখানকারই মেসিন সেটা। কলকাতার সুর কোম্পানী ওখানে ব্রাঞ্চ খুলেই—

ফোরম্যান : জানি স্যার—আমি তখন ওখানে ছিলুম। যুদ্ধের আগেই জার্মাণী থেকে দেড় লাখ টাকা দিয়ে ঐ মেসিন ওঁরা আনিয়েছিলেন। কিন্তু ফিট করেও চালানো যায় নি। সে জায়গায় দোসরা মেসিন বসেছে—আর সেটা খুলে ফেলে গুদমে ভরে রেখেছে। ওর আশা ছেড়ে দিন স্যার, ও মেসিন চলবে না—কেউ চালাতে পারবে না।

ভাস্কর : মেসিন খুলে তারা গুদামে তুলে রাখতে পারে। কিন্তু ঠিক মত ফিট করলে মেসিন চলবেনা—কেউ চালাতে পারবে না, এ কথা বলা চলে না। এখন মেসিনটা দেখাই যাক না—

সিদ্ধিনাথ : বেশ ত—চল একদিন আলিপুরে যাওয়া যাক্—

ভাস্কর : একদিন কেন—আজই ভালো।

সিদ্ধিনাথ : বেশ, তাহলে খাওয়া দাওয়ার পরই ১২টা আন্দাজ বেরোনো যাবে। আজ সকালে গাড়ী বার করা হয় নি—ভালোই হয়েছে। লম্বা পাড়ি তো—(ফোরম্যানকে লক্ষ্য করে) একেও তাহলে সঙ্গে করে—

ভাস্কর : নিশ্চয়ই—যখন ওখানকার পুরানো পাপী !

বলেই ভাস্কর জোরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

* *
*

দাস-বাড়ীর অন্দর মহল। ঘড়িতে বারোটা বাজছে। আহারান্তে সিদ্ধিনাথ তাঁর ঘরে এসে অন্যান্য দিনের মত ঘণ্টা খানেক বিশ্রামের জন্য শয্যাগ্রহণ না করে বাহিরে যাবার জন্য জামা গায়ে দিচ্ছেন। পানের ডিপা হাতে করে ঘরে ঢুকেই অচলা সেটা লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন :

অচলা : এখন জামা পরছ যে - বেরুবে নাকি ?

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ - একটু কাজে সদরে যাব।

অচলা : আলিপুরে ? ···চমকিতভাবেই কথাটা বললেন অচলা।

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ—কিন্তু চমকে উঠলে যে ?

অচলা : গাড়ীতে যাবে ?

সিদ্ধিনাথ : পাঁচ ক্রোশ পথ গাড়ী ছাড়া ত আর হেঁটে যেতে পারি না ? কিন্তু তুমি আনচান করছ কেন বলত ?

অচলা : আমি বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

সিদ্ধিনাথ : কি রকম ?

অচলা : ভুতো ক'দিন থেকেই ধরেছিল—ওখানে সার্কেস দেখতে যাবে। আজ শনিবার, দুটোর সময় খেলা বসবে বলে, আর—গাড়ীও বেরোয়নি শুনে,—গাড়ীতেই সে গেছে বাপু! আমিই মহাঙ্গীরকে বলে দিয়েছি।

সিদ্ধিনাথ : বেশ করেছ!···ওদিকে ভাস্কর খেয়ে দেয়ে ফোরম্যানকে নিয়ে কারখানায় বসে আছে আমার অপেক্ষায়; ওখান থেকে তাদের তুলে নেবার কথা। কাজটা পণ্ড হলো। তুমি দেখছি সব রকমেই ছোঁড়াটার মাথা এমনি করেই খাবে! গাড়ী পর্য্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এরপর—

এই সময় কৈলাস এসে বলল :

কৈলাস : গাড়ী ত আস্তাবলে নেই বাবু! শুনমু—ছোট্‌দাদাবাবু গাড়ী করে তেনার ইয়ার বক্সিদের নিয়ে সদরে সার্কাস দেখতে গেছেন—ফিরতি রাত হবে।

সিদ্ধিনাথ : হুঁ—যাও, এখন কারখানায় গিয়ে ভাস্কর বাবুকে বলো—আজ আর যাওয়া হোল না।···বরাত, বরাত, কোন দিকেই আমার সুরাহা নেই—হুঁ!

* *
*

এই সময় রাজপথ কাঁপিয়ে গাড়ী চলেছে। গাড়ীর মধ্যে ভূতনাথ, তারক ও অন্যান্য বন্ধুরা। একটা গান ধরে হুল্লোড় করতে করতে তারা চলেছে।

তারক : এখন থেকে তোর বৌমার সঙ্গে কথা পাকা করে রাখ ভূতো—ফি শনিবার গাড়ীখানা ছেড়ে দেবে, আর আমরা তোর দৌলতে স্ফূর্তি করে বেড়াব।

ভূতনাথ : হুঁ, তবেই হয়েছে। কি করে যে আজকের জন্যে গাড়ীখানা আদায় করেছি, তা ভগবানই জানেন।

পটল : আরে তাতে কি হয়েছে, শনিবার এলেই এমনি করে আদায় করবি। তুইও ত দাদার ভাইরে!

দুটার আগেই গাড়ী আলিপুর স্কোয়ারে এসে পৌছাল। ভূতনাথের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারক টিকিট কিনতে গেল।

অপরাহ্ন। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠের মধ্যে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। রাস্তায় যান বাহন সব দাঁড়িয়ে আছে—এখন ফেরবার পালা, গাড়ী লোক নিয়ে চলেছে। একটু আগে সার্কাস ভেঙ্গে গেছে। ভূতনাথদের গাড়ী একটু তফাতে একটা গাছের তলায় ছিল। চালক মহাঙ্গীর গাড়ীতে ঘোড়া জুতে তার মুখ থেকে দানার থালি খলিটা খুলে রাখছে।

ওদিকে ভূতনাথ—তারক, অটল প্রভৃতি সহযাত্রী পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে আসছিল। সেইসময় আরও চার পাঁচজন সহপাঠী এসে তাদের ঘিরে ফেলে বললো :

১ম : আরে প্রেসিডেন্ট যে! গ্যালারী থেকে দেখিছি হে—হায়ার সীটে বুজম্ ফ্রেণ্ডস্‌দের নিয়ে বসেছ।

২য় : খেলা ভাঙতেই তোমাকে গরু খোঁজা করছি হে! আমাদের নিয়ে যেতে হবে দাদা তোমার গাড়ীতে!

ভূতনাথ : নিতে ত আপত্তি নেই—ধরবে কি?

তারক : আমরাই ছ'য়জনে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে এসেছি।

৩য় : আরে ভেতরে না ধরুক - ছাত ত আছে · খুব ধরবে—

মহাঙ্গীর গাড়ীর কোচবাক্সে উঠতে যাবে—এমন সময় পরবর্ত্তী ছেলের

দল হুড়মুড় করে ছুটে এসে গাড়ীর ছাদে উঠতে গেল। মহাঙ্গীর বাধা দিয়ে বলল :

মহাঙ্গীর : হাঁ হাঁ—কি হোচ্ছে ?

১ম : দেখছিস্ না—গাড়ীর ছাতে উঠছি।

২য় : তোর বাবু নীচে বসে যাবে, আমরা বসব মাথায়—বুঝলি ?

মহাঙ্গীর : সে হেবো না—উতারো—আবি উতারো—

ব্যাপার দেখে ভূতনাথ কাছে এসে বলল :

ভূতনাথ : ওরা যাবে মহাঙ্গীর—আমি বলিছি যেতে।

মহাঙ্গীর : সে হোবে না ভুতুবাবু, বেআইনি কাম আমি করবে না—ঘোড়া ভি জখম হবে।

তারক : তাহলে তোকেও ঘোড়ার সঙ্গে জুতে চালাবো। বেটার কথা শোনো—

মহাঙ্গীর : য়্যায়সা বাত মত বল্না বাবু—ভালো হোবে না।

তারক : কি করবি রে উল্লু ? গাড়োয়ান—গাড়োয়ানের মত থাকবি—

মহাঙ্গীর : শুনিয়ে ভুতু বাবু—য়্যয়সা বাত বড়াবাবু কভি না বলল—

তারক : কিরে ভুতো—এ বেটা গাড়োয়ান তোর নাম ধরে ডাকে, আর তুই কিনা—

মহাঙ্গীর : হাঁ হাঁ—ডাকে তো। ভুতুবাবুরে আমি পয়দা হোতে দেখল—

ভূতনাথ : এই মহাঙ্গীর—চুপ কর্। বাবুদের সঙ্গে তকরার করবি না—এরা আমার সঙ্গে যাবেই।

মহাঙ্গীর : তাজ্জব কি বাত ! দশ বারো আদমী ক্যায়সে যায়েঙ্গে ?

তারক তড়াক করে গাড়ীর ছাদে উঠল ও অন্যান্য ছেলেদের ওঠবার ইঙ্গিত করল—

তারক : দ্যাখ্ ব্যাটা, চোখ দুটো চড়কগাছে তুলে—ক্যায়সে যায়েঙ্গে !—(ছাতে বসে দেহের গোটা দুই দমক দিল)।

দ্যাখ্—য়্যায়সে যায়েঙ্গে—

আরও চার পাঁচটি ছেলেও ততক্ষণে উঠে পড়েছে এবং তারাও দমক দিয়ে বলতে থাকে—

ছেলেরা : (সমস্বরে) য়্যায়সে যায়েঙ্গে –

মহাঙ্গীর : ভুতুবাবু, এ লোককে উতরানে বোল ;—গাড়ী আমি না চালাবে ! এই উতারো, আবি উতারো—

তারক : প্রেসিডেণ্ট, তোর কুত্তাকে সামলা।

ভূতনাথ : এই রাস্কেল মহাঙ্গীর—মুখ সামলে—

মহাঙ্গীর : কেয়া –

তারক : বেটা যে চোখ রাঙায় রে—এই নে, ওষুধ দে—ভুতো।

তারক কোচবাক্সের পাশের খোপ থেকে চাবুক তুলে ভূতনাথকে দিল—সেই চাবুক দিয়ে ভূতনাথ সপাসপ করে মহাঙ্গীরকে পিটতে পিটতে বলল—

ভূতনাথ : চালাকি পেয়েছ পাজি—ইতর ! চালাও গাড়ী—ওরা যাবে আলবৎ · আমার হুকুম···· চালাও ···

মহাঙ্গীর : চলিয়ে আমি আর নকরি না করে—তু হামকো আচ্ছিতরহ মালুম কর্ দিয়া...চলিয়ে।

বলতে বলতে মহাঙ্গীর তার স্থানটিতে উঠে বসে ঘোড়ার পীঠে লাগামের ঘা দিল। ভূতনাথও চাবুকটা কোচবাক্সের দিকে নিক্ষেপ করে গাড়ীর ভিতরে বসল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

সন্ধ্যা হয় হয়। জনবিরল দীর্ঘ পথ দিয়ে গাড়ী চলেছে। গাড়ীর ছাদে ছেলেরা, তাদের নিয়ে মাতব্বরী করছে তারক। সার্কাসে শোনা

ক্লাউনদের হাসির গানখানা কাগজে সে টুকে নিয়েছিল। —পড়ে পড়ে সুর করে বলছে, ছেলেরা গাইছে সমস্বরে। ভিতর থেকে ভূতনাথ বাহোবা দিচ্ছে।...পথচারী পাথক ও পশারীরা অবাক হয়ে দেখছে।

*   *

*

পরদিন—সকালে ভাস্কর বৈঠকখানায় বসে কৈলাসের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ভাস্কর : আরে– এতো এক কথায় মিটে যেত—এতো হাঙ্গামার কি দরকার ছিল!

কৈলাস : এখন আপুনি দেখুন দা-ঠাকুর! বড়দাদাবাবু ত সহজে রাগেননি, কিন্তু একবার রাগ হো'লে আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। গাড়ীর ওরে ত নয়, ছোটবাবু মহাঙ্গীরের পীঠে— আপ নি দেখলে শিউরে উঠবে গো দা'ঠাকুর—পীঠময় দাগ পড়ে গেছে।

ভাস্কর : মহাঙ্গীর কোথায়?

কৈলাস : সে তার তল্পী তল্পা বাঁধছে গো! আর নকরী করবে না। বাবুও কোট ধরেছেন– বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাবেন।

ভাস্কর : এক ধার থেকে সবাই দেখছি মাথা গরম করে বসে আছে।

কৈলাস : আপনি একবার ভিতরে চলেন গো দা'ঠাকুর! সেখানেও কুলুক্ষেত্তর বেধেছে।

ভাস্কর : তার আগে মহাঙ্গীরকে ডেকে আন দেখি আমার নাম করে।

অন্দরমহল। সিদ্ধিনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভূতনাথ। সিদ্ধিনাথ

তিরস্কার করছেন ভুতকে। সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের ঘরে অচলা ছটফট করে পায়চারী করছেন।

সিদ্ধিনাথ: অনেক অত্যাচার আমি তোমার সহ্য করেছি মুখ বুজিয়ে, শুধু তোমার ঐ বৌমার জন্যে—যিনি সব সময় ডানা দিয়ে তোমার দোষগুলো সব আগলে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই আমার কাণে এসে পৌছায়। আদর দিয়ে দিয়ে তিনি তোমাকে মাথায় বসিয়ে এখন গেছো বাঁদর করে তুলেছেন। তাই এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেছ। যত সব বকা ছেলের সঙ্গে মিশে বংশের নাম ডোবাতে বসেছ—এর পর কোন্ দিন—

পাশের ঘরে অচলা এতক্ষণ সিদ্ধিনাথের তিরস্কার শুনতে শুনতে অস্থিরভাবে পদচারণা করছিলেন, শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে সিদ্ধিনাথের ঘরে সেঁধিয়ে বলতে লাগলেন:

অচলা: আরো কি বলতে বাকি আছে—বল, বল, বল। শুনতে শুনতে আমার সর্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠেছে—তাই সইতে না পেরে ছুটে এসেছি, এরপর যা করবার হয় কর—মারতে হয় মার, খুন কর, না হয় বল—আমি ভুতকে নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই।

সিদ্ধিনাথ: না—তোমাদের যাবার কথা ত হয়নি, বলিওনি। আমিই বরং সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে চেয়েছি। এখন তুমি ভুতোর হয়ে ছুটে এসে আমাকেই মুখনাড়া দিচ্ছ—আমারই দোষ দেখছো! লজ্জা করছে না—ওর হয়ে কথা বলতে? একবার আস্তাবলে গিয়ে দেখে এসনা ওর কীর্ত্তি! বাবার

আমলের লোক—যে ওকে কোলে পীঠে তুলে মানুষ করেছে, ইয়ারদের মন রাখতে তার পীঠে কিনা চাবুক হাঁকরেছে। আমার ইচ্ছে করছে সেই চাবুক এনে—

অচলা : সে ইচ্ছেই বা বাকি থাকে কেন? বলনা কৈলেসকে চাবুক খানা এনে দিক, না হয় বল—আমি একখানা কাটারি এনে দিচ্ছি—তোমার যা মন চায় সাধ মিটিয়ে কর—তারপর সেই কাটারি আমার গলায় বসিয়ে—

সিদ্ধিনাথ : থামো বলছি—

এমন সময় ভাস্কর ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে গম্ভীর মুখে বললেন :

ভাস্কর : কি হোচ্ছে সিধু! তোমাকে তো এর আগে কোন দিন এমন চড়া গলায়—

অচলা মাথায় ক্ষিপ্রভাবে ঘোমটা টেনে বললেন :

অচলা : দেবতা আপনি এসেছেন—আমি ভাবছিলুম ভুতোকে নিয়ে আপনার আস্তানায় গিয়ে উঠবো—

ভাস্কর : ছি বৌমা—আপনি হচ্ছেন বাড়ীর লক্ষ্মী! কারখানার ব্যাপারে সিধু কর্তা হলেও, সংসারের কর্ত্রী হচ্ছেন আপনি। এখানে সিধুও ····

অচলা : থাক্ দেবতা—আর বলবেন না। সংসারে আমার যা মান, তা জানতে কারুর বাকি নেই। আর, এই ছেলেটা হয়েছে আমার শনি—

ভাস্কর : আর কথা নয় বৌমা! আমি জোড়হাত করে বলছি—দু'জনকেই মুখবন্ধ করে আমার কথা শুনতে হবে। আমি বলছি, সংসারে থাকতে হোলেই ঠোকাঠুকি হয়; কিন্তু তা

বলে—তাই নিয়ে প্রলয় কাণ্ড করতে বসলে সংসারে ত থাকা চলে না, মা!

বলতে বলতে এগিয়ে এসে ভূতনাথের হাতখানা খপ করে ধরে বলতে লাগলেন :

ভাস্কর : তুমি ত এখনো কচি খোকা নও ভাই—বোঝবার বয়স হয়েছে তোমার। গাড়ী নিয়ে সার্কাসে যাবার কথা আমি ধরি না—তাতে আমাদের কাজের এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি, কাল যেতাম—না হয় আজ যাবো·· কিন্তু সেখানে কি কাণ্ড তুমি করেছ বলত ভাই! তোমার দাদা যাকে কোন দিন তুমি ছাড়া তুই বলেননি, তুমি কি না তাকে—

ভাস্কর : আমি খুব অন্যায় করেছি ভাস্করদা! এজন্যে কাল সারা রাত আমি—

অচলা : ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শিউরে উঠেছে.. কি কান্না ছেলের!

সিদ্ধিনাথ : বাবার আমলের পুরোনো বিশ্বাসী লোক··· আজ সে চাকরী ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে!

ভাস্কর : তুমি থাম সিধু। ভুতো যখন অনুতপ্ত হয়েছে, আর সেখানে কথা নেই। আর মহাঙ্গীরকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে এসেছি। এর পর ভূতো গিয়ে তার হাত ধরে বলবে—

ভূতনাথ : আমি তার কাছে মাপ চাইব ভাস্করদা!

ভাস্কর : বা! বা!...এই ত সব চুকে বুকে গেল। বৌমা শুনুন—দশটার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে আমরা সদরে যাব মেসিন দেখতে ; ভুতোকেও নিয়ে যাব সঙ্গে করে।

ভূতনাথ : আমি যাবো— ?

ভাস্কর : হ্যাঁ হে! আমরা মেসিন দেখবো—তুমিও শিখবে কি করে

দেখতে হয়। এর পর—পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পাস করে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হ'তে হবে মনে রেখ। সাধ করে কি আর বৌমা তোমাকে কোটপ্যাণ্ট কিনে দিয়েছেন? ওর মান রাখা চাই—বুঝলে? বৌমা আপনি ওকে নিয়ে যান।

অচলা: খাবি চল্। সকাল থেকে এখনো কিছু দাঁতে কাটেনি ছেলে।

ভুতনাথকে সঙ্গে করে অচলা চলে গেলেন।

ভাস্কর: একটা কথা বলি সিধু—সাংসারিক ব্যাপারে রাগ হলে, সেটাকে গলার নীচে আর নামতে দেবে না হে! (বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এইখানে ওটা এলেই মনটাও খারাপ হবে। হ্যাঁ, তুমিও সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নাও—ঠিক দশটায় আমরা বেরুব।

সিদ্ধিনাথ: কিন্তু আজ যে রবিবার হে?

ভাস্কর; সে হুঁস আমার আছে। তবে তাদের কারখানা ছুটো পর্য্যন্ত খোলা থ'কে।

* *
*

আলিপুর ফ্যাক্টরীর মধ্যে একটা ঘরে মেশিনের বিভিন্ন অংশ সব খোলা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ভাস্কর একটা লম্বা ফর্দের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে নিচ্ছেন। সিদ্ধিনাথ, আলিপুর ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর, ফোরম্যান ও ভূতনাথ দাঁড়িয়ে দেখছেন। ফোরম্যান ও ভুতনাথের সাহেবী পোষাক।

ভাস্কর: ওদিকে একটা মেশিন ফিটকরা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ ভুতনাথ—

ভূতনাথ : হঁ্যা—ঐ ত।

ভাস্কর : আর এখানে যা দেখছ—ঐ রকম একটা মেসিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ বিভিন্ন পার্টস।

ভূতনাথ : আমরা ত মেসিন দেখতে এসেছি—এগুলো দেখে কি হবে?

ভাস্কর : (হো হো করে হেসে) এগুলোই আমরা তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের কারখানায় ফিট করব, তাহলেই ঐ রকম একটা আস্ত মেসিন হবে। তাইত নম্বর দেখে পার্টসগুলো মিলিয়ে নিলুম হে!

ডিরেক্টর : লিষ্ট মত সব মিলেছে ভাস্কর বাবু?

ভাস্কর : আজ্ঞে হঁ্যা। লিষ্টে যা যা লেখা আছে—সবই পাচ্ছি, তবে কোন্ পার্টটার অভাবে মেসিন চলেনি, ফিট না করলে ত বোঝা যাবে না, স্যার!

ডিরেক্টর : দেখুন—কলকাতার বড় বড় এক্সপার্টস্ এ মেসিনের খুঁতটা যে কোনখানে, সেটা ধরতেই পারেন নি; বাইরে থেকে এক্সপার্ট আনা হবে কথা ছিল—কিন্তু তারপর লড়াই বাধল, আর এখান থেকেই একটা চালু মেসিন পাওয়া গেল বলে, এটা খুলে রাখা হয়।

সিদ্ধিনাথ : এখন কিন্তু এ অবস্থায় একে নিয়ে যাওয়া একটা খুব রিস্কএর ব্যাপার।

ডিরেক্টর : তেমনি ভাববেন, কি দরে পাচ্ছেন!

ফোরম্যান : কিন্তু স্যার—না চললে লোহা-লক্কড়ের সামিল হয়েই পড়ে থাকবে।

ভাস্কর : দেখুন ডিরেক্টর বাবু, বরাত ঠুকেই আমরা এ রিস্কের মধ্যে

যাচ্ছি। এখনি পেমেণ্ট করে মেসিন ডেলিভারী আমরা নেব—তবে কিছু বিবেচনা আপনাকে করতে হবে; অন্তত, সিধুবাবুর ভাই এই খোকাবাবুটির মুখ চেয়ে। জানেন, একে আমি ইঞ্জিনিয়ার করব ভেবেছি, সেই জন্মই ত সব বোঝাচ্ছিলাম—(বলেই হেসে উঠলেন)

ডিরেক্টর: all right, খোকাবাবুর অনারের জন্যে তাহলে হাজার টাকা লেস্ করা গেল, আপনারা উনিশ হাজারই দেবেন।

সিদ্ধিনাথ: ধন্যবাদ—

ভাস্কর: আর আমি- আপনাকে আশীর্বাদ করছি; যেহেতু, আমি ব্রাহ্মণ। সিধু চেক লেখ।

* *
*

দাস ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তর। মেসিন ফিট করা হয়েছে। ভাস্কর, ফোরম্যান, অধর নামে একজন কারিকর ও অন্যান্য কর্মীরা কর্মব্যস্ত। সিদ্ধিনাথ, ভুতনাথ ও আফিসের লোকজন দেখছেন।

ভাস্কর: ভুতো—এই ভ্যাখ, সেদিন যা বলেছিলাম—কেমন মিলে গেল। সেই খোলা পার্টসগুলো ফিট করতেই কত বড় একটা মেসিন হয়ে দাঁড়াল। এটা দেখবে বলেই ত তোমাকে ক্লাব থেকে ডেকে আনা হয়েছে, তোমারও কৌতূহল হওয়া উচিত।

সিদ্ধিনাথ। এ-সব দেখাশোনার চেয়ে ক্লাবে ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দেবার দিকেই ওর কৌতুহল বেশী।

ভাস্কর। না, না, ও সব ঝোঁক আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলতে হবে

তোমাকে ভুতো। আমি ত বলেছি—তোমাকে লেখা পড়া শিখে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে।

ভুতনাথের ক্লাব। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এই সময় ভুতনাথ, তারক, মধু প্রভৃতি জটলা করছে।

তারক : তুই নাকি ইঞ্জিনিয়ার হবিরে ভুতো ?

ভুতনাথ : ঐ ভাস্করদা ত খালি খালি ঐ কথা বলে—

তারক : তার মানে, তোকে ক্লাব ছাড়াতে চায়। সাধে কি আমি ওর নাম রেখেছি ভাস্বরক সিংহ। কিন্তু আমরা ক্ষুদে শশক হলেও, ওকে মাত করে ছাড়ব। এর পর কারখানার সঙ্গে তোর সম্পর্ক হবে—ভাসুর ভাদ্দরবউ।

মধু : তারক বেশ কথা বলে—

ভুতনাথ : কিন্তু দাদা যদি শোনে—

তারক : মাইরি আর কি ?—কি করে শুনবে ? এখন আমিই একটা নতুন কথা বলি শোন ! এগিয়ে আয়—কানে কানে বলি—

ভুতনাথ অভিভূতের মত তারক ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল। সে ভুতোর কানে কানে পরামর্শ দিতে লাগিল।

ওদিকে কারখানার আফিসে এই সময় সিদ্ধিনাথ বিমর্ষভাবে গালে হাত দিয়ে বসে ফোরম্যানের কথা শুনছিলেন :

ফোরম্যান : আমি ত গোড়া থেকেই পই পই করে বলেছিলুম স্যার—ও মেসিন অচল, কেউ চালাতে পারেনি।

সিদ্ধিনাথ : ব্যাপার দেখে আমি ত বসে পড়েছি। ভাস্করের ওপর খুবই ভরসা—

ফোরম্যান: উনি ত চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু মেসিনে দোষ থাকলে উনি কি করবেন বলুন? টাকা গুলোই জলে গেল—

ফোরম্যান চলে গেল। অন্য দিক দিয়ে ভাস্কর রুমালে মুখ মুছতে মুছতে তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। খুব ক্লান্ত তাঁকে দেখাচ্ছে। সিদ্ধিনাথ তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন:

সিদ্ধিনাথ: তাহলে হোপলেস্ বল?

ভাস্কর: কি করে বলি—হাল যখন ছাড়তে পারি নি?

সিদ্ধিনাথ: যে ভাবে চটপট মেসিনটা ফিট করলে—চলবার হলে প্রথমদিনেই চলত—পর পর ৪ দিন ধরে হিম্ সিম্ খেতে হোত না।

ভাস্কর: রিস্ক নিয়েই যখন কাজে নামা গেছে, আফশোস করে কোন লাভ নেই। এখন ভাবতে হবে—সাড়ে পাঁচ লাখের ওপর না হয় আরো বিশ হাজার ঘাড়ে চাপল।

সিদ্ধিনাথ: এখন ত বাড়ী চল। সেই সকাল আটটা থেকে এক নাগাড়ে খাটছ—

ভাস্কর: তুমি যাও ভাই। আমি আরও দু একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে—যদি কিছু একটা হেস্তা নেস্তা করতে পারি—দেখে, তবে যাব—

ফোরম্যান এসে বলল:

ফোরম্যান: আমাদের কি থাকতে হবে স্যার?

ভাস্কর: না, না, আপনাদের আর আটকে রাখব না। আমার সামান্য কিছু কাজ আছে—ঐ অধর ছেলেটি থাকলেই হবে।

ফ্যাক্টরীর আর সকলেই চলে গেছেন—শুধু দুটি প্রাণী মন্ত্র-সাধকের

মত তন্ময় হয়ে কর্মরত। ফিটকরা মেসিনটাকে নানাভাবে হ্যাণ্ডেল করছেন ভাস্কর এবং তাঁকে সাহায্য করছে অধর নামে ২৭।২৮ বছরের এক তরুণ কর্মী। তখন অনেকটা রাত হয়েছে।

ভাস্কর: আমার মত তুমিও নাছোড়বান্দা বলেই আমি তোমাকে ধরে রেখেছি অধর।

অধর: আমার খুব আনন্দ হচ্ছে স্যার, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে এ-ভাবে কাজ করে।

ভাস্কর: তোমার কি মনে হচ্ছে বলত?

অধর: আপান যে ভাবে মেসিন ফিট করেছেন স্যার, তারপর চার দিন ধরে চালাবার যে সব চেষ্টা করলেন, আমি সব দেখিছি। আমার মনে হচ্ছে—লিষ্টে ওঠেনি এমন একটা কিছু পার্টের অভাব আছে।

ভাস্কর: তুমি বাহাদুর ছেলে—ফোরম্যানের চেয়েও তোমার মাথা আছে। যাই হোক, সারা রাত জেগে আমি আজ শেষ চেষ্টা করতে চাই।

অধর: আমিও আপনার সঙ্গে থাকব স্যার!

ভাস্কর: বেশ!

মেসিনটার অংশগুলো সব ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন—অধরকে ও দু একটা নির্দেশ দিলেন।

ভাস্কর: দেখ, ১৮ ইঞ্চি সাইজের ষ্টীল রড যেন সে দিন এখানে দেখেছিলাম না?

অধর: আছে স্যার, ইউল কোম্পানীর মিলের অর্ডার ছিল; ফিনিস হতে বাকী আছে।

ভাস্কর: আছে তাহলে! চলত দেখি ……

কারখানার একটা নিভৃত অংশে কতকগুলি লোহার রড স্তূপীকৃত ভাবে পড়ে আছে পালিশের প্রতীক্ষায়। অধরকে নিয়ে ভাস্কর সেগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

গভীর রাত্রি। ঘড়িতে ১২টা বাজছে। কারখানা ঘরে ফোরম্যানের সিটে বসে ভাস্কর মেসিনের নক্সা দেখছেন। সামনের ডিসে পাঁউরুটি, মাখন, চা—বহুক্ষণ ধরে পড়ে আছে অভুক্ত অবস্থায়, ভাস্করের হুঁস নেই।

একটু তফাতে একটা পার্টিসনের আড়ালে অধর যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি রড্ পালিশ করছে এবং চা ও পাঁউরুটি খাচ্ছে।

ঘড়িতে রাত্রি ৪টা বেজে গেল। কিন্তু তার আওয়াজ ভাস্করের কানে বাজলো না; তিনি সেইভাবে বসে একটা নূতন করে নক্সা আঁকছেন। সামনে চা রুটি তেমনি অভুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

অধর তার কাজ শেষ করে ভাস্করের কাছে এসেই চমকে উঠে বলল :

অধর : এ কি! আপনি কিছুই খাননি স্যার! চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

ভাস্কর ও! ভুলে গেছি! দেখ, মেসিনের ব্যাপার ঠিক অঙ্কের মতন—মিললেই ব্যস্ আমি একটু হদিশ পেয়েছি, হয়ত মিললেও—

অধর : চা টা আমি গরম করে আনি স্যার, তারপর শুনচি।

অধর চায়ের পিয়ালা নিয়ে চলে গেল। ভাস্কর প্রফুল্ল মুখে নক্সার উপরে পেন্সিলের আঘাত করতে লাগলেন।

•

ভোর হয়ে এসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজছে। ভাস্কর ও অধর অত্যন্ত ব্যস্ত ও ব্যগ্রভাবে মেসিনটার উপর নিশ্চিত এক্সপেরিমেণ্ট

করছেন। অধর—সেই আঠার ইঞ্চি রড্‌গুলো ভাস্করকে দিচ্ছে—ভাস্কর যথাস্থানে ফিট করছেন। হঠাৎ ভাস্কর মেসিন থেকে সরে এসে দৃঢ় স্বরে বললেন :

ভাস্কর : মেসিনের সুইচটা খোল ত—

অধর এক রকম ছুটে গিয়ে সুইচ খুলে দিতেই গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ হলো—সেই সঙ্গে মেসিন সচল হয়ে উঠল। ভাস্করের মুখে সাফল্যের দীপ্তি। উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অধর বলল :

অধর : শাঁখটা বাজিয়ে দিই স্যার! সবাই জানুক—আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন।

অধর সশব্দে শাঁখ বাজতে লাগল—চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের শিহরণ উঠল।

* * *

আফিস ঘর। বেলা হয়েছে। মেসিন চালু হয়েছে শুনে সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই সমবেত হয়েছেন। সিদ্ধিনাথের কাছে খবর গেছে। ভাস্করকে লক্ষ্য করে সকলেই প্রশংসা করেছেন। ভিতর থেকে মেঘ গর্জনের মত মেসিন চলার শব্দ হচ্ছে

ফোরম্যান : সত্যই আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন স্যার! এ মেসিন চলবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঐ সহকারী : সত্যই অদ্ভুত স্যার —

ভাস্কর : আমরা কর্মী—বিশ্বকর্মার জাত ; অন্যের পক্ষে যা স্বপ্ন বা অসাধ্য, তাই সিদ্ধ করা আমাদের ধর্ম।

ভাস্কর কথার সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন। সিদ্ধিনাথ এই সময় হন্তদন্ত হয়ে আফিস ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন :

সিদ্ধিনাথ: কি ব্যাপার হে ভাস্কর—সারা রাত জেগে সাধনা করে মরা গাঙে সত্যিই যে বান ডাকালে হে! বেকাম মেসিনের আওয়াজে গ্রামশুদ্ধ গম গম করছে।…(ফোরম্যানদের উদ্দেশ্যে) কি হে! তোমরাই না বলেছিলে—এ মেসিন চলবে না; বিশ বিশ হাজার টাকা জলে গেছে!

ভাস্কর: ওহে—ঐ কটা কথাই তোমার পক্ষে সাপে বর হয়েছে, বুঝলে! অনেক আগে থেকেই মেসিনটার বদনাম রটেছিল বলেই তুমি এত সস্তায় কিস্তিমাত করতে পেরেছ। এর পর সবাই বলবে—জলের দরে স্বর কোম্পানীর মেসিনটা কিনে দাস কোম্পানী লাল হয়ে উঠেছে। ওদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—এখন জোরসে কাজ চালাও, আর সেই সঙ্গে সবাইকে পেটভরে খাইয়ে দাও হে!

বলেই ভাস্কর আবার হেসে উঠলেন:

ওদিকে অচলা তাঁর ঘরে শ্বশুরের আলেখ্য সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাবাদ্র স্বরে বলছিলেন:

অচলা: বাবা! আপনার পুণ্যেই এ সুরাহা হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন—আপনার সময়ে যা যা ছিল, সব যেন ফিরে আসে।

এই সময় ভুতনাথের কথা কানে প্রবেশ করতেই অচলা সচকিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুতনাথও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ভুতনাথ: বৌমা বৌমা—শুনেচ?

অচলা: কি-রে?

ভুতনাথ: আমাদের সেই মেসিনটা চলেছে। উ! কি শব্দ বৌমা—

অচলা: এই কথা বলতে এসেছিস?

ভূতনাথ ; আর একটা কথা বৌমা—

অচলা : কি ?

ভূতনাথ : এইবার আমার একটা সাইকেল চাই বৌমা —

অচলা : সাইকেল ? পা গাড়ী ? সে যে অনেক টাকার—

ভূতনাথ : কত আর—দেড়শো। বারে! অমন করে চাইছ যে? মেসিন চলবে, আর তোমার ভুতো পা-গাড়ী চালাবে না! তুমিও ত শুনেছ বৌমা, মেসিন কেনবার সময় আমার অন্যায়ের জন্যেই হাজার টাকা—

অচলা : ও! সে কথা ঠিক মনে করে রেখেছিস্—বটে! আচ্ছা, হবে।

ভূতনাথ : বৌমা আমার লক্ষ্মীটি!

অচলাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে ভূতনাথ। অচলাও সহর্ষে তার মাথায় হাত বুলাতে থাকেন।

* *

*

সিদ্ধিনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথ ও অচলা। সন্ধ্যা হয়েছে। সিদ্ধিনাথ গায়ের জামা খুলছেন কারখানা থেকে এসে। ঘরে ধুনা দিতে দিতে অচলা বলছেন :

অচলা : তোমার বন্ধুকে দেবতা বলি কি সাধ করে? ভাগ্যিস উনি এসেছিলেন ; নৈলে ত তুমি আমাদের পথে বসাবার মতসব করেছিলে!

সিদ্ধিনাথ : তা করেছিলাম অচলা। ওপর থেকে পিতৃপুরুষদের অভিশাপ কুড়াতাম। এরপর বড় হয়ে ভূতোও আমার দোষ দিত।

অচলা : ভুতোর কথা তুমি মিছে তুলছ! ও তোমার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। ওর খেয়াল খুসি আবদার যা কিছু আমার কাছে—তোমাদের কোন কথায় ও থাকে না কি?

সিদ্ধিনাথ : আহা—কথার পীঠে না হয় ওর সম্বন্ধে কথা একটা বলেছি, তাতে অমন করে খোঁটা দেবার কি আছে? আর—ওর সম্বন্ধে সব ভার ভাস্কর তোমার ওপর দিয়েই ত নিশ্চিন্ত—এই যে সেদিন তুমি ওকে দেড়শো টাকা দিয়ে একটা সাইকেল কিনে দিলে—আমি কোন কথা বলেছি?

অচলা : আহা! বলবার পথ কি দেবতা রেখেছিলেন নাকি? ওর নাম করে হাজার টাকা মেসিনের দাম থেকে কেটে নিয়ে সে টাকা—

সিদ্ধিনাথ। জানি, সেই টাকা থেকে তুমি এখন তোমার ভুতোর সব আবদার মেটাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা মস্ত ভুল কিন্তু করেছ অচলা—

অচলা : ভুল করিছি?

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ। তোমার সমস্ত স্নেহ শুধু ভুতোকেই উজোড় করে দিয়েছ, কিন্তু সে স্নেহের একটু অংশ কি আর কেউ পেতে পারে না? তুমি জানো, ভাস্করের ছোট একটি ছেলে আছে। আর, তার জন্যেই আমরা যখন—

অচলা : ওগো, সত্যি বলেছ। হ্যাঁ বাপু, আমার দোষ হয়েছে। বেশ—বল, কি করব তার জন্যে—তুমিই বল, লক্ষীটি!

সিদ্ধিনাথ : বেশ—বলছি। তার পর আমরা দুজনেই—

সেদিন অপরাহ্নের দিকে ভাস্কর কারখানায় যাবার জন্য বেশ পরিবর্তন করছেন। তাঁর স্ত্রী আরতি দুই তিন বছরের শিশু দেবকুমার বা দেবুকে নিয়ে আদর করছেন, এমন সময় সিদ্ধিনাথের গলা শোনা গেল :

সিদ্ধিনাথ : ভাস্কর, ভাস্কর, কোথায় হে!

আরতি বারাণ্ডায় গিয়েই ফিরে এসে বললেন :

আরতি : সিধুবাবু গো, সঙ্গে বোধ হয় ওঁর স্ত্রী এসেছেন—

ভাস্কর : তাই নাকি! আরে এসো হে—এস।

অচলাকে নিয়ে সিদ্ধিনাথ উপরে আসতেই ভাস্কর সহর্ষে বললেন :

ভাস্কর : আরে, এ যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! আরতি দেখ, আর কে এসেছেন—আমার বৌমা।

অচলা গড় করেই আরতির কোল থেকে খোকাকে নিজের কোলে নিলেন—এই সময় কৈলাস একখানি দামী পারামবুলেটার গাড়ী এনে বলল :

কৈলাস : এই ছাখ দেবুবাবু—তোমার গাড়ী এসেছে, এসো গাড়ীতে চাপিয়ে টানি—

ভাস্কর : এ তোমার কি কাণ্ড সিধু?

সিদ্ধিনাথ : তোমার বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর। উনি এখন প্রতিপন্ন করতে চান যে, ওঁর স্নেহটা ভূতোই একচেটে দখল করে নেয় নি—দেবুর জন্যেও জমিয়ে রেখেছেন কিছু কিছু।

ওদিকে কৈলাস ততক্ষণ দেবুকে গাড়ীতে চড়িয়ে দালানেই টানতে সুরু করেছে।

আরতি : ওমা—এ যে অনেক দামী গাড়ী—

ভাস্কর : এ তোমার ভারি অন্যায় সিধু—আমার কাছে এ কিন্তু

বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। বেশ ত, আগে দায়মুক্ত হয়ে দাঁড়াও, ব্যাঙ্কে দু চার লাখ জমুক- দেওয়া ত পালাচ্ছে না?

সিদ্ধিনাথ : আমাকে কেন বলছ- বললাম ত, তোমার বৌমার কাণ্ড!

ভাস্কর : *বৌমার মেজাজ জানতে আমার বাকি নেই। একে ত ভূতোকে নিয়েই উনি অস্থির, এর ওপর দেবুও যদি—*

অচলা : ওকথা বলবেন না দেবতা! আপনি এসেই আমাদের মান ইজ্জত—বাবার নাম ডাক সবই রক্ষে করেছেন। আমরা কি করতে পেরেছি? তবে আজ আমি বলছি দেবতা—এখন থেকে আমি ভাববো, যেমন আমার ভূতো, তেমনি আমার দেবু!

ভাস্কর : বৌমার কথা শুনছ গো!

আরতি : যিনি সবার কথা শোনেন- তিনিই শুনছেন।

সিদ্ধিনাথ : তাহলে আমারও একটা কথা শুনে রাখতো আরতি মা! ভাস্কর ত নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলতে রাজী নয়, আমাকেও কিছু বলতে বা কাগজে কলমে করতে দেবে না। তবে বলবার মওকা যখন এসেছে, ছাড়ি কেন—মানুষের জীবনের কথা ত কিছু বলা যায় না!

ভাস্কর : তুমি এখন থাম ত—আগে নিজে দাঁড়াও, তার পর ও কথা—

সিদ্ধিনাথ : বেশ ত, কথাটাই বলিই না হে! যদি দাঁড়াতে পারি—অবিশ্যি দাঁড় করাতে তুমি...আর তার পিছনে ভগবানের ইচ্ছা। সে ইচ্ছা যদি সার্থক হয়, তাহলে জেনো—এই কারবারের মালিক শুধু আমি আর ভূতো নয়—তুমি তার সমান ভাগীদার।

ভাস্কর : আ-সিধু !

অচলা : আপনি ত জানেন দেবতা—ওঁর কথা ফেরে না। যা বলেছেন, তাই করবেন।

বলেই অচলা হেঁট হয়ে ভাস্করকে গড় করলেন।

কৈলাস : এই দেখেন গো, খোকা বাবুর গাড়ী কেমন গড় গড় করে চলেছে।

স্কুলের ময়দানে ঠিক এই সময় ভূতনাথও সাইকেল চালাচ্ছে—স্কুলের ছেলেরা দেখছে। তারক : বাহোবা ভূতো—বড় হয়ে তুই মটর চালাবি।

দ্বিতীয় পর্ব

দিনে দিনে দাস-ফ্যাক্টরীর গতি চলেছে উন্নতির মুখে। চারদিক দিয়েই তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। কারখানার আয়তন বাড়াতে হয়েছে। কর্মীদেরও সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হচ্ছে। বাড়ীর আসবাবপত্রেরও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সব দিক দিয়েই উৎকর্ষ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এইভাবে উন্নতির পথে দীর্ঘ দশটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

কারখানার চাকার তালে তালে সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিনাথ ও ভাস্করের আকৃতিও বার্দ্ধক্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে—বয়স বেড়েছে—ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও এখন সমস্ত দেনাপত্র শোধ করে প্রায় পাঁচ লাখে উঠেছে। সাবেক মহাজনরা এখন যোড় হাত করে খোসামোদ করে—তারা এখন ব্রোকার রূপে কাজ পেলেই বর্তে যায় যেন। কিন্তু সিদ্ধিনাথ ও ভাস্করের চাল সমান আছে—সেই ধরনের গলাবন্ধ কোট বা সাদাসিধে পাঞ্জাবী। ফ্যাক্টরীতে ভাস্করের পরনে কোটপ্যাণ্ট থাকলেও, হয়ত টাই নেই, নয়ত এটিকেট মানেন নি—এই ধরণের স্যুট পরেছেন! তথাপি তাঁকে দেখলে সম্ভ্রম জাগে—সেই প্রাণখোলা হাসি। সেই দশ বছর আগেকার গাড়ী, সেই মহাঙ্গীর কোচম্যান, এখন সেও বুড়ো হয়ে গেছে। আর ভূতনাথ? সেই কথাই এবার বলছি।

শিবনগর—দাস-বাড়ী। এখন বাড়ীর শ্রীছাঁদ ফিরেছে অনেকটা আধুনিক রুচি ও পদ্ধতি অনুসারে। দোতলার সেই দালানে বড় বড় আয়না ও ছবি দেখা যাচ্ছে। অচলার সেই ঘর। আগে সেকেলে একটা

দেরাজ আর বড় বড় তোরঙ্গ ঘরের শোভা বর্দ্ধন করত—এখন মেহগ্নি কাঠের পালিশ করা আলমারি, তার ডালায় মুকুর ফিট করা। টিপয়টির উপর ঝালর দেওয়া ঘেরাটোপ। ঘরে দেবদেবীর বড় বড় ছবি। জানালায় পরদা ঝুলছে।

অচলা ডান হাতে ধুনুচি দুলিয়ে সুর করে লক্ষ্মীর স্তব পড়ছেন, এমন সময় বাহির থেকে বুট জুতা পায়ে দিয়ে আসবার একটা পরিচিত শব্দ শোনা গেল; পরক্ষণে দামী সুট পরে বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিতে গট্‌গট্‌ করে ঘরে ঢুকল ভূতনাথ। দশ বছরে ভুতোর এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে—আগেকার দেহসৌষ্ঠবের পূরন্ত অবস্থা; এখন সে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ যুবা; তার গায়ের স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ যেন আরও গাঢ় ও চিক্কণ হয়েছে; কিন্তু ভাবভঙ্গি আগেকার মতই আছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই সে বলছিল:

ভূতনাথ: বৌমা, বৌমা! টাকা চাই—টাকা -

অচলা: আ-মা, এই সকালেই টাকা?

ভূতনাথ: আজ আর দু পাঁচশো নয় বৌমা—পাঁচটি হাজার⋯ বুঝলে?

অচলা: য়্যা...পাঁচ হাজার! কি করবি অত টাকা নিয়ে?

ভূতনাথ: শুনলে তুমি ভারি খুসি হবে বৌমা! জানো—একখানা নতুন মটরগাড়ী কিনছি।

অচলা: হাওয়া গাড়ী? বলিস কি রে? তা, তোর দাদাকে বলেছিস?

ভূতনাথ: বয়ে গেছে আমার দাদাকে বলতে। বরাবর যাকে বলে আসছি, আর চাইবামাত্র সব পেয়েছি—আমার বলাবলি তারই কাছে।

অচলা : শোন কথা! তা বলে দাদাকে বলবিনে? আর না বললে অত টাকা দেবে কে? আমি ত আর ব্যাঙ্ক নই–

ভূতনাথ : সে আমি জানি না—বলতে হয় তুমি বলগে; আমি তোমাকে বলেই খালাস। তা বলে টাকা এক্ষুণি চাই।

কথাটা বলেই খাটের উপরে বসে ভূতনাথ আপন মনে পা দুটো দোলাতে লাগল নিজস্ব ভঙ্গিতে।

অচলা : হ্যাঁ—আমি যেন সর্বক্ষণ তোর জন্যে লক্ষ্মণের মত ফল ধরে বসে আছি! যত আবদার আমারই কাছে।

ভূতনাথ : নয়ত কি—তোমার ভুতো আর কখনো কারুর কাছে হাত পেতেছে নাকি? যে ও-কথা বলছ?...সত্যি বৌমা, ভারি সখ হয়েছে মটরগাড়ী চড়বার। হ্যাঁ—শোন, গাড়ী কিনে এনেই তোমাকে নিয়ে প্রথমেই খুব একটা লম্বা ট্রিপ দিয়ে আসব বৌমা—

অচলা : হ্যাঁ, আমার ত আর কাজ নেই—তোর সঙ্গে হাওয়া গাড়ী চড়ে হাওয়া খেতে বেরুব! কিন্তু তোর একি সব বিদঘুটে সখ বল ত? কই—উনি, তোর ভাস্করদা, কোন দিন ত এর নামও করেন নি।

ভূতনাথ : ওঁদের কথা ছেড়ে দাও বৌমা—দুজনেই সেকেলে মানুষ। সেই মান্ধাতার আমলের ঝরঝরে গাড়ী, আর ঘীয়ে-ভাজা নড়নড়ে ঘোড়া। এখন আবার যেতে যেতে শুয়ে পড়ে ঘোড়াটা—অথচ হাজার হাজার টাকা রোজ আসছে।—দাও বৌমা লক্ষ্মীটি।

অচলা : তোর দেখছি বয়েস ছাড়া আর কিছুই বদলালো না ভুতো। সেই ছেলেবেলার মত গোঁ—সবতাতেই ওঠ্ ছুঁড়ি তোর

বে। বলি, এক আধ হাজার নয়, ঘরে কি অত টাকা থাকে বোকা ছেলে। ব্যাঙ্ক থেকে—

ভূতনাথ: বেশ ত, ব্যাঙ্কের একখানা চেকই এনে দাও না। শোন বৌমা, এ হপ্তার পেমেন্টের জন্যে তুই মুরুব্বী ওঘরে বসে চেক লিখছে; তুমিও বৌমা এই ঝোঁকে আমারটাও— (ইশারা)

অচলা: না, তুই আমাকে চিরকালটাই এমনি করে জ্বালাবি দেখছি—

অচলা ঘর থেকে চলে' গেলেন। ভূতনাথ উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পকেট থেকে সিগার কেস ও দিয়াশালাই বার করে নির্বিকার চিত্তে তার সদ্ব্যবহার করতে লাগল।

* * *

সিদ্ধিনাথের ঘর। এঘরের আসবাব পত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। সিদ্ধিনাথ আগেকার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন, তবে মাথার চুলে পাক ধরেছে। ভাস্করের চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। তেমনি হাসি-খুশি ভাব। সিদ্ধিনাথ একখানা মোটা চেকবহিতে সহী করছেন, ভাস্কর আর একখানি চেয়ারে বসে আছেন। অচলা উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন মাথার আঁচলটা একটু টেনে নামিয়ে দিয়ে।

সিদ্ধিনাথ: হ্যাঁ—তোমার দেবতার কাণ্ড দেখ না। পেমেন্টের চেক-গুলো লিখে সহী করাবার জন্যে নিজেই নিয়ে এসেছেন।

ভাস্কর: তাতে মহাভারতটা কি অশুদ্ধ হয়ে গেছে' বলুন ত বৌমা? উনি হয়ত খেয়ে দেয়ে ছুটোর পর যেতেন—ততক্ষণে পাওনাদারেরা টাকা পেয়ে যাবে। আমি ঝড়িৎ ঘড়িৎ

ব্যবস্থা ভালবাসি; আর জানি—বৌমাও সেটা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। কেউ এসে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা বৌমাও চান না হে!

অচলা: ঠিক যেন অন্তর্য্যামীর মতই কথাটা বললেন আপনি—সাধে কি আপনাকে দেবতা বলি? আপনি রয়েছেন বলেই বলছি দেবতা···এই দেখুন না···ওঘরে ভুতোও এসে বসে আছে···

সিদ্ধিনাথ: তোমার বৌমার কথার মানেটা বুঝেছ বোধ হয়—ওঁর আবদারে দুলাল এসে নিশ্চয়ই এমন কিছু চেয়েছেন, যার জন্যে—

ভাস্কর কথাটা শুনেই হো হো করে হেসে উঠলেন:

ভাস্কর: হাঃ হাঃ হাঃ। একেই বলে হে—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আর তোমারও এ অভ্যাস গেলনা সিধু—সেই দেবে, অথচ খোঁটা দিতে ছাড়বে না।

সিদ্ধিনাথ: না না না—সত্যি বলছি ভাস্কর,—খোঁটা দেওয়ার কথা কি বলছ—ইদানীং 'ভুতো চেয়েছে'—একথা কানে সেঁধুবা মাত্র—নির্ব্বিবাদে—তৎক্ষণাৎ চাহিদা চুকিয়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তুমি বরং ভাই—ওঁকে জিজ্ঞাসা করেই দেখ—আমি ওঁকে স্পষ্টই বলেছি যে, ভুতোর ব্যাপারে আমি মুখ বুজিয়ে থাকব।

অচলা: এ সব কি রাগের কথা নয় দেবতা? আচ্ছা, আপনিই বলুন ত—তার যদি কোন সাধ আহ্লাদ করবার সখই হয়, সে কি সত্যিই দোষের? তাতে রাগ করবার কি আছে? হ্যাঁ, যদি বুঝতুম অন্যায় অকর্ম্ম কিছু করেছে, তাহলে না

হয়···এই যে, এখন আবদার ধরেছে ভুতো একখানা হাওয়া গাড়ী কিনবে। সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে--তার দরুণ পাঁচ হাজার টাকা চাইছে। আমি তাকে—

সিদ্ধিনাথ: থাক, আর বলতে হবে না। শুনলে ত ভাস্কর, বোঝ! আমি কিন্তু আগেই বুঝেছিলুম।—দাঁড়াও—

সিদ্ধিনাথ লেখা চেকগুলার উপর সহী করা বন্ধ রেখে লেখা চেকগুলো তুলে পিছনের দিকে একখানা অলেখা চেকে ভুতনাথের নাম লিখতে লাগলেন এবং চেকখানি ছিঁড়ে ভাস্করকে দিয়ে বললেন:

সিদ্ধিনাথ। ওঁকে এটা দাও হে!

ভাস্কর চেকখানি নিয়ে পড়ে বললেন:

ভাস্কর: ভুতোর নামে পাঁচ হাজার টাকার চেক কেটে দিলে?

সিদ্ধিনাথ: হ্যাঁ। উনি ত এই মতলবেই এসেছিলেন। দেবর দামী মোটর গাড়ী চড়ে—

ভাস্কর: এই! আবার তুমি ভুল করছ সিধু। এইটেই বৌমা পছন্দ করেন না।—আর এ ত ভাল কথা হে। একটা ভাল জিনিষ কিনছে ভুতো। তা কারবার এখন যে অবস্থায় উঠেছে, আমাদের সখ নেই তাই—নৈলে অ্যা[illegible]নে তিন খানা মটর গাড়ী চলত। ওরা হচ্ছে আজকালকার ছেলে ছোকরা—তোমার দাদামশায়ের আমলের ছ্যাকরা গাড়ী কি ওদের মনে ধরে? এই নিন্ বৌমা, ভুতো বসে আছে, দিন গে—তবে বলে দেবেন, যেন ভাল করে দেখে শুনে জিনিসটা কেনে?

অচলা এতক্ষণ কাট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, স্বামীর এ দেওয়াটা যেন নূতন রকমের একটা আঘাতের মত তাঁকে আড়ষ্ট ও

ক্লিষ্ট করেছে। কোন রকমে হাতখানা বাড়িয়ে চেকখানা তিনি নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

* *
*

একটু পরে দোতালার দালানে প্রফুল্ল মুখে শীষ দিতে দিতে চলেছে ভুতনাথ। নীচের তলায় নামবার সিঁড়ির কাছে আসতেই—কৈলাস তাড়াতাড়ি সামনে এসে বলল :

কৈলাস : এক বাবু তোমারে খুঁজছেন গো ছোটদাবাবু।

ভূতনাথ : কে বাবু?

কৈলাস : কে জানে কে? এই ল্যাখন ত্থাছেন ত্থাখ।

কৈলাস একটা চিরকুট দিতে সেটা নিয়ে মনে মনে পড়ে ভুতনাথ জিজ্ঞাসা করল :

ভূতনাথ : বসিয়েছ বাবুকে?

কৈলাস : হ্যাঁগো, তোমার ঘরে থুয়ে এনু।

ভূতনাথ : বেশ করেছ। আমার পুরোনো বন্ধু। আচ্ছা, আমাদের জন্যে দু'কাপ চা, আর ওর জন্যে এক ডিস খাবার ওঘরে পাঠিয়ে দাও ত কৈলেসদা!

ভূতনাথের বৈঠকঘর। বড় বৈঠকখানার অন্য দিকে এক কোণে একখানি ছোট ঘর—আধুনিক আসবাবপত্রে কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো। ভূতনাথ ও তারকনাথ সামনা সামনি দুইখানি কেদারায় বসে আলাপ করছে উৎফুল্লভাবে। তারক ভূতনাথের বাল্য সাথী। বর্তমানেও তাকে ২২।২৩ বৎসরের যুবার মত দেখাচ্ছে।

ভূতনাথ। আরে, তোর কথা ভুলতে পারি তারক? বৌমার কাছ থেকে যখন তখন টাকা আদায়ের ফন্দী তুইই শিখিয়েছিলি, এখনো তাই ফলো করে চলিছি - বুঝলি?

তারক: সে কি রে! এখনো বৌমার কাছে তোকে হাত পাততে হয়? কারবারের দৌলতে তোরা ত এখন ধনকুবের। তাতে তুই আবার হাফ পার্টনার—

ভূতনাথ। আমি ও সবের কোন ধারই ধারি না; খাই দাই আর বাঁশি বাজাই—আমারো দশা তাই। বেঁচে থাক আমার বৌমা—হাত পাতলেই টাকা। সেখান থেকেই ত আস্ছি। বিশ মিনিট আগে বৌমাকে গিয়ে বললুম—পাঁচ হাজার টাক বৌমা, মটর গাড়ী কিনব। বাস্—তিন মিনিটের মধ্যেই বৌমা দাদার কাছ থেকে—এই ছাখ্—বেয়ারার চেকে ৫ হাজার টাকা।

তারক: য়্যাঁ! মোটর গাড়ী কিনবি- সত্যি?

ভূতনাথ: তবে কি মিথ্যে করে চেক লিখিয়ে এনে পকেটে রেখেছি? গাড়ীর সন্ধান যে দিয়েছে - এখনি আসবে; চল্না সঙ্গে—

তারক: বরাবর সঙ্গে থাকব ভেবেই ত তোর কাছে এসেছি- এখন আশা ভরসা তুই।

ভূতনাথ। এই ছাখ—ও সব খবর জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। সেই যে মামা বদলী হতে চলে গেলি—তারপর কোন খবরই তোর পাইনি।

এক বালক ভৃত্য ট্রের উপর দুই কাপ চা ও এক ডিস খাবার সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখল। ভুতনাথ খাবারের ডিস তারকের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল:

ভুতনাথ : নে—খেতে খেতে কথা হোক।

তারক : তোর খাবার কই ?

ভুতনাথ : আমার অনেক আগে হয়ে গেছে। বৌমা কাছে বসিয়ে খাইয়ে তবে বেরুতে দেয়। খা—তুই। হ্যাঁ, তারপর—

তারক : মামার ত পোষ্ট আফিসের চাকরী, নানান জায়গায় ঘোরাঘুরির পর টাটানগরে বদলী হতে ওখানকার ওয়ার্কসপে একটা চাকরী পাই। মামা এখন পেন্সন নিয়ে দেশে ফিরলেন। আমার ত ভাই মামা ছাড়া গতি নেই, তাই ছুটি নিয়ে সঙ্গে এসেছি। এখন তুই যদি তোদের অফিসে একটা চাকরী বাকরী জুটিয়ে দিস ত এখানেই থেকে যাই।

ভুতনাথ : বোস্ বোস্—কাজ একটা খালি আছে আমাদের অফিসে—তুই টাইপ জানিস ?

তারক : জানি ভাই। মামা কিছু খরচ করে ঐ বিদ্যেটা শিখিয়েছিল। টাটার আফিসেও ঐ টাইপ করতুম, স্পীড্‌ও খারাপ নয়।

ভুতনাথ : তাহলে আজই একখানা দরখাস্ত দে—আমি তাতে রেকম্যাণ্ড করব।

তারক : আমিও বলছি ভাই—যদি এখানে মাথাগলাতে পারি, তোরই তরফের লোক হয়ে তোর ইনটারেষ্ট ষোল আনা দেখব।

ভুতনাথ : ধ্যেৎ। ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নে।

তারক : হ্যাঁরে, পড়াশোনা কদ্দুর করলি? পাস্ টাস্ কিছু করেছিস্? তোর দাদার ত ভারি সখ ছিল তোকে ইঞ্জিনিয়ার করবে।

ভুতনাথ : সেই জন্যেই ত ইঞ্জিনিয়ারের চালেই চলেছি বরাবর, এখন চাই মোটর। আর, পড়াশোনার কথা যা বললি, মন বসাতে পারলুম না। ঐ মুখস্থ বিদ্যে, কিম্বা এক নাগাড়ে লেগে থাকা ও দুটোই আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। তবে কি জানিস, চালেই মেরে দিয়েছি; ভড়ং দেখলেই লোকে ভাববে—এ লোকটা যে সে নয়।

তারক : নিশ্চয়ই নয়। আগে কাজে বসি, তার পর দেখিস তোকেও কি রকম কাজের লোক করে তুলি।

এই সময় দরজার উপর দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন দালাল কথা বলল। ২৭।২৮ বছর বয়স। বাকপটু, মিষ্টভাষী, চালাক চতুর। জামা কাপড় পরা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক।

গোবর্দ্ধন : আসতে পারি ভুতনাথবাবু?

ভুতনাথ : আসুন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি— বসুন।

গোবর্দ্ধন : না, আর বসব না—উঠুন। লম্বা ট্রিপ দিয়ে টেষ্ট করবার জন্যে মটরখানা আনা গেছে— ড্রাইভার শুদ্ধু—

ভুতনাথ : তাই নাকি। বেশ, বেশ, চলুন তাহলে—

গোবর্দ্ধন : হ্যাঁ, একটা কথা। গাড়ী পছন্দ হলে—

ভুতনাথ : সেখানেই পেমেণ্ট করে ডেলিভারী নেব—এই দেখুন চেক রেডী!

* *

*

শিবনগর হইতে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ তফাতে মহকুমার সদর আলিপুরের অন্তর্বর্তী—দুর্গাপুর অঞ্চল। এই গ্রামে সদর রাস্তার ধারে মোক্তার যুগল বিশ্বাসের বাড়ী। বেলা প্রায় ৯টা বাজে। বাহিরের ঘরে

বেঞ্চির উপর মক্কেলরা বসে আছে। তক্তপোষে একটা ডেস্কের সামনে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে নথীপত্র দেখছেন আলিপুর ফৌজদারী আদালতের সিনিয়ার মোক্তার যুগল কিশোর বিশ্বাস। বয়স প্রায় ৬০ বছর। কিন্তু চেহারা দেখে বয়স ধরা যায় না, কম মনে হয়। দেহের বাঁধুনি শক্ত ও মজবুত; হাড়ে মাসে জড়িত দেহ। দেহের মত মনটিও মজবুত—কথা এমন পাকা আর বাঁকা যে, সহজে অর্থ তার বোঝা যায় না। চোখ দুটি ছোট ছোট হলেও এত তীক্ষ্ণ যে, লোকের মর্মভেদ করে ভিতরটি যেন দেখতে চায়। লোকে বলে,—যুগল মোক্তারের পাটোয়ারী বুদ্ধির কাছে ঝুনো এটর্নিদেরও মাথা ঘুরে যায়। আইনকে ঢালের মত রেখে তার আড়ালে এমন সব কাজ করেন যে, বড় বড় উকীল কৌঁসলীও ঘাবড়ে যান। মোক্তারী পেশার ভিতর দিয়ে জামিন মুচলিখার ব্যাপারে এবং ক্রোকী বা দায়গ্রস্ত সম্পত্তি কেনা বেচার দালালীও তাঁর আয়ের একটা মস্ত অঙ্গ।

সে-দিন যুগল বিশ্বাস হাতের কাজ প্রায় সেরে এনেছেন এবং বাকী কাজগুলি তাড়াতাড়ি সারছেন—স্নানাহার করেই আদালতে বেরুবেন বলে। তাঁর মুহুরীকে লাভজনক অন্য একটা বাণিজ্য-ব্যাপারে পাঠিয়েছেন, কাজেই মক্কেলদের কথাবার্তা বলে, বিদায় দিচ্ছেন। মক্কেলরা প্রায় সকলেই মফস্বলবাসী—সাধারণ স্তরের লোক।

বেঞ্চিতে উপবিষ্ট প্রৌঢ়বয়স্ক এক মক্কেলের দলিল দেখছিলেন যুগল মোক্তার। মুখ তুলে বললেন:

যুগল: হ্যাঁ—দলিল তোমার দেখলুম। তিন তুড়িতে মামলা তোমার জিতিয়ে দেব; তবে সাক্ষী চাই—

১ম মক্কেল: কিন্তু সাক্ষী ত নেই বাবু!

যুগল: নেই বললে ত চলবে না—তৈরী করে নিতে হবে; বুঝলে?

জানাশোনা বিশ্বাসী লোক, দেখতে শুনতে ভালো, কথা বলতে পারে ঝটপট,—এমনি তিনটে লোক চাই; একদিনেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেব—তোতা পাখীর মত কথা বলবে। তবে খরচা পড়বে মাথা প্রতি দশ—তিন জনে ত্রিশ হয়, তা তুমি পঁচিশ দিও। ফী আলাদা। দলিল রইল আমার কাছে—আদালতে টাকা নিয়ে এসো—যাও।

মক্কেলকে আর কোন কথা বলবার ফুরসদ না দিয়েই উঠবার তাড়া দিলেন যুগল বিশ্বাস।

এই সময় ২য় মক্কেল করযোড়ে বলল: মোর মামলার যে আজ তারিখ আছে হুজুর!

যুগল: জানি হে জানি। খেতে ঘুমুতে পারিনে তোমাদের ভাবনা ভেবে। টাকা এনেছ?

২য় মক্কেল: এজ্ঞে—এই ন্যান হুজুর!

কাপড়ের খুঁটে বাঁধা টাকা পেট কোঁচড়ে গোঁজা ছিল—৫।৬টা পাক খুলে নোট ও টাকা বার করে ডেস্কের উপর রাখল মক্কেল—বৃদ্ধ মানুষ সে।

যুগল: (নোটখানা দেখে টাকা পাঁচটা পর পর বাজিয়ে এবং একটা টাকার বাজনা কম দেখে) এটা কেমন ঠেকছে যে—বদলে দে বাপু!

২য় মক্কেল: এজ্ঞে সাথে ত টাকা আর নেই কর্তা—ছাবালের কাছ থেকে নিয়ে আদালতে বদল দিমু।

যুগল: তাই দিও। উকীল মোক্তার আর ডাক্তারদের ফীর বেলাই অচল টাকা অনেকে চালিয়ে দেয় হে—অনেক ঠকে সেয়না হতে হয়েছে—বুঝলে?

২য় মক্কেল : এজ্ঞে।

এরপর বেঞ্চের ৩য় মক্কেলকে (বয়সে সে যুবা) লক্ষ্য করে সুধালেন :

যুগল : তোর কি খবররে পোলোভাঙ্গা ?

৩য় মক্কেল : আপনে ক্যায়ছাল কর্তা, আজ আমার ক্যাসের ছানি করবা—

যুগল : আগে আমার চোখের ছানিটা কেটে দে দেখি! গেল দফার পাওনা টাকাগুলো ত হজম করে বসে আছিস্—এতে চোখ মন সুস্থ থাকে কখনো? কই দেখ—(হাত পাতলেন)

৩য় মক্কেল : এজ্ঞে, সব ত জোগাড় হলো নি কর্তা—

যুগল : এই দেখ—সাধে কি আমার চোখেও ঝাপসা ঠেকে। কি এনেছিস্ দেখি—

৩য় মক্কেল : পাঁচ কম এক কুড়ি গো—এই ন্যান—

তিনখানা পাঁচ টাকার নোট দিল—যুগল মোক্তার দেখে তুলে রাখতে রাখতে বললেন :

যুগল : কি মুস্কিল—পাঁচটা টাকা আবার বাকি ফেললি, তার পর আজকের খরচ আছে। আমার কি বল্—ধারে কাজ সারতে গেলেই ঘাড়ে ভার চাপে। সেইজন্তেই ত পৈ পৈ করে বলি—নগদা কাজে মজা আছে। আচ্ছা, ঠিক সময়ে হাজীর হোস্—

মক্কেলদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে যুগল মোক্তার ওঠবার উপক্রম করছেন, এমন সময় জঁনার্দন ধাড়া নামে এক খঞ্জ প্রবীণ ভদ্রলোক রূপা দিয়ে বাঁধানো লাঠির উপর কতকটা নির্ভর করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন :

জনার্দন : এই যে বিশ্বেস ভায়া; বলি, গাড়ীখানার গতিমুক্তি করতে পারলে হে—কোন খদ্দের টোদ্দের বাগিয়ে ?

যুগল : আরে ধাড়া যে! এলে একেবারে ওঠবার সময়টি ঘেঁসে! হ্যাঁ—যা বলছিলে⋯ খদ্দের বাগানো কি চাড্ডিখানি কথা হে ভায়া⋯ তারপর যে চড়া দাম হেঁকেছ—দাম শুনেই পেছোয়।

জনার্দন : কি বলছ হে বিশ্বেস ? ভজের গাড়ী⋯সাত হাজারের মাল দাওয়ে সাড়ে পাঁচে কিনে, দায়ে পড়ে চারে ছাড়তে চেয়েছি; একে বলছ—চড়া দাম হেঁকেছি ? ওর মধ্যে তোমারও কমিশন আছে পুরো তিন শো।

যুগল : আমি বাজে কথা বলবার লোক নই⋯ আরো কিছু কমাতে হবে সেই কথা বলছি। না হয় তোমার গাড়ী নিয়ে যাও ভায়া—গুদোম ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে।

জনার্দন : নিয়ে যাব মানে ? তোমার কথায় পাঁচ হাজার টাকার একটা ফল্‌স্ ক্যাসমেমো পর্যন্ত লিখে দিলুম—

যুগল : ওটা হচ্ছে দর্শনদারি—খদ্দেরকে দেখাবো যে পাঁচ হাজারে কিনে লোকসান করে বেচছি। কিন্তু চারে কেউ উঠবে না ভায়া! কিছু কমাতে হবে।

জনার্দন : বেশ; আর দুশো না হয় কমালুম। তাহলে চার হাজার থেকে হলো তিন হাজার আট শো, ওথেকে তোমার কমিশন তিন শো বাদ দিয়ে—আমাকে পুরো সাড়ে তিনই দিয়ো। কেমন ?

যুগল : অগত্যা তাই। সাড়ে তিন হাজারই তুমি পাবে। আর,

মা জগদম্বা যদি মুখ রাখেন, হয়ত আজ কালের মধ্যেই হয়ে যাবে।

জনার্দন : আ! তাহলে ত বাঁচাও ভায়া।

* *

*

বাড়ীর মধ্যে ক্ষুদ্র উঠান। একদিকে কুয়াতলা—চৌবাচ্চা। যুগল বিশ্বাস স্নানান্তে স্তব পড়তে পড়তে ঘরের দিকে আসছিলেন।

যুগল : গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং ⋯এহেহে—জ্বালাতন—জ্বালাতন! আ-মর্ পোড়ারমুখী হতচ্ছাড়ি! ভোরবেলা উঠে তোমার এ পিণ্ডি চটকে রাখতে পার না?

যুগল বিশ্বাস যখন স্তব পড়ে আসছিলেন, সেই সময় উঠানের এক পাশে দুর্গারাণী গোবর-মাটির সঙ্গে কয়লাগুঁড়া মেখে সারি সারি গোলা পাকিয়ে রাখছিল। অনূঢ়া, অষ্টাদশী, সুশ্রী সুদর্শনা সুগঠনা তরুণী।

দুর্গারাণী : ভোরবেলায় উঠেই যে বাসন মাজতে বসি মামা—সে কি দেখনি?

যুগল : চুপ কর্ বলছি! বাচ্চা বয়েস থেকে খোরাক পোষাক যোগাচ্ছি—জগদ্দল পাথরের মত গলায় চেপে আছো—ধেড়ে ধুমড়িকে যে দেখে, আর ঘেঁষে না—আবার চোবনা! ঐ গোলা দোব মুখে গুঁজে—ধুমশি কোথাকার—

বাইরে থেকে জনার্দন দালাল ডাকলে : বিশ্বাস মশাই আছেন?

যুগল বিশ্বাসের স্ত্রী জলদা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললেন :

জলদা : বেশ যাহোক, ভাগনীর সঙ্গে উঠনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছ, ওদিকে তোমার মুহুরী এসে চেঁচাচ্ছে!

যুগল : জনার্দন ফিরেছে !··· যাচ্ছি হে যাচ্ছি—ব'স—ব'স—

মিনিট পনেরো পরে। যুগল মোক্তার কাছারীর পোষাক পরে বাইরের ঘরে এসেছেন। সেখানে গোবর্ধনের সঙ্গে বিশেষ আগ্রহসহকারে আলাপ করছেন :

গোবর্ধন : কাজ শেষ করে ফেলেছি স্যার !

যুগল : বলিস্ কি—এক দিনে·· এক কথায় ? তারপর—টাকা ?

গোবর্ধন : পাঁচ হাজার চেয়েছিলেন, তাই বলেছি, তাতেই রাজি হয়ে পেমেণ্ট পর্যন্ত করেছে—এই দেখুন।

যুগল : চেক ? তবেই হয়েছে ! ও ত কলাপাতার সামীল রে—ক্যাস না হওয়া পর্যন্ত কোন দাম ওর নেই।

গোবর্ধন : ক্যাস হবে না মানে ? ভাল করে দেখুন আগে চেকখানা—চেকের ওপর কোন্ ফার্মের নাম ছাপা সেটা দেখুন !

গোবর্ধন এই সময় যুগল মোক্তারের হাতে চেকখানা গুঁজে দিল।
যুগল মোক্তার চশমা খুলে চেকখানা পড়ে সবিস্ময়ে বললেন :

যুগল। য়্যাঁ ! দাস ফ্যাক্টরী—শিবনগর··· সহী করছে—সিদ্ধিনাথ দাস ! একিরে গোবর্ধন...ধনকুবের সিধু দাস শেষ পর্যন্ত গুমর ভেঙে যুগল মোক্তারের পাল্লায় পড়ল সওদা করতে··· যাকে তার ভারি ঘেন্না—য়্যাঁ !

গোবর্ধন : কি ব্যাপার স্যার ! সিধু দাস ··

যুগল : ব্যাপার ? কি বলিরে বাপ গোবর্ধন....ভেবে পাচ্ছিনে কি করি ? তবে বাবা, তোকে না বলে পার নেই কিনা, তাই বলছি। জানিস্ ত—বাপ-মা-খাগী মেয়ে ঐ দুর্গাকে আদরে-গোবরে কি রকম করে পেলে এসেছি আমরা !

গোবর্ধন : আপনার ভাগনীর কথা বলছেন তো?

যুগল : হ্যাঁরে বাবা—হ্যাঁ। কিন্তু কাউকে কি বুঝতে দিয়েছি, ও আমার কন্যে নয়—মরা বোনের কন্যে? সেইজন্যেই ওকে বড় সড়টি করেছি বড় ঘরে দেবার মানসে। এই যার চেক এনেছ—শিবনগরের সিধু দাস • ওরা হচ্ছে আমাদের পালটি ঘর, আর খুব বড় লোকও বটে। উনি ছোট ভাইয়ের তরে বড়-সড় ভালো মেয়ে খুঁজছেন শুনে....আমি এই দুর্গার কথা তুলেছিলাম ঝকমারি করে ..

গোবর্ধন : তার মানে সিধুবাবুর ছোট ভাই .. ভূতনাথ বাবুর...

যুগল : হ্যাঁ হে হ্যাঁ। কিন্তু কথা বলব কি হে, টাকার গরবে ওরা কথাটাকে আমলই দিলে না! বলে কিনা—উকীল মোক্তারের মেয়ে ঘরে আনবেন না বৌ করে! সেই থেকে বাবা, মনে মনে তুষের আগুনে জ্বলছি, আর মা-জগদম্বাকে বলছি—যুগল মোক্তারের মুখের কথা ঠেলে ঠিক ঠাক টেঁকে থাকতে পারে এমন শক্ত মানুষ কি সংসারে সত্য সত্যিই আছে মা? এখন দেখ বাবাজী, মার কাণ্ড—

গোবর্ধন : তাহলে কাণ্ডটা কি রকম কাণ্ড হয়ে উঠেছে সেটাও শুনুন স্যার .. সেই সিধু দাসের এই চেক নিয়ে এসেছেন তাঁরই ছোট ভাই ভূতনাথ দাস! আর আপনার বাড়ীর কাছেই বড় রাস্তায় গাড়ীর ভিতরে তিনি বসে আছেন।

যুগল : বল কি হে! মা জগদম্বা কি তাহলে জল দিয়ে কানের জল টেনে বার করে আনলেন নাকি? আরে, তাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখেছ—ছি ছি ছি ছি—

গোবর্ধন : এই গাড়ীতেই বাড়ী যাবেন কি না—ড্রাইভার পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে—রসিদটা শুধু নেবার জন্যেই—

যুগল : এত কাণ্ড হয়ে গেছে—য়্যাঁ! তাহলে ঝাঁ করে এক কাজ করে ফেল দেখি··বাবাজীকে খাতির করে বৈঠকখানায় এনে বসাও—আমিও একটু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা···বুঝলে কিনা—

গোবর্দ্ধন : বুঝেছি স্যার! কিন্তু ওদিকে কাছারী···

যুগল : তা বটে·· অনেকগুলো মামলা ঝুলছে; তা বাবাজী—এখনকার মামলাটা আরো জরুরী যে—বিশেষ করে মা জগদম্বা যখন ভবিতব্যের মত জনার্দন ধাড়ার ঐ গাড়ীখানাকেই উপলক্ষ করলেন। আচ্ছা, আর দেরী নয়—আনো তাকে।

গোবর্দ্ধন : কিন্তু তাঁর সঙ্গে এক বন্ধু আছেন স্যার—

যুগল : বন্ধু! ভালোই ত—এ সব কাজে বন্ধু সঙ্গে থাকলে আরো ভালো—যাও, যাও।

* *

*

যুগল মোক্তারের আফিস ঘরের পাশেই আর একখানি ঘর মান্যগণ্য মক্কেলদের জন্য সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা আছে। সেই ঘরে ভূতনাথ ও তারক পাশাপাশি দুখানা কুশন চেয়ারে বসেছে—সামনে একখানা ইজি-চেয়ারে বসে যুগল ঘোষাল গোবর্দ্ধনকে বলছেন। গোবর্দ্ধন একটু তফাতে আর একখানা চেয়ারে বসে তাঁর কথা শুনছে।

যুগল : তুমিও গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলে গোবর্দ্ধন, তার পরেই চেতলার জনার্দন ধাড়া এসে উপস্থিত।

গোবৰ্দ্ধন : তাই নাকি ?

যুগল : বলে কিনা—৬ হাজার টাকা দর উঠেছে ; টাকা নিয়ে সে লোক আসছে। আসল কথা কি জানো, জজের বাড়ীর গাড়ী, তার ওপর টেস্ট করা, ও জিনিস এখন আর পাওয়া যায় না—দশ হাজার দিলেও নয়।

ভূতনাথ : আগে জানলে না হয় ছ'হাজারই দেওয়া যেত···কিন্তু এখন ত আর····

যুগল : রাধামাধব···রাধামাধব... দুনিয়ায় টাকাটাই কি বড় কথা বাবাজী ! গোবৰ্দ্ধন যখন কথা পাকা করে ফেলেছে...বিশেষ করে তোমার মত বড় ঘরের সোনার চাঁদ ছেলে হাতে তুলে একবার যা দিয়ে ফেলেছে—সেটা ফিরিয়ে দেব সামান্ত হাজার টাকার জন্মে ! সে পাত্তরই নয় এই যুগল বিশ্বাস। আমাকে জানতেন, তোমার বাবা—সদরে এলে, ফিরতি পথে একবার যুগলের কুঁড়েতে কিছুক্ষণ না বসলে তিনি কিছুতেই শান্তি পেতেন না—বাবাজী,...বুঝলে ? কি ভালই বাসতেন আমাকে...হ্যাঁ, আর খেতে বড্ডো ভালবাসতেন হে, দুর্গোপুরের দাসু ময়রার তৈরী লেডিকেনি ! সে এক দিন গেছে ! এখন দেখ কাণ্ড···কত কাল পরে—তাঁরই আত্মজ এলেন এখানে—তাঁরই আত্মার টানে ! একি আমার পক্ষে কম আনন্দের কথা বাবাজী ! আঁ ! তুমি চুপ চাপ বসে কেন গোবধন—টিকিটখানা লাগিয়ে দাও ঐ রসীদে—আমি সইটা টেনে দিই—

এই রসিদ লেখা ও আদান প্রদানের মধ্যে ঝাঁ করে যুগল মোক্তার একটিবার উঠে দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে উদ্দেশ করে হেঁকে বললেন :

যুগল : অ-মা দুর্গা! মাগো! বাড়ীতে মানী অতিথি—সাক্ষাৎ শিব—একটু মিষ্টিটিষ্টি কিছু আনো মা—

ভূতনাথ : না, না, ওসব হাঙ্গামা করবেন না বিশ্বাস মশাই—

তারক : আপনার মিষ্টি কথাতেই আমাদের পেট ভরে গেছে স্যার!

যুগল : আমি বলেই খালাস বাবাজীরা! কিন্তু আমার বাড়ীতে যিনি মা অন্নপূর্ণার মতন বিরাজ করছেন—কেউ এসেছেন জানলে মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দেবার পাত্রীই তিনি বটেন! আমার ওপর হুকুম—তাঁর এজলাসে জানানো চাই—কেউ এসেছেন কিনা। এই যে সকালে বিকেলে মক্কেলের মেলা বসে—মায়ের হিসেবে ভুল চুক হবার জো নেই—মাথা গুণে রেবাব সাজিয়ে মিষ্টি দেবেন। বলেন—ওরা যে তোমার লক্ষ্মী—শুধু মুখে যাবেন! এই যে—এসো মা—এসো—

দুর্গারানী দুই হাতে দুইখানি খাবার-ভরা ডিস নিয়ে এলো ও টিপয়ে রাখল। পিছনে আট নয় বছরের একটি ছেলের হাতে ট্রের উপর চা, আর একটি পানের ডিপা। সেগুলি দুর্গা টিপয়ে সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে দিল। ভুতনাথ অনিমেষ দৃষ্টিতে দুর্গার পানে তাকিয়ে রইল।

যুগল : লজ্জার কিছু নেই মা—তুমি যেমন নামে আর গুণে দুর্গা, ইনিও তেমনি সাক্ষাৎ শিব মা! চোখে দেখেই মানুষ চিনি; আর, যেই ভূতনাথ—সেই ত সদাশিব—(হাঃ হাঃ হাঃ)

ভূতনাথ : এত বেলায় এত খাবার—

যুগল : কিছু না, কিছু না—তোমার বাবার কথা মনে করে খেতে হবে বাবাজী—এ হচ্ছে দুগ্যাপুরের লেডিকেনী! ঐ যে

বললুম—তোমার বাবা বড্ডো ভালবাসতেন! এই আমার বাড়ীর লক্ষ্মীই বলুন আর অন্নপূর্ণাই বলুন—আমার বড় আদরের ভাগ্‌নী—নামটি নিজেই বলত মা!

দুর্গারানী: শ্রীমতী দুর্গারানী দাসী।

যুগল: আচ্ছা, তুমি যাও মা—ভুলে এসব নিয়ে যাবে' খন।

দুর্গারানী থালা থেকে পানের ডিপাটি তুলে টিপয়ে রেখে চলে গেলেন।

যুগল: এমন গুণের মেয়ে আমাদের ঘরে আর একটি পাবে না। আমি আবার সেকেলে রীতি দু'একটা অদল বদল করে চলি—একটু বেশী বয়েস করেই মেয়েদের বিয়ে-থা দেওয়া পছন্দ করি। সেইজন্যেই ত মা-দুর্গার আইবুড়ো নামটি এখনো খণ্ডায় নি। তাছাড়া, ঠিক মনের মতন পাত্রও পাচ্ছি না, খুঁজে খুঁজে নাকাল হচ্ছি বাবা—নাকাল, নাকাল।

গোবর্দ্ধন: তাহলে আমি বলি স্যার, আপনার মা জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন; আপনার মুখ থেকেই বেরিয়ে গেল—সদাশিব আর সেই সঙ্গে মিষ্টির থালা হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন দুর্গা দেবী। তাই বলি—শিবদুর্গা মিলনের ব্যবস্থা করলে হয় না?

কথাটা শুনে ভূতনাথের কান দুটো লাল হয়ে উঠল এবং তারক তা কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে একটা চিমটি কাটল।

যুগল: সে সৌভাগ্য কি আমার হবে বাবা? তবে আজ যদি সি বাবুর বাবা বেঁচে থাকতেন, এ প্রস্তাব লুফে নিতেন। কি সিধুবাবু কি গরীবের ঘর থেকে, বিশেষ একটা সামা মোক্তারের ভাগনীকে—

গোবর্দ্ধন : ভূতনাথ বাবু কি বলেন ? আমরা চেষ্টা করব ?

ভূতনাথ : দেখুন, এই সপ্তাহেই আপনি আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন ; আমি বৌমাকে একথা বলব। বাবার সঙ্গে যখন আপনার জানাশোনা আর বন্ধুত্ব ছিল—তখন আমার বৌমা—

যুগল : জয় মা জগদম্বা—জয় বিশ্বনাথ !

গাড়ী চলেছে। ভূতনাথ ও তারক পাশাপাশি বসে যুগল মোক্তারের ভাগিনীর সম্বন্ধেই আলোচনা করছে।

তারক : তুই আর মত পালটাস নি যেন—এই মেয়েকেই তোর বৌ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া চাইই! খাসা মেয়ে—বিউটিফুল।

ভূতনাথ। কি আশ্চর্য ! আমি জানতুমই না—বাবার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের অত মাখামাখি ছিল ! আর এঁর বাড়ীতেই—

তারক : এমন দুর্গাপ্রতিমা থাকতে পারে—কে জানত ?

ভূতনাথ : ঠিক বলেছিস্। আর ভাই—কথাগুলোও বেশ মিষ্টি নয় ?

তারক : (উল্লাসে পীঠে চাপড় মেরে) তাহলে মনে ধরেছে—কাণে সুধাবর্ষণ করেছে বল্। তবে আর কি—মার দিয়া কেল্লা—শিবদুর্গা-মিলন হবেই।

* *

*

দাস ফ্যাক্টরীর আফিস ঘর। আফিসঘরেরও এখন পরিবর্তন হয়েছে এবং তাতে শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ সূচিত হচ্ছে। বেলা ১২টা।

ভাস্কর : ভূতোর ব্যাপার নিয়ে তুমি মিছে মন খারাপ করছ সিধু !

সিদ্ধিনাথ : না ভাই,—এখন আমার জীবনে অশান্তি যদি কিছু থেকে

থাকে—ওকেই নিয়ে। কত চেষ্টা করলুম বলত—পেছনে তিন তিনটে মাষ্টার রাখলুম; চার চার বার র‍্যাপিয়ার হলো—সব বৃথা—

ভাস্কর: তার মানে কি জানো—পড়াশোনায় মন ও কিছুতেই নিবিষ্ট করতে পারে না—ওর স্বভাব হচ্ছে অত্যন্ত চঞ্চল; ছুটোছুটি মাতামাতি এই সব নিয়েই থাকতে ভালবাসে। তুমি ত চেষ্টার ক্রটি করনি, কিন্তু ওর চেষ্টা নেই! ম্যাট্রিকটাও যদি পাস করতে পারত—

সিদ্ধিনাথ: ও ভেবে রেখেছে—পাশ করে কি হবে! তার পর, দাও বললেই যখন টাকা মিলছে, আর এটা বরাবর চলবে—তখন মেহন্নত করে কি দরকার?—তুমি হয়ত শুনে রাগ করবে সিধু, ওর এইভাবে বিগড়োবার মূল হচ্ছে ওর বৌদি—আমি বলছি, একদিন এর জন্যে ওঁকে পস্তাতে হবে।

ভাস্কর: ওসব কথা ছেড়ে এখন কাজের কথায় এস। ওকে এভাবে ওর ইচ্ছামত চলতে না দিয়ে—এসো আমাদের মধ্যেই রাখবার ব্যবস্থা করি।

সিদ্ধিনাথ: কি করতে চাও?

ভাস্কর: কাজের কিছু কিছু ভার ওকে দেওয়া যাক—

সিদ্ধিনাথ: তবেই হয়েছে!

ভাস্কর। ও-ভাবে হতাশ হলে চলবে না হে! বড় হয়েছে—এখন মিষ্টি কথায় ওকে ভোলাতে হবে। শোন, বেশ করে সাজিয়ে গুজিয়ে একখানা ঘরে ওর আলাদা আফিস করে দেওয়া যাক, কারখানার কাজ কিছু কিছু সুপারভাইজ

করুক, অন্ততঃ শিখুক ত! সে আমি ওকে ডেকে ঠিক করে নেব। আর একটা কথা সিধু—এ বয়েসটা বড় খারাপ, পা পিছলাবার ভয় পদে পদে। তাই বলছিলুম কি, ভাল ঘরের একটি মেয়ে দেখে বিয়েটা দিয়ে দাও দেখি—

সিদ্ধিনাথ: অচলাও একথা বলছিল বটে—ওরও ভারি ঝোঁক হয়েছে—

ভাস্কর: বাস্ বাস্—তবে আর কি! তোমাদেরই স্বঘরের একটি খুব ভাল মেয়ের সন্ধান আমি পেয়েছি। যদি ইচ্ছে কর—

সিদ্ধিনাথ: বেশত, চল একদিন দেখে আসা যাক। এখন ওঠ, তোমাকে নামিয়ে দিয়েই যাই....আরতি মা ভাত নিয়ে বসে আছেন কখন থেকে—

ভাস্কর: সে দোষ আমারই; তোমার বাড়ীতেও ঐ অবস্থা—মনটা তোমার ভুতোর ব্যাপারে মুষড়ে গেছে দেখে অসময়ে আফিসে টেনে এনেছিলুম। তা ভালই হলো—চল।

* *

*

পথ। ঘোড়ার গাড়ীতে ভাস্কর ও সিদ্ধিনাথ যাচ্ছেন। এক স্থানে একখানা গরুর গাড়ীকে পথ দেবার জন্যে গাড়ী থেমেছে—এমন সময় পিছন থেকে একখানা মটর এসে ক্রমাগত হর্ণ দিতে লাগল।

সিদ্ধিনাথ: এখানে আবার মটর এলো কোত্থেকে—

ভাস্কর: ওহে মহাঙ্গীর,—গাড়ী কিনারায় ভিড়িয়ে—পথ দাও ভেঁপুওলা গাড়ীকে—

উক্ত ব্যবস্থায় মটর পাশ দিয়ে চলে গেল। সেই সময় দুই বন্ধু

দেখলেন—গাড়ীর ভিতরে বসে ভূতনাথ সিগারেট টানছে। সিদ্ধিনাথ গুম হয়ে গেলেন। তারপর বললেন:

সিদ্ধিনাথ: দেখলে কাণ্ড!

ভাস্কর: কাণ্ড আর কি—৫ হাজার টাকার গাড়ী! তা ভুতোর পছন্দ আছে।

সিদ্ধিনাথ: আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

ভাস্কর: আমি জেনেছি—বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে না এই ত? কিন্তু এসব পাগলামী ছাড়, মনকে শক্ত কর। অচলা যার ছেলে-পুলে হয়নি, আর হবেও না। তিনি জানেন, ভুতোই তার ছেলে। তুমিও তাই মনে করে—মনের কষ্টটিকে ঠেলে ফেল দেখি। আর,—সত্যিই ত, এ সব ভোগ করতে ঐ ভুতোই!

সিদ্ধিনাথ: হুঁ।

* *

*

দাস-বাড়ী-অন্দরমহল। অচলার ঘর। মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। ভূতনাথ খেতে বসেছে—অচলা কাছে বসে আছেন। ভূতনাথ সামান্য কিছু খেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে দেখে অচলা বললেন:

অচলা: আজ তোর হল কি—সব যে পড়ে রইল রে?

ভূতনাথ: গাড়ী যেখানে কিনতে গিয়েছিলুম—খুব খাইয়েছে তাই—

অচলা: উনিও হাতে-ভাতে করেই উঠলেন—কিছু না খাওয়াই! মনের ত হদিস পাওয়া ভার! কি হয়েছে কে জানে?

ভূতনাথ: হবে আবার কি! দাদাই বা আজ খেতে এত বেলা করলেন কেন?

অচলা : হ্যাঁরে—তুই নাকি গাড়ী করে আসবার সময় পথে ওঁদের গ্রাহ্যই করিস্ নি ?

ভূতনাথ : সে কি বৌ মা—

অচলা : ভেবে দেখ দেখি—কারখানার কাছে ওঁদের গাড়ীর পাশ দিয়ে যখন যাস্—

ভূতনাথ : তোমার দিব্যি বৌমা—আমার এক বন্ধুকে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়েছি....এ ছাড়া ত কিচ্ছু জানি না ! হ্যাঁ—শোন, গাড়ীতে বসে আমি একটা কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলুম···আমার তখন আর কোন দিকে হুঁস্ ছিল না ·· সত্যি বলছি বৌমা !

অচলা : য়্যাতো ভাবনা তোর কিসের শুনি যে হুঁস থাকে না ?

ভূতনাথ : বলবো বৌমা · সে একটা ভারী কথা ···এখন নয়, বলবো তোমাকে।

* *

*

সিদ্ধিনাথের ঘর। রাত্রি হয়েছে। সিদ্ধিনাথ ও অচলা। এদিন একটু রাত করেই সিদ্ধিনাথ ফিরে এসে জামা খুলে রাখতে রাখতে অচলাকে বলছেন :

সিদ্ধিনাথ : তুমি যেন দিন দিন ছেলেমানুষ হোচ্ছ ! ও কথা ভূতোকে বলতে গেলে কেন ?

অচলা : কেন বলব না ? অন্যায় যদি করে, জেনে চেপে থাকবার মানুষ আমি নই ! তবে এ কথাও বলি বাপু—ভূতো আমার কাছে কখনও মিছে কথা বলবে না···সত্যিই সে তোমাদের দেখেনি।

সিদ্ধিনাথ: তার এ-কথা আমিও মানি। এ পর্য্যন্ত ও কখন আমার সামনে মুখ তুলে কথা কয় নি। কিন্তু এ বয়েসে এত বেহুঁস হয়ে থাকাও ত ভাল নয়। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ইয়ার-বক্সিও জুটেছে।

অচলা: কি রকম?

সিদ্ধিনাথ: এক বন্ধুকে চাকরী দেবার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। ছেলেটা অবিশ্যি কাজের—আর এ গাঁয়েরই ছেলে; তবুও আমার ইচ্ছা ছিল না অফিসে ঢোকাতে। কিন্তু ভাস্করের ঝোঁক হয়েছে—ওকে চাকরী দিয়ে ভূতোকে খুশি রেখে ঐ সঙ্গে তাকেও কাজে লাগিয়ে দেওয়া।

অচলা: জানি গো, দেবতা আমার এমনি হিসেব করেই কাজ করেন—তোমার মতন নয়!

সিদ্ধিনাথ: তুমি আমাকে ভুল বুঝনা অচলা; আমি জানি, তোমার আর ছেলে-পুলে হবেনা—ভূতোই আমাদের সব। কিন্তু এখন থেকে ও যদি শক্ত না হয়-কিছু রাখতে পারবে না। আমি আর ভাস্কর ত চিরকাল থাকব না—ওকে কাজের লোক করে তোলাই হচ্ছে আমাদের ঝোঁক, তার জন্যেই ত যা তা বলি। কিন্তু তা বলে এইখানটায় দরদ আর স্নেহের কমতি নেই।

অচলা: আমিও সে বুঝি গো, বুঝি!

সিদ্ধিনাথ: এখন শোন—তোমার দেবতাই তোমাকে বলতে বলেছেন, ওঁর ইচ্ছে—কাল থেকেই ভূতোকে আফিসে বার করবেন, আর ওর জন্যে একটা মোটা টাকা এলাওয়েন্স বলে মাসিক

বরাদ্দ করে দেবেন—যাতে তোমার কাছে এসে ওকে আর হাত পাততে না হয়।

অচলা : এ তো খুব ভাল কথা গো!

সিদ্ধিনাথ : আরো একটা কথা বলেছে ভাস্কর। তুমি ভূতোর বিয়ে দিতে চাও—একথা ভাস্করের কানে গেছে; ওরও এই ইচ্ছে। এমন কি, ভালো ঘরের একটি ভালো মেয়েও দেখে এসেছে ভাস্কর।

অচলা : সাধ করে কি ও দেবতাকে আমি অন্তরযামী বলি? শুনে যে কি আনন্দ আমার হচ্ছে! আমি কালই মা-সুবচনীর পূজো দোব! আমার ভূতোর বে হবে, তার বৌ আসবে · এ যে আমার কত দিনের সাধ!

* *

*

পরদিন সকালবেলা—অচলার ঘরে ভূতনাথ প্রাতরাশে বসেছে। খেতে খেতেই সে অচলার কথা শুনছে :

অচলা : হ্যাঁ—লক্ষ্মীটি, এতে যেন অমত ক'র না। আমি ঠাকুরকে বলে রেখেছি—বেলা দশটার আগে তোমার খাবার সব তৈরী করে রাখবে। তার পর, একটা বাজলেই তোমার বেয়ারা এসে খাবার নিয়ে যাবে। মন দিয়ে কাজকর্ম শিখে নেওয়া চাই। হ্যাঁ, আর শোন—আপিস থেকে তোমাকে মাস মাস এক শো টাকা হিসেবে হাত খরচ দেবে, আর আমার কাছে তোমাকে হাত পাততে হবে না।

ভূতনাথ : ধ্যেৎ। আমি ও চাইনা। আমার টাকার দরকার হলেই তোমার কাছে হাত পাতব বৌমা! ওঁরা আফিস থেকে যা

দেবেন—তুমি নিয়ো ; আর কারুর কাছে হাত পাতবার ছেলেই আমি বটে !

অচলা : শোন কথা ! আমি কি চিরকাল বেঁচে থাকব তোর জন্তে ! আমি মরে গেলে কি হবে ?

ভূতনাথ : তুমি ও কথা ব'লনা বৌমা ! আমি ও ভাবতেই পারি না—

অচলা : আচ্ছা, আর ও কথা না হয় বলব না। তাহলে যেন মনে থাকে—ঠিক সাড়ে ন'টা বাজলেই আমি কৈলেসকে তেল গামছা সাবান দিয়ে পাঠাব।

ভূতনাথ : আমার কিন্তু বৌমা এটা কেমন কেমন লাগছে—ঐ দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত একটা ঘরে কয়েদীর মতন বসে থাকা ! তাহলে ইস্কুল কি অপরাধ করেছিল—বল ?

অচলা : না ভূতো, সে হবে না—আপিসে তোমাকে বেরুতেই হবে, আর দশটা থেকে চারটে—ঐখানেই থাকবে, লক্ষীটি।

ভূতনাথ : আচ্ছা—দেখি। তোমার কিন্তু এ ভারী শক্ত শাসন বৌমা ! বাবা !!

* *
*

দাস ফ্যাক্টরী। একখানি সুসজ্জিত আফিস-ঘর। নূতন টেবিল, চেয়ার, ত্ব'খানা বাড়তি চেয়ার, একটু দূরে একখানা ইজি-চেয়ার, টেবিলের উপর যথাযথ সরঞ্জাম, একটা কলিংবেল। ইজি চেয়ারের কাছে টিপয়—বনাতের ঢাকনি দেওয়া জলের গ্লাস। দরজায় বাহারী পরদা টাঙানো।—সিদ্ধিনাথ, ভাস্কর ও ভূতনাথ।

ভাস্কর : দেখছ ত, দামী দামী নতুন আসবাবপত্র আনিয়ে তোমার ঘরখানি সাজানো হয়েছে।

বলেই কলিংবেল টিপে দিলেন—শব্দের সঙ্গে বাদল নামে এক কিশোর বয়স্ক বেয়ারা—উর্দী ও চাপরাশ পরা অবস্থায়— এসে অভিবাদন করল।

ভাস্কর : তোমার জন্যে এই বেয়ারা বাহাল হয়েছে—দরকার পড়লেই বেল টিপে দেবে, ছুটে আসবে। ঐ পর্দার ওধারে—দরজার পাশে ও হাজির থাকবে। আচ্ছা—তুই যা।

বেয়ারা মাথা নুইয়ে চলে গেল। টেবিলের উপর রাখা একখানা মোটা বাঁধানো খাতা খুলে ভাস্কর বলতে লাগলেন :

ভাস্কর : এটা হচ্ছে ডেইলি রেজিষ্টার্ড বুক। কোন্ ঘরে কি কি কাজ হচ্ছে—কোন্ কাজ কোন্ ফোরম্যানের আণ্ডারে রয়েছে... নাম নম্বর ধরে তার হিসেব এতে লেখা আছে। তুমি এগুলো পড়ে দেখবে, আর মাঝে মাঝে ইনেস্‌পেকসান করবে। খানিক পরে আমি এসে তোমাকে কারখানায় নিয়ে গিয়ে ওয়ার্কার্স ও সুপারভাইজারদের সঙ্গে ইনট্রডিউস করে দেব।

সিদ্ধিনাথ : আগে তুমি খাতাখানা ভাল করে পড়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। যেখানে বুঝতে না পারবে—জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। নিজের কাজ, এতে লজ্জার কিছু নেই—বুঝলে ?

* *
*

আফিস-ঘরের একটা অংশ। কর্মচারীরা কাজ করছে। একদিকে দু'জন টাইপিষ্ট টাইপ করছে। তাদের একজন তারক। ভাস্কর ও সিদ্ধিনাথ ঘরে ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়াল।

সিদ্ধিনাথ : বসুন, বসুন—কাজ করুন।

ভাস্কর সিদ্ধিনাথের দৃষ্টি নবাগত তারকের দিকে আকৃষ্ট করলেন। দুজনেই তারকের টেবিলের কাছে গেলেন। ভাস্কর টাইপ করা একখানা কাগজ তুলে সিদ্ধিনাথকে দেখতে দিলেন। সিদ্ধিনাথ সেখানা দেখে টেবিলে রেখে বললেন :

সিদ্ধিনাথ : বেশ হচ্ছে—স্পীডও ভাল দেখছি।

ভাস্কর : বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে—বুঝলে? ভূতনাথের সুপারিশ যেন সার্থক হয়।

বলেই তার পিঠটায় ধীরে ধীরে চাপড় দিয়ে উভয়ে বেরিয়ে গেলেন।

* *

*

আফিস-ঘরে ভাস্কর ও সিদ্ধিনাথ। এঁরা এখন বাড়ীতে খেতে যাবেন। বেলা ১২টা।

ভাস্কর : ভাল কথা, যাদবপুরের সেই মেয়েটিকে দেখতে যাবার কি হলো হে? বলেছিলে বৌমাকে?

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ হে, হ্যাঁ। শুনে ত আহ্লাদে তার সেই—'মেধো ভাত খাবি—না আঁচাব কোথায়'—সেই অবস্থা! এখন তুমি একদিন উদ্যোগী হয়ে নিয়ে গেলেই হয়।

ভাস্কর : বেশ, তাহলে আজ বিকেলেই যাওয়া যাক চলো। তুমি বাড়ী গিয়েই বৌমাকে বোলো—যেন তৈরী হয়ে থাকেন। ঠিক পাঁচটায় আমরা বেরুব।

* *

*

ঘড়িতে একটা বাজল। এ পর্য্যন্ত মেসিনের একটা একটানা শব্দ

শোনা যাচ্ছিল, এই সময় সেটা থেমে গেল। ভূতনাথের ঘর। রেজিষ্টারী খাতাখানা দেখতে দেখতে এই সময় ভূতনাথ সেখানা মুড়ে ঠেলে দিয়ে বলল :

ভূতনাথ : ন্যুইসেন্স—

ওদিকে তারকও ভূতনাথের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং তার এই তাচ্ছিল্যভাব লক্ষ্য করে ঈষৎ হাসল। ভূতনাথ তাকে লক্ষ্য না করেই চেয়ার থেকে উঠে দিয়াশলাই সংযোগে সিগারেট ধরিয়ে ইজি চেয়ারে বসতে গিয়েই—তারককে দেখতে পেয়ে সহর্ষে বলে উঠল :

ভূতনাথ : আরে—চুপি চুপি এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছিস ?

তারক : তোর অফিস-ওয়ার্কস্ দেখছিলুম। খাতাখানা অমন করে ঠেলে ফেললি যে ?

ভূতনাথ : দূর! কে কি কাজ দিয়েছে—তার সাইজ, নম্বার, ওয়েট, রেট, এমাউণ্ট—বাপস্! ইস্কুলেরও বেহদ্দ। এসব আমার পোষাবে না।

তারক : কিন্তু ও কথা বললে ত চলবে না! তোর ত আর চাকরী করতে আসা নয়—নিজের কারবার। সত্যি ভাই ভূতো—তোকে হোমরা চোমরা অফিসার হয়ে বসতে দেখে আমার বুকখানা ত ফুলে উঠেছে। না ভাই—তোকে এ কাজে লেগে থাকতেই হবে। আর—আমি ত তোকে আগেই বলেছিরে—আমি তোকে তালিম দোব···সব তোকে চুপি চুপি জানিয়ে ওয়াকিবহাল করে তুলবো।

ভূতনাথ : আরে, তুই যে দেখছি গাছে উঠতে না উঠতেই কাঁধির দিকে হাত বাড়াতে চাস্। যাক—আমার সুপারিস তাহলে তোর কাজে লেগেছে দেখছি।

তারক : লাগবে না! তুই লোকটা কে—সে কথা ভুলে যাস কেন? হাফ পার্টনার। জেঁকে বোস ত দেখি—

ভূতনাথ : এই নে (একটা সিগারেট এগিয়ে দিল) ঐ চেয়ারখানা টেনে এনে বোস্...

চেয়ারখানা কাছে টেনে আনতে আনতে তারক বলল :

তারক : সেকিরে! তুই হচ্ছিস্ ওপরওলা...অফিসার... তোর সামনে—

ভূতনাথ : নেকামী রাখ—বোস ত। ওদের সামনে খাতির করিস্। শোন্—একটা বাজলেই সটান এখানে চলে আসবি—এক সঙ্গে দু'জনে টিফিন করা যাবে।....

এই সময়ে বাদল বেয়ারা টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে এলো—

ভূতনাথ : ঐ এসে গেছে ..

বাদল টেবিলের উপর সাদা চাদর বিছিয়ে কেরিয়ার থেকে খাবারগুলি নামাতে থাকে।

তখন টিফিনের ছুটি হয়েছে। কারখানা ও আফিসের লোকজনদের বাহিরে ও কারখানার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমাবেশ এবং জলযোগের অবস্থা ও ব্যবস্থাদি দেখে প্রতিষ্ঠানটির বিপুলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

* *

*

ভূতনাথের ঘর। একই টেবিলে লুচি তরকারি মিষ্টাদি সাজানো—ভূতনাথ ও তারক প্রফুল্ল মনে টিফিন করছে।... তারক ডিস থেকে একটা রসগোল্লা তুলে ভূতনাথকে দেখিয়ে বলল :

তারক : এই রসগোল্লা দেখে দুর্গাপুরের কথা মনে পড়ে গেল ভূতো; সেখানে লেডিকেনি খেয়ে এলি...কথাও দিলি....আসবার

সময় গাড়ীতে কি উচ্ছ্বাস···তারপর চুপ মেরে গেলি····
দুর্গারাণীর জন্যে সত্যিই দুঃখু হচ্ছে আমার।

ভূতনাথ : আমার কথাটা শোন্ আগে।···তুই ত ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছিস্···আমার মাথায় যখন যে ঝোঁক চাপে··· সেটা কখনো চাপা থাকে না····পাকা না করে ছাড়বার পাত্রই আমি কিনা? আজও সকালে কথাটা ভেবেছি, তবে—বৌমাকে বলতে গিয়েও বলা হয় নি। আজ বিকেলে বাড়ী গিয়েই তাকে সব বলব; তার পর পারি ত, ধরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব দুর্গারাণীকে...বুঝলি?

তারক : খুব—একেই বলে ধুকড়ির ভেতর বুকড়ি চাল! বয়েসের সঙ্গে তোর বুদ্ধি পেকেছে—আগা ছেড়ে গোড়া ধরতে শিখেছিস্!

ভূতনাথ : আরে—কথা দিয়েছি ত বৌমার ভরসাতেই···বৌমা থাকতে কারুর পরোয়া করিনে!—এই নে।

রুমালে হাত মুছে সিগারেট দিল।

* *
*

দাস-বাড়ী। অন্দরমহল—অচলার ঘর। অচলাকে এই প্রথম বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোষাকী সাড়ী ব্লাউজ ও গহনাগাঁটি পরে রূপ-সজ্জা করতে দেখা গেল। তখন অপরাহ্ন—ঘড়িতে সাড়ে চার ঘটিকা সময় ঘোষণা করছে।

ভূতনাথ ঘরে ঢুকেই প্রসাধন-রতা অচলার পানে ক্ষণকাল অপলক নয়নে চেয়ে থেকে তারপর বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল :

ভূতনাথ : কোথাও যাবে নাকি বৌমা?

ভূতনাথের কথায় ও তাকে হঠাৎ দেখে অচলা প্রথমে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হলেন, তার পরই নিজেকে সংযত করে বললেন :

অচলা : কি করে বুঝলি যে কোথাও যাব ?

ভূতনাথ : আমি—এখনো তেমনি খোকা আছি নাকি ? বাড়ীতে কি তুমি কোন দিন এই সব কাপড় জামা গয়না এত যত্ন করে পর ? কোন দিন ত দেখিনি !

অচলা : দেখবি কি করে বল্ ?—বৌমাকে কি কোন দিন কোথাও নিয়ে যাবার নাম-গন্ধ করেছিস্ ? ভাগ্যিস্, বামুন-বাড়ীর দেবতার দয়া হলো—তাও যাচ্ছি তোঁরই কাজে—তাই ত তোকে ডেকেছি।

ভূতনাথ। কি ব্যাপার বল ত বৌমা—বুঝতে পারছি না ত কিছু !

অচলা : বুঝে আর তোর কাজ নেই—গাড়ী ত কিনেছিস্, আজকে দিবি গাড়ীখানা—আমরা একটু বেড়িয়ে আসব ?

ভূতনাথ : বা-রে ! তোমার সঙ্গে ত কথাই হয়ে আছে—যখন ইচ্ছে বেড়াতে যাবে, কালীঘাটে হরদম নিয়ে যাবো; তা—এখন কোথায় যাচ্ছো আগে বল ?

অচলা : ভেবেছিলুম—ফিরে এসে বলব, তা ছেলের আর তর সয়না ! তবে বলি শোন্ যাচ্ছি আমরা যাদবপুরের নন্দীদের বাড়ী। কেন জানিস্, সে বাড়ীতে খুব ভালো একটি মেয়ে আছে—যদি পছন্দ হয়, তোর বৌ করব বলে আজই কথা পাকা করে আসব।

ভূতনাথের তীব্র আপত্তিতে অচলার মুখের কথা বাধা পেল। মুখখানা শক্ত করে ভূতনাথ বলল :

ভূতনাথ : না-না-না—ও হবে না বৌমা! সত্যি বলছি—হবে না—কিছুতেই না—তুমি যাবে না।

অচলা : ও কিরে—বিয়ের কথা শুনেই অমনি বিগড়ে গেলি ? কেন, চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবি নাকি! আর এও বলি—আগে কনে না দেখলে কখনো কি বিয়ে হয় ? কনে দেখতে যাব না ?

ভূতনাথ : ওকথা নয় বৌমা! আমি বলছি—ওখানে নয়-কিছুতেই নয়—তুমি যেও না—লক্ষ্মীটি!

অচলা : এ যে তোর ছেলেমানুষের মতন আবদার রে! ওখানে নয়—একথার মানে ?

ভূতনাথ : তাহলে তোমাকে বলি বৌমা! সেই যে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলে—কি ভাবছিলুম যে হুঁস ছিল না ? এখন তা হ'লে বলছি শোন : দুর্গাপুরেই সেদিন আমি কনে দেখে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে ; তুমি দেখলে তোমারও পছন্দ হবে। যাও ত—সেই মেয়েকেই দেখবে চল বৌমা!

অচলা : অ-মা! একি কাণ্ড! তোর পেটে পেটে এত! আমাদের লুকিয়ে কনে পর্যন্ত দেখে এসেছিস্, আর আমরা এদিকে—

ভূতনাথ : আমার দোষ নেই বৌমা! গাড়ী কিনতে গিয়ে ঐ বাড়ীতে উঠেছিলুম কি না! তুমি নাম শুনেছ বৌমা—দুর্গাপুরের যুগল মোক্তার—তাঁর ভাগনী। আরো শোন—বাবা ওঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন, সদরে গেলেই ওখানে যেতেন—কত কথা বললেন—ভদ্রলোক!

অচলা : তারপর বুঝি ভাগনীকে দেখিয়ে তোর মাথা ঘুরিয়ে দিলে ? যাক্,—তোর তবে মেয়ে পছন্দ হয়েছে! তা—একথা এসেই

বলিসনি কেন—তাহলে এ কেলেঙ্কারী আর হোত না!
এদিকে ওঁরা দুজনে ওঘরে তৈরী হয়ে বসে আছেন আমাকে
নিয়ে যাবেন বোলে! আর, আমারও এমনি পোড়া বরাত—
ভালো মনে কিছু কখনো করবার জো নেই—এখুনি আমাকে
দুশো কথা শুনিয়ে দেবেন! যাই দেখি—

অচলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

* *

*

সিদ্ধিনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথ, ভাস্কর, অচলা। ও-ঘরে ভূতনাথের মুখে যে-ভাবে দুর্গাপুরের পাত্রীটির প্রসঙ্গে অচলা শুনেছিলেন, একটু রেখে ঢেকে সে কথা এ ঘরে এসে বলতেই সিদ্ধিনাথ স্বোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন:

সিদ্ধিনাথ: শোন ভাস্কর—শোন হে! ওঁর আদুরে দেবর কি রকম করে ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছেন!

ভাস্কর: মেয়ে দেখেছে—পছন্দ করেছে—বৌমাকে খুলেও সব বলেছে—বাস্! এখন দেখা দরকার হোচ্ছে—ঘর গাঁই গোত্র সব ঠিক আছে কিনা!

অচলা: ভূতো তাও বলেছে। খুব নামী আর জানা ঘর—বাবা নাকি সদরে গেলেই সে বাড়ীতে যেতেন…ঐ যে—দুগ্যোপুরের যুগল মোক্তার, তারই—

সিদ্ধিনাথ: য়্যাঁ!!

অচলা: কি হলো?

সিদ্ধিনাথ: তোমার দেবতা ত সামনে বসে—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো!—

ভাস্কর: সোজা করেই ত বললে হয় সিধু। ব্যাপার হচ্ছে বৌমা,

ভূতোর বিয়ের কথা যখন আমাদের মনেও ওঠেনি, তখনই ওবাড়ী থেকে সম্বন্ধ এসেছিল—মোক্তারের ভাগনীর সঙ্গে ভূতনাথের বিয়ে যাতে হয়। কিন্তু সিধুর ইচ্ছা নয় যে, উকীল মোক্তারের ঘরের মেয়ে এ-বাড়ীতে বৌ হয়ে আসে—

সিদ্ধিনাথ : শুধু তাই নয়—ঐ মোক্তারটির নাম পর্য্যন্ত সাঁঝে সকালে কেউ জীভের ডগায় আনতে চায় না—এছাড়া আরো অনেক কথা শোনা যায়। এখন মনে হচ্ছে, কোন রকমে বোকারামকে বাগিয়ে ভাগনীটিকে দেখিয়ে দিয়ে ভেড়া বানিয়েছে।

অচলা : ভূতো যে তবে বললে—বাবার সঙ্গে নাকি খুব আলাপ ছিল !

সিদ্ধিনাথ : ও সব হোচ্ছে ঐ ধড়িবাজ ঘুঘুর ওপরচাল ! জানে—বাবা ত বেঁচে নেই, এখন এক তরফা বলে গেলেই হলো···আর তুমিও অমনি তাই শুনে আহ্লাদে—

অচলা : আমাকে কেন বলছ—আমি কি জানি ! শুনুন ত দেবতা, ওঁর কথার ছিরি ?

ভাস্কর : সত্যই ত, বৌমাকে এর জন্যে খোঁটা দেওয়া তোমার ভাল হয়নি সিধু ! উনি যা শুনেছেন, তাই এসে বললেন। এখন বোঝাতে চাও ত তুমি নিজেই ভূতনাথকে ডেকে—

সিদ্ধিনাথ : না ভাই, আমি এর মধ্যে আর নেই। যদি আমার কথা তখন না রাখে, আমার পক্ষে এ বাড়ীতে থাকাই মুস্কিল হবে।

ভাস্কর : দেখ, ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে এভাবে বেজার হলে কি

সংসারে থাকা যায় সিধু! বেশ ত, ব্যাপারটা কি-ভাবে দাঁড়িয়েছে, আগে সেটা ওর কাছ থেকে জানতে হবে বৈকি! আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি তার কাছে।

* *

*

ভূতনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথের ঘরের মতই বড় সড় ও সুসজ্জিত। একদিকে খাট- টিপয়, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, বইয়ের আলমারি, বিলিতি ছবি সব দেওয়ালে।

ভাস্কর ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ারে বসে আছেন—ভূতনাথ উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পাইচারী করতে করতে বলে যাচ্ছে:

ভূতনাথ: আমি বুঝতে পেরেছি ভাস্করদা, আপনি এ-ব্যাপারটাকে আপনার পার্শন্যাল য়্যাফেয়ার ভেবে বাধা দিতে এসেছেন—

হো হো করে হেসে ভাস্কর বলেন:

ভাস্কর: এ কি বলছ হে! তুমি চাইছ ওখানে বিয়ে করতে, আর সেটা হচ্ছে আমার পার্শন্যাল য়্যাফেয়ার—অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার! (পুনরায় হাস্য)

ভূতনাথ: আমি বলতে চাইছি—ঐ যুগলবাবুর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার ঝগড়া আছে—সেইজন্যেই ওঁর সঙ্গে…

ভাস্কর: (সহাস্যে বাধা দিয়ে) তোমার এ অনুমানও ভুল হে ভূতনাথ। যুগল মোক্তারের সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি না থাকলেও অসদ্ভাব কখনো হয় নি—তাছাড়া, দুনিয়ায় কারুর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে বলে জানা নেই।

ভূতনাথ: তাহলে আপনি কেন এতে আপত্তি করছেন?• বৌমার

অমত নেই, দাদা কিছু বলছেন না, আপনারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন ? কি জন্যে বাধা দিচ্ছেন—বলুন ?

ভাস্কর : দেখ, একটা কথা আছে—'পড়ন্ত বনেদী ঘর থেকে মেয়ে আনবে ; আর—উঠন্ত ঘরের ছেলে।'... নন্দীরা এখন পড়ে এলেও বনেদী বংশ, কিন্তু যুগল মোক্তার নিজে যাই হোন, কৌলিক কোন প্রতিষ্ঠা ওঁর নেই।

ভূতনাথ : আমার মতে পুরোনো পচা বংশের চেয়ে হালফিলে নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে যে লোক,—তার বংশই বড়। আমি স্পষ্ট করেই বলছি ভাস্করদা—বিয়ে যদি করতে হয়, আমি যাকে পছন্দ করেছি—কথা দিয়ে এসেছি, সেখানে ছাড়া আর কোথাও বিয়ে করব না।

ভাস্কর : তুমি যদি সত্যিই কথা দিয়ে এসে থাক, তাহলে আর কথা নেই। বেশ, আমি সেই ব্যবস্থাই করব।

শেষ কথা বলেই ভাস্কর চলে গেলেন। ভূতনাথ দরজার দিকে চেয়ে মুখখানা ফিরিয়ে ইজিচেয়ারখানায় বসে পড়ল—একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে আপন মনে বলল :

ভূতনাথ : ও! উনি যেন ব্যবস্থা করবার মালিক! দাদার • যেমন ...

ভূতনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ ভাস্কর দালানের খানিকটা এসে থমকে দাঁড়ালেন। একবার তাকালেন সিদ্ধিনাথের ঘরের দিকে... সেখানে সিদ্ধি ও অচলা তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন। এই সময় হঠাৎ কৈলাসকে আসতে দেখে তাকে ডাকলেন :

ভাস্কর : কৈলেস—শোন ত!

কৈলাস কাছে এসে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই ভাস্কর বললেন :

ভাস্কর : বড় দাদাবাবুকে বলগে, যাদবপুরে যাওয়া এখন বন্ধ থাক ;

আমি একটু দরকারে বাড়ী যাচ্ছি—কাল সকালে আসছি ; তখন কথা হবে।

কৈলাস : যে আজ্ঞে।

ভাস্কর চলে গেলেন। কৈলাসও একটু সন্দিগ্ধভাবে আস্তে আস্তে সিদ্ধিনাথের ঘরে ঢুকল। এঁরা ভাস্করের প্রতীক্ষা করছিলেন। কৈলাসকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উভয়ে তার দিকে তাকাতেই কৈলাস ভাস্করের মুখের কথাগুলি আবৃত্তির মত করে বলল। শুনে সিদ্ধিনাথ নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অচলা বললেন :

অচলা : ওকথা বলেই দেবতা বাড়ী গেলেন—এখানে এলেন না আর ?

কৈলাস : ঐ যে, কইলেন—কাল সকালে এসে কথা কবেন।

সিদ্ধিনাথ : না আসবার মানে আর কিছু নয়—ভূতোবাবু ওর কথা রাখেন নি, তাই আর লজ্জায় ও আসেনি। এখন আমার কথা শুনে রাখ—ও নিজেই যখন দেখে পছন্দ করেছে, সেখানে আমাদের মেয়ে দেখবার আর কোন দরকার নেই।

* *

*

ভাস্করের বাড়ী। বাড়ীতে ভাস্কর ঢুকতেই উপরতলা থেকে ১২ বছরের পুত্র রবির গান শুনতে পেলেন। তাঁর বিষন্ন মুখখানি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হলো। উপরে চললেন।

উপরের সেই প্রশস্ত দালানে আরতি বেতের একখানি চেয়ারে বসে হাসিমুখে রবির মুখে অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে ছেলেদের কর্ত্তব্যমূলক ছড়া বা গান শুনছেন।

এমন সময় ভাস্করকে আসতে দেখেই রবি সোল্লাসে বলে উঠল :

রবি : জানো বাবা, তোমার কবিতা শুনে হেডমাষ্টার ভারি খুশি হয়েছেন। স্যার বলেছেন—স্কুল বসবার সময় সব ছেলেরা মিলে একসঙ্গে সুর করে গাইবে। তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন।

ভাস্কর : তাই নাকি! তাহলে—শোন, ছেলেদের বলে দিও…শুধু মুখে বললেই হবে না—এগুলি কাজেও করা চাই।

রবি : আমি ত তাই করি বাবা!—মিথ্যা কথা বলি না, কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি না; ভিখিরী দুঃখীদের ঘেন্না করি না! খেলতে যাই মা?

আরতি : হ্যাঁ—এসো।—(রবি চলে গেল)। হ্যাঁগা, এবেলা যাদবপুরে মেয়ে দেখতে যাবার কথা ছিল না?

ভাস্কর : কথা ত ছিল, কিন্তু যাওয়া হলো না; হয়ত—যাবার আর প্রয়োজনই হবে না।

আরতি : কেন গা?

ভাস্কর : ভূতো নিজেই তার বিয়ের কনে দেখে পছন্দ করে এসেছে।

আরতি : অ-মা, একি কাণ্ড! মাথার ওপর তোমরা থাকতে সে নিজেই—

ভাস্কর : কালটা ক্রমশঃ পুরাতন খোলস খুলতে খুলতে এগিয়ে চলেছে কিনা! আজকালকার ছেলেরা পাকা পাকা কথা বলতে খুব শিখেছে।

আরতি : কি আশ্চয্যি! তুমি নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করে এলে! তা, তোমরা কিছু বললে না?

ভাস্কর : বলবার ভারটা নিজেই নিয়েছিলুম তাই রক্ষা! ভূতো যে ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, যদি সিধুকে বলত—আজ

থেকেই দুই ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হোত। তাই ভূতোর ভাবগতিক জানবার জন্যেই আমি নিজে এগিয়ে যাই, যাতে আমার সঙ্গেই বোঝাপড়াটা হয়ে যায়—ভায়ে ভায়ে না মনান্তর হয়।

আরতি : কিন্তু এর পরে? ভূতো হয়ত তোমাকেই কু ভাববে—

ভাস্কর : তা ভাবুক—কিন্তু ওদের দু'ভায়ের মধ্যে সদ্ভাব ত বজায় থাকবে! নিজের জন্যে আমি ভাবি না—ভাবনা ঐ সিধুর জন্যে। সিধু ভাবে—তার ভাইটি এখনো সেই কচি খোকাটি আছে—ইচ্ছামত তাকে চালাবে। কিন্তু সে যে এখন সাবালক হয়ে উঠেছে—শাসন করতে গেলে নাগালের বাইরে চলে যাবে, এটা সে ভাবে না। এখন আমাকেই এ তাল যেমন করেই হোক সামলাতে হবে—

* *

*

সকাল বেলা। ভূতনাথ তার নীচের বৈঠক-ঘরে এসে পায়চারী করতে করতে সিগারেট টানছে—মনে মনে কি একটা চিন্তা করছে।

বাহিরে এই সময় ভাস্কর বাড়ীতে ঢুকে ওপরের সিঁড়িতে উঠছেন। ওদিকে তারকও বাড়ীতে ঢুকে বারান্দায় উঠে ভাস্করকে সেই অবস্থায় দেখে—সভয়ে পিছিয়ে এল; তারপর সন্তর্পণে থামের আড়ালে নিজেকে অদৃশ্য রেখে ভূতনাথের ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে পায়চারী-রত ভূতনাথ তারককে দেখেই সহর্ষে বলল :

ভূতনাথ : এসেছিস—তোর কথাই ভাবছিলুম রে?—বস্—

দু'জনে দু'খানি কেদারায় মুখোমুখী হয়ে বসে গল্প করতে লাগল :

তারক : আরে ভাই - এসেই একবারে সিংহের মুখে পড়েছিলুম!

ভূতনাথ: মানে?

তারক: বারাণ্ডায় পা দিবেই দেখি—ভাস্থরক মশাই ওপরে চলে-ছেন!—ছেলেবেলাকার সেই নিকনেমটা মনে পড়ে গেল—ভাস্কর না ভাস্থরক সিংহ—

ভূতনাথ: কাল বিকেলের কাণ্ড যদি দেখতিস্—হাতাহাতি হতে খালি বাকি ছিল!

তারক। সে কি রে?

ভূতনাথ: যাদবপুরে কে নন্দী আছে—সে-বাড়ীর এক নন্দিনীকে উনি পছন্দ করে এসেছেন! তারপর, কাল বিকেলে দাদা আর বৌমাকে সেখানে মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাবেন শুনেই আমি বেঁকে বসলুম। সব শুনে বৌমা গেলেন দাদাকে বলতে, তারপর উনি এলেন আমাকে বোঝাতে।

তারক: তারপর—তারপর?

ভূতনাথ: মুখের ওপরেই বলে দিলুম—বিয়ে যদি করতেই হয়, যাকে পছন্দ করেছি, সে ছাড়া আর কাউকে করছি নে।

তারক: বা-বা-বা! এই ত মরদের মত কথা রে! আমিও চাই-ছিলুম ভাই—তুই একটু শক্ত হ'স।

গোবর্দ্ধন এই সময় দ্বারপ্রান্ত থেকে বলল:

গোবর্দ্ধন: আসতে পারি নাকি?

ভূতনাথ: আসুন, আসুন—

তারক: আসতে আজ্ঞা হোক—বসুন স্যার, বসুন। আপনার কথাই হচ্ছিল—

ভূতনাথ: ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন।

গোবর্দ্ধন: কি ব্যাপার বলুন ত?

তারক: ব্যাপার হোচ্ছে—ভূতনাথ বাবুর দাদার বন্ধু ভাস্করবাবু যাদবপুরের নন্দীদের বাড়ীতে বিয়ের সম্বন্ধ ওঁর পাকা করে ফেলেছিলেন – উনি কিন্তু তা ভেঙে দিয়েছেন।

ভূতনাথ: এখন স্যারের পক্ষ থেকে কথাটা আপনিই দাদার কাছে তুলুন—এর পর এক দিন স্যারকে এনে—বুঝেছেন? আপনি বসুন, আমি ভিতর থেকে এখনি আসছি।

বলেই ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

•

সিদ্ধিনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর। সিদ্ধিনাথ বলছিলেন:

সিদ্ধিনাথ: কাল যখন তুমি ভূতোর কাছ থেকে আর ফিরে না এসে বাড়ী চলে যাও, তখনই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অচলাকে বলে দিই—ভাস্করের কথা যদি না রাখে, তাহলে এ সম্বন্ধে ভূতোকে আর কোন কথা বলব না; ওর যখন পছন্দ হয়েছে—হোক এ বিয়ে।

ভাস্কর: আমিও অনেক ভেবে দেখলুম সিধু,—দেখ, বিয়ের ব্যাপারে এই পছন্দ নিয়ে বহু অনর্থ হয়ে থাকে। অনেক সংসারেই দেখেছি—বাপের সঙ্গে ছেলের, ভায়ের সঙ্গে ভায়ের আড়া-আড়ি ছাড়াছাড়ি হয়েছে। যাই হোক, এর জন্যে তুমি দুঃখ ক'র না - সম্বন্ধটা আমিই এনেছিলুম, আমিই ভেঙ্গে দেব'খন—তোমাকে এর জন্যে কোন কথা শুনতে হবেনা।

সিদ্ধিনাথ: হ্যাঁ—তোমার কথার ধরণ দেখেই বুঝেছি—ভূতুবাবু এখন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মাতব্বর ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন—এটা আমাদের জানতে, শুনতে ও মানতে হবে।

ভাস্কর : এ তোমার রাগের কথা হলো সিধু! আমি বলছি—ভূতোর বয়সের দিকে চেয়ে, আর নীতিবাক্য মনে করে—নিজেকে সামলে চলাই তোমার উচিত। সব সময় মনে রাখবে—এমন কোন কাজ করা হবে না, যার জন্যে তোমাদের দুই ভায়ের মধ্যে মন-কষাকষি হতে পারে। ভূতোর সম্বন্ধে যা কিছু করবার বা বলবার ভার তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দিও সিধু।

এই সময় অচলা ঘরে প্রবেশ করলেন ও ভাস্করকে দেখে বললেন :

অচলা : এই যে দেবতা এসেছেন! কাল ত আর ফিরে এলেন না, আমরা ভেবে বাঁচিনে।—হ্যাঁ, ভূতো এসে বলছে—দুর্গাপুর থেকে লোক এসেছে—ওবেলা সেখানে গিয়ে মেয়ে দেখবার জন্যে ধরেছে।

সিদ্ধিনাথ : তারপর?

অচলা : আমি বাপু স্পষ্ট বলে দিয়েছি—তোমার যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আমাদের আর দেখা-শোনার কি আছে? ওঁরাই এসে কথাবার্তা পাকা করে আশীর্বাদ সেরে বিয়ের দিন ঠিক করে যান, তারপর আমাদের যা করবার আছে সে সব আমাদের করতেই হবে।—অন্যায় বলেছি দেবতা?

ভাস্কর। বেশ বলেছেন বৌমা। তবে আমার একটা কথা—ভূতোর পছন্দেই বিয়ে হচ্ছে বলে, তোমাদের মনে কোন রকম অভিমান যেন প্রকাশ না পায়। আমার খুব বিশ্বাস যে, বৌমা যদি শক্ত হাতে এ সংসারের খুঁটি ধরে থাকেন—তা হলে ছোট বৌ যে ধাঁজেরই হোন না কেন, তাঁকে আপনার করে নিতে পারবেন।

সিদ্ধিনাথ : শোন ; আমি ভাস্করকে কথা দিয়েছি—ভূতোর মনে কষ্ট হয় বা সে রাগ-অভিমান করবার সুযোগ পায়—সে ধরণের কোন কাজই আমি করব না। সত্য বলছি—ভূতোর এ কাণ্ড আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতুম না ; কিন্তু ভাস্করের কথায় কিছুই আমি গায়ে মাখিনি।

অচলা : আমি জানি, দেবতা এ সংসারটিকে দু'হাত দিয়ে আগলে আছেন, আর থাকবেনও।

ভূতনাথের বিবাহের দিন। বাড়ীর দেউড়ীতে নহবৎ বসেছে—তার মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অন্দরমহলের সেই দালান। সধবা মহিলা ও কুমারীরা শাঁখ বাজাচ্ছে। বরসজ্জায় সজ্জিত ভূতনাথ অচলাকে প্রণাম করে বলছে :

ভূতনাথ : তোমাকে ছেলেবেলা থেকে মা বলেই জেনেছি বৌমা—তাই, তোমাকেই বলছি—তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।

মহিলাদের আনন্দগুঞ্জন মধ্যে একজন বলে উঠলেন : বাঃ! বেশ বলেছে ভূতো।

অচলা : শোন কথা! আচ্ছা—আগে ত আন্—তারপর দেখবি, কার দাসীগিরি সে করে। আশীর্বাদ করি—পছন্দ করে যাকে আনছ—তোমার মনে বরাবর সে স্থান পাক।

শাঁখ সব বেজে উঠল—সেই সঙ্গে হুলুধ্বনি।

* *
*

দুর্গাপুরে যুগল মোক্তারের বাড়ীর উঠানে ছাদনাতলায় আরও

গভীরভাবে ও বহুকণ্ঠে হুলুধ্বনি ও শাঁখের শব্দ উঠেছে। বর কনে উপস্থিত।

জনৈকা প্রৌঢ়া মহিলা: কড়ি দিয়ে কিনলুম, দড়ি দিয়ে বাঁধলুম, হাতে দিলুম মাকু…এবার ভ্যা করত বাপু?

জনৈক তরুণী: উহুঁ— বলুন… কলের বাঁশী বাজাও ত বাপু!

অপর তরুণী: তার চেয়ে বল ভাই—ও বর! তোমার ভূতের দল নিয়ে কারখানার কলের চাকা ঠেলত বাপু।

মহিলাগণ হাসিয়া উঠিলেন। একজন বলিলেন: বেশ বলেছিস্ লো!

ভূতনাথ কিন্তু কথা শুনে ভীষণ রেগে গেছে—মুখখানা ফুলে উঠেছে।

পুরোহিত: এবার শুভদৃষ্টি হোক—শুভদৃষ্টি হোক। ভালো করে চেয়ে দেখ দু'জনে—

শুভদৃষ্টির সময় দুর্গারাণী ভূতনাথের ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখখানা দেখেই শিউরে উঠল—একবার চেয়েই সভয়ে সে চোখ বুজাল এবং ভূতনাথের চোখে ভ্রূকুটি দেখা গেল।

মেয়েরা: বাসরে নিয়ে চল বর কনেকে—বাসরে।

বাইরের ঘরের বরাসন এখন শূন্য—এলোমেলো [illegible]। উভয়পক্ষের জনকয়েক ব্যক্তি ফরাসে ছিলেন। এমন সময় যুগল মোক্তার দু'হাতে সিদ্ধিনাথ ও ভাস্করকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে সেই ঘরে আসতে আসতে বলছিলেন:

যুগল: আসুন—আসুন—এই ফাঁকা আসরে বসে আমরা আলাপ করি। আমার কি আজ সামান্য ভাগ্যি—নর-নারায়ণ যুগলে এসেছেন দীনের আলয়ে! বসুন, বসুন, বসুন। ওরে—তামাক দে, পান আন, বাতাস কর—

বসিতে বসিতে ভাস্কর সহাস্যে বলিলেন :

ভাস্কর : কিন্তু সম্বোধনটা কি রকম হলো বিশ্বাস মশাই—নর-নারায়ণ —হাঃ হাঃ হাঃ

যুগল : য়্যা—হাসলেন ঠাকুর? কিন্তু শুনুন—কথা বেচা ব্যবসা যেখানে, বাজেকথা বলিনে। বলুন ত এঁরা—পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিল কে? সখা শ্রীকৃষ্ণ নয়? তিনিই ত নারায়ণ। আর—তাঁরই মতন বুদ্ধির চক্র ধরে শিবনগরের দাস-বংশের অর্জুন এই সিদ্ধিনাথকে চালাচ্ছেন কে—বলুন ত? আমরা ত খবর সব রাখি ঠাকুর! দাস-ফ্যাক্টরী বলতেই তো ভাস্কর ঠাকুরের কারখানা বুঝি… সেখানে সিদ্ধিনাথ বলুন আর ভূতনাথই বলুন—কেউ কিছু নয়…আসলে সবই হচ্ছেন আপনি… ওরে ব্রাহ্মণের হুঁকো—

বাসর-ঘর। কলকারখানা—কলের বাঁশী—কনেকে দেখেই পছন্দ করা—এই সব নিয়ে একখানি কমিক-গান বেঁধে বাসর-সঙ্গিনীরা ভঙ্গি করে গাইছে। যে মেয়েটি গান বেঁধেছে—জারি-গানের সুরে ও প্রণালীতে প্রথম চরণটি নিজে গাইছে, তার পর আর সব মেয়েরা সমস্বরে সেই চরণ বলছে।…ভূতনাথ ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে গান শুনতে শুনতে। তার মনে হচ্ছে--কারখানার মালিক ব'লে গানে তাকে খেলো করা হয়েছে।

এই অবস্থায় গানটি যখন শেষ হয়ে এসেছে এবং ভূতনাথও অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সেই সময় একটি সাত আট বছরের মেয়ে হঠাৎ

পিছন দিয়ে এসে ত্ব'হাতে ভূতনাথের কান ত্ব'টি ধ'রে মলে দিতে দিতে বলল :

বালিকা : বরের কানটি মলে দিলুম
কনে এমনি করবে জুলুম।

মেয়েটির কথার সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট ভূতনাথ তার গণ্ডে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিল। "মাগো।" বলে মেয়েটি ছিটকে বাসর-সঙ্গিনীদের উপরে গিয়ে পড়ল। তখন একসঙ্গে অনেকগুলি মেয়ে আর্তস্বরে বলে উঠল : মাগো মা! এ কি!

১ম তরুণী : করলে কি বর?

২য়া তরুণী : অমন করে—মারে? অ-মা!

ভূতনাথ : তা বলে কান মলে দেবে? এত বড় আস্পর্দ্ধা!

১মা : সম্পর্কে শালী হয়, তাই কাণে হাত দিয়েছে—

২য়া : এমন দেয়। কথায় বলে—বর না চোর!

৩য়া : এ বর ডাকাত—ওলো, পালাই চল্ ·· চোখ দেখছিস্ না—

১মা : (প্রহৃতা বালিকাকে দেখিয়ে) মাগো! গালে দেখ আঙুলের দাগ বসে গেছে! ওলো দুগ্যা—তোর বরের ঘাড়ে সত্যি-কার ভূত চাপে—সামলে থাকিস—যেন তোরই গলা টিপে না মারে।

মেয়েরা সব উঠে দাঁড়াল—নানা স্বরে বলতে বলতে বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল : খুনে বর—ডাকাত বর—দস্যি বর—

মেয়েদের এইভাবে প্রস্থান কালে দুর্গা ঘোমটা ফাঁক করে তাকাতেই তার ভয়াতুর মুখখানা দেখা গেল। সেই সুন্দর মুখখানি আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ভূতনাথ : তুমিও পালাবে নাকি? বল—উত্তর দাও কথার?

ভূতনাথের বিস্ফারিত ও প্রদীপ্ত চক্ষুর দিকে তাকাতেই সেই দৃষ্টির সংঘাতে দুর্গারাণীর ভয়াতুর মুখখানি মুহূর্তে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো! সেই অবস্থায় ভীত কম্পিতকণ্ঠে সে বলল :

দুর্গারাণী : আমি ত কিছু বলিনি।

* *

*

দাসবাড়ী। অন্দরমহল। দালান। অচলা সালঙ্কারা ও পুষ্প-মাল্যাদিতে সুসজ্জিতা নববধূ দুর্গাকে বলছেন :

অচলা : অনেক রাত হয়েছে—এখন চলো।

দুর্গা : কোথায় যাব?

অচলা : বোকা মেয়ে! জাননা—আজ ফুলশয্যা, কোথায় শুতে হয়?

দুর্গা। (দুই হাতে অচলাকে জড়িয়ে ধরে)…আমি আর কোথাও যাব না বৌমা—আপনার কাছেই শোব!

অচলা : আমার কাছে কি বরাবর শোবে বোকা মেয়ে? লোকে ও কথা শুনলে হাসবে যে! চলো। ভূতো হয়তো রাগ করছে।

দুর্গা : আমার বড্‌ডো ভয় করে বৌমা…ওকে দেখলেই…আমি যাব না বৌমা!

অচলা : চুপ—চুপ—চুপ! ও-কথা ব'লতে নেই। ভূতো তোমাকে নিজে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করেছে; ও কথা কি বলতে আছে? আর, ও রকম ভয় প্রথমে হয়—তার পর সব ঠিক হয়ে যায়।—চলো।—

ফুলশয্যার রাত্রি। ভূতনাথের সুসজ্জিত ঘর। খাটের উপর দুর্গা

একমুখ ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। ভূতনাথ সিগারেট টানছে ও পায়চারী করছে। হঠাৎ থেমে কি ভেবে খাটের কাছে এগিয়ে এসে বলল :

ভূতনাথ : তারপর? সারারাত এইভাবে কলাবউ সেজে বসে থাকবে নাকি? ঘোমটা খোল—

বলেই সে মাথার ঘোমটা টেনে খুলে দিল। দুর্গার মুখখানা ভয়ে ম্লান হয়ে গেল; তার আর্ত দৃষ্টিতে সে ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। একবার ভূতনাথের মুখের পানে তাকিয়ে পরক্ষণে সে মুখ নত করল।

ভূতনাথ : গান গাইতে পার?

দুর্গা : (ঘাড় নেড়ে জানাল যে—পারে না)

ভূতনাথ : লেখাপড়া জানো?

দুর্গা : (ভয়ে ভয়ে জড়িতকণ্ঠে) একটু একটু জানি।

ভূতনাথ : গুণের ঢেঁকি।

বলেই ভূতনাথ খাটের উপর সজোরে জেঁকে বসল—দুর্গা ভয়ে জড়সড় হয়ে তাকাতেই ভূতনাথ বলল :

ভূতনাথ : পাণের ডিপেটা আনো—

দুর্গা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল—ঘরের দেওয়ালের পাশে একটা টিপয়ের উপর ফুলের তোড়া বসানো ফুলদানি ও তার পাশে রূপার ডিপা ছিল। সেখানে গিয়ে ডিপাটি এনে ভূতনাথের হাতে কম্পিত হাতে দিতে যেতেই ডিপাটি পড়ে গেল—সাজা পাণগুলি ছড়িয়ে পড়ল। ভূতনাথ তর্জনের সুরে বলল :

ভূতনাথ : দেখছি তুমি—অকর্মার ধাড়ী!

দুর্গা : বোকনা—তুলছি আমি—

দুর্গা মেঝেয় বসে ছড়ানো পাণগুলি তুলতে থাকে। ভূতনাথ তৎক্ষণাৎ খাট থেকে উঠে সক্রোধে বলে উঠল :

ভূতনাথ : ও পাণ খাবে কে ?

বলতে বলতে দু'পায়ে পাণগুলো মাড়িয়ে দিয়ে বলল :

ভূতনাথ : বৌমার কাছ থেকে নতুন পাণ আনো—নন্‌সেন্স্।

* *

*

সিদ্ধিনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথ, ভাস্কর, অচলা।

অচলা : দেবতা! উনি যে ভয় করেছিলেন, একবারে তার উল্টো হয়েছে। এমন ভালো মেয়ে হয় না! মুখ বুজিয়ে থাকে, এখানে এসে আদর পেয়ে যেন বত্তে গেছে। আজ আমি খাবার সময় ওর কাছে বসে মাছ ভেঙে কাঁটা বেছে দিতে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে ; বললে—বৌমা গো, এমন করে কেউ কখনো আমাকে ভালবাসেনি—কত ভাগ্যি আর পুণ্যির জোরে আপনার কাছে এসেছি।

সিদ্ধিনাথ : তাই নাকি! আ—ভগবান! আমার ভারি ভয় ছিল।

ভাস্কর : একটি কথা জেনে রেখ সিধু • বাপ-মা হারিয়ে যে সব ছেলে মেয়ে মামার বাড়ী মানুষ হয়, তাদের প্রকৃতি বেশীর ভাগই স্নেহপ্রবণ হয়ে থাকে ; আর বরাবর তারা মাতৃস্নেহে বঞ্চিত বলে, মায়ের স্নেহ দিয়ে সহজে তাদের বাধ্য করা যায়।

অচলা : হ্যাঁ, আর একটা কথা বলি—ভূতো ওকে নিজের পছন্দে বে করে এনে ভেবেছে—চোখ রাঙিয়ে বকে ঝকে বৌকে টিট করে রাখবে। সর্বক্ষণই যেন বৌএর খুঁৎ ধরে বেড়াচ্ছেন।

ভাস্কর : তাই নাকি ?

অচলা : কি বলব দেবতা—বৌ যেন ভূতোর নামেই ভয়ে কাঁটা! ভূতো ভাবে-এ বুঝি একটা মস্ত আধিখ্যেতা! বলে কয়েও ওকে পেরে উঠিনে। খিঁচিয়ে ছাড়া বৌ-এর সঙ্গে কথাই বলে না। কি অন্যায় বলুন ত! আপনি এর একটা বিহিত করুন দেবতা।

ভাস্কর : আচ্ছা– আমি এর একটা বিহিত করে দিচ্ছি বৌমা...এখন থেকে ভূতোর হাত খরচের সব টাকাই ছোট বৌমার হাতে দেবেন। ভূতোর যখন যা দরকার হবে, ওঁর কাছ থেকেই চেয়ে নেবে। আর আপনি ছোট বৌমাকে চুপি চুপি বলে দেবেন—টাকা-পয়সার ব্যাপারে উনি যেন একটু শক্ত হন। তা হলেই ভূতনাথ ঢিট হয়ে যাবে।

অচলা : ঠিক বলেছেন দেবতা।

ভূতনাথের ঘর। ঘরের কোনে একটি ছোট সুদৃশ্য আয়রণ সেফ। অচলা তার মধ্যে নোট, টাকা, রেজগী সাজিয়ে রাখছেন—দুর্গা অবাক হয়ে দেখছে, চোখে পলক পড়ছে না।

দুর্গা : এত নোট! এত টাকা! এত ভাঙানি। আমি যে এক সঙ্গে এত টাকা চোখেও কখনও দেখিনি বৌমা। এসব আমার কাছে রাখছেন !!

অচলা : হ্যাঁ—এ সব তোমার জিম্মায় থাকবে—তুমি আগলে রাখবে, ভাববে—তোমার নিজের টাকা। ভূতো অবিশ্যি চাইলে দিতে হবে; তবে দেবার বেলায় শক্ত হওয়া চাই—বুঝলে? চাইলে একশো, দেবে পঞ্চাশ। আমি যা পারিনি, তুমি

যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে পার—তোমার কথা শুনে ও খরচ কমায়—তাহলে বুঝব, কালে তুমি পাকা গিন্নী হবে!

দুর্গার মুখ অন্ধকার হয়। অচলা সেফ বন্ধ করে চাবি দুর্গার আঁচলে বেঁধে দেন।

* *

*

দুর্গাপুর। যুগল মোক্তারের বাড়ীর অন্দরমহল। যুগল মোক্তার ছাপোষা মানুষ। একতলা পুরাতন বাড়ী। উঠানের উপর খোলার রক বা দালান। অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা তাঁর। স্ত্রী জলদা এবং দুর্গার চেয়ে কিছু বড় বিধবা কন্যা লক্ষ্মীকে এই সময় প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে শ্বশুরবাড়ী থেকে সদ্য-প্রত্যাগতা সালঙ্কারা দামী জামাকাপড়ে সুসজ্জিতা দুর্গাকে নিয়ে আলোচনা চলেছে। উঠানে এক পাল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। সেদিন শনিবার—সময়টা অপরাহ্ন। খানিক আগে ভূতনাথ নববধূর সঙ্গে জোড়ে এসেছে। জলযোগাদির পর বাহিরের ঘরে যুগল মোক্তারও ভূতনাথের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভিতরে-বাহিরে একই সময় চলেছে এই আলোচনা।

জনৈক প্রৌঢ়া প্রঃ বেঃ : একেই কয় বাপু—ভাগ্যধরী। হাতে দুগাছা বালা, কানে দু'টো ফুল, আর গলায় একছড়া হেলে হার দিয়ে বিয়ের পর মেয়ে বিদেয় করেছিলে তোমরা; সেই মেয়ে ফিরে এসেছে দেখ—অষ্ট অলঙ্কার পরে। এ ধাঁজের দামী ঢাকাই শাড়ী—পরা ত মস্ত কথা—চোখেও দেখিনি।

২য়া প্রতিবেশিনী : তারপর, তোরঙ্গর মধ্যে জামা-কাপড় হরেকরকমের কত! হ্যাঁ, তাও বলি বাপু—যেমন বড় লোক, তেমনি বড় নজর ওনাদের।

জলদা : তোর বড় জা-কে কেমন দেখলিরে দুগ্যা—সে কি দিলে ?

দুর্গা : আমার জা তো নয়—ঠিক যেন মা! নিজের মা'কে কখনো দেখিনি, মা'র যত্ন পাইনি, কিন্তু ওঁর আদর যত্ন দেখে মনে হলো মামীমা, নিজের মাও ওরকম করে আমাকে আগলে বেড়াতেন না। গয়না পত্তর, জামা কাপড়—যা কিছু সবই ত আমার জায়ের দেওয়া। শাশুড়ীর গায়ের ভারি ভারি গয়নাগুলো সব আমাকে পরিয়ে দিলেন। ঘরের সিন্দুক নোটে টাকায় ভর্তি—নিজের হাতে রেখে তার চাবি—এই দেখুন আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন। আমি কেবলই ভাবি—যে কপাল! এত সুখ সইলে হয় ?

যুগল মোক্তারের তরুণী বিধবা কন্যা লক্ষ্মী অবাক হইয়া দুর্গার কথা শুনিতেছিল। * এই সময় সে সুধাল :

লক্ষ্মী : আসল সুখের কথা আগে বল্—বরটি কেমন হয়েছে! বাব্বা! বিয়ের রাতে বাসর ঘরে যে কাণ্ড করেছিল ? গায়ে হাত, টাত তোলে না ত ? বর ভালবাসে ?

লক্ষ্মীর কথায় দুর্গার মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে—নীরবে মুখ হেঁট করে।

১মা প্রতিবেশিনী : বর ভাল না বাসলে এত ঐশ্বর্য্যি হয় কখনো ?

২য়া প্রতিবেশিনী : লক্ষ্মীর যেমন কথা—বরের ভালবাসা না পেলে দুগ্যা অত করে শ্বশুর বাড়ীর গুণ গায় ? তারপর বর যখন নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে !

জলদা : যার যেমন ভাগ্যি ! জন্মেই দুগ্যা বাপকে খেলে, জ্ঞান হবার আগেই মা গেলো ; নিজের সন্তানের মত করে আমরা পেলে এনু ! তারপর—নিজের পেটের মেয়েদের বর খুঁজতে দেশ বিদেশে বাকি রাখিনি—ঘর থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা

ঢেলেও কিরকম সব ঘরে মেয়ে দিয়েছি, সবই ত তোমরা জানো! এই স্থাখনা—বিয়ের বছরেই কপাল পুড়িয়ে লক্ষ্মী এসে ঘাড়ে পড়েছে। আর—এই দুগ্যার বরাতও দেখছ ত! গাড়ী কিনতে এসে দেখে পছন্দ করে যেন কুটো বেঁধে রেখে গেল! এখন তার এই সুখ সৌভাগ্যি! বরাত দিদি—বরাত!

যুগল মোক্তারের বাহিরের ঘর। জলযোগের পর ভাগিনেয়ী-জামাতা ভুতনাথকে সাদরে এই ঘরে এনে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বরে ও ভঙ্গিতে আলাপ করছেন। যে ভুতনাথ পত্নী দুর্গাকে তার কাছে ত্রস্তা বিহ্বলা দেখে মনে মনে গর্ববোধ করে—এখানে সেই ভুতনাথ বর্ষীয়ান কূটবুদ্ধি মিষ্টভাষী মানুষটির বাক্‌জালে যেন জড়িয়ে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

যুগল: তুমি আসছ জেনে বাবাজী—আমিও আজ আর কাল বিকেলের দিকে দুটো বেলা একদম ছুটি নিয়েছি। মক্কেলদের বলে দিয়েছি—শনি রবি দুটো দিন বিকেলবেলায় আমি হব ডুমুরের ফুল—মাথা কুটলেও দেখা পাবে না। হ্যাঁ—এখন আমাদের কাজের কথা হোক—

ভুতনাথ: আপনার কথাগুলি আমার ভারি মিষ্টি লাগে মামাবাবু!

যুগল: আর তোমাকেও দেখলেই বাবাজী—তোমার বাবার মুখখানি অমনি ঝাঁ করে আমার মনে পড়ে যায়! তিনি বলতেন কিনা—বিশ্বাস ভায়া, তোমার মুখের কথা ঠিক যেন পাকা আমলকি! প্রথমটা কষা লাগে, তার পরেই সারা মুখখানা মিষ্টিতে ভরে যায়। তোমার দাদা সিধুবাবুও কতকটা বুঝেছেন, আর ওদিন তাঁর সখা ভাস্কর ঠাকুরের সঙ্গেও মুখ সোঁকাসুঁকি হয়ে গেছে—বুঝলে বাবাজী?

ভুতনাথ : বাবার সঙ্গে যে আপনার খুব জানা শোনা ছিল, ওঁরা সেটা জানতেনই না—আমার মুখেই শোনেন।

যুগল : তার কারণ কি জানো বাবাজী, ভাস্কর ঠাকুর চান না তোমাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়—কিন্তু ভবিতব্যের ব্যবস্থাকে কেউ ত রদ করতে পারে না বাবাজী! দেখ—এই বাড়ী আর আলিপুরের কাছারী ছাড়া কোথাও বড় একটা আমি মাথা গলাইনে—তাহলেও এ-তল্লাটের বিশ পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে যারাই মাথা তোলা গোছের মানুষ—তাঁদের সবারই কুলুচি আর নাড়ি নক্ষত্রের সব খবর আমি দেখতে পাই আমার এই—নখ-দর্পণে। ওপরে বাতাস এসে আমার কাণে কাণে সব শুনিয়ে দিয়ে যায় বাবাজী!

ভূতনাথ এই বর্ষীয়ান বিজ্ঞ মানুষটির মুখের কথা ও বলার ভঙ্গিতে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বক্রচোখে ভূতনাথের মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে যুগল মোক্তর সোৎসাহে বলে ওঠেন :

যুগল : তুমি হয়তো ভাবছ—মামা শ্বশুরের বয়স হয়েছে, তাই বাজে বকছেন! কিন্তু তা নয় বাবাজী! এ হোচ্ছে—মনের ক্রিয়া। আশীর্বাদের দিন একটিবার আমি তোমাদের শিবনগরের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, সে তো জানো? তিন ঘণ্টার বেশী থাকিনি; তারি মধ্যে ঘর-বাড়ী থেকে সুরু করে কল-কারখানা, কারবার, কারিগর, লোকজন—সব দেখে এসেছি। আমাকে জিজ্ঞেস কর—বলে দেব, কোন ঘরে কটা জানালা, কোন দিকে দোর, কোনখানে কার আফিস্—আর লোকজন সব কে কোন্ প্রকৃতির। মিল দেখলে ভাববে—জ্যোতিষ জানি। আচ্ছা বাবাজী—

তোমাদের কারবার থেকে বছর সালিয়ানা এখন মুনফা হয় কত ?

ভূতনাথ : মু-ন-ফা ? আজ্ঞে, সে তো আমি ঠিক জানি না মামাবাবু !

যুগল : সে কি হে বাবাজী ! অ্যাঁ ! কারবারের আধা অংশীদার তুমি, সাবালকও হয়েছ অনেক দিন, অথচ তুমি কিনা তার লাভ-লোকসানের খবরই রাখ না !—অ্যাঁ ?

ভূতনাথ : আজ্ঞে, কারবার যে এখন খুব লাভে দাঁড়িয়েছে—সেকথা সবাই জানে। তবে সেটা কত—তাতো জানি না, আর—জানবার জন্যে ইচ্ছাও হয়নি—

যুগল : এবং কারবার যাঁদের হাতে, তাঁরা তোমাকে জানানো দরকারও মনে করেননি—তুমি যেখানে বাবাজী অর্দ্ধেক বখরাদার ? বা-বা-বা !

যুগল মোক্তারের মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সব কথা শুনে ভূতনাথ নিজেকে বিপন্ন মনে করে। তার দাদার প্রতি ইনি এভাবে সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত করায় যেমন মনে সে ব্যথা পায়—তেমনি এই লোকটির মুখরোচক কথাগুলি বলবার কৌশল সেই ব্যথার উপর কেমন একটা কৌতূহলের সঞ্চারও করে। তথাপি সে স্বাভাবিক ভাবেই ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলল :

ভূতনাথ : দেখুন—দাস-ফ্যাক্টরী বলতেই লোকে ভাস্করদা'কে বোঝে ; উনিই ম্যানেজার কিনা ! বাবা মারা যাবার পর দশ-বারো বছর ধরে উনিই কারবার চালিয়ে আসছেন। দাদাও সব ভার ওঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

যুগল : এইতো বাবাজী—চোখ দুটোকে বুজিয়ে রেখে কান দুটোকেই করেছ দেখার যন্তর ! আমি যা বলছি—এখন

মিলিয়ে নাও বাবাজী····কারখানার মণ্ডড়ায় ঘেরা-ঘোরা নিরিবিলি একখানা ঘরে তোমার বাপের আসনটি একাই দখল করে বসেন তোমার দাদা সিদ্ধিনাথ. পাশের আসনটি দিয়েছেন তাঁর সখা ভাস্কর ঠাকুরকে—রাজ আর মন্ত্রী—ওঁরাই সব। আর—সাক্ষীগোপালের মত—এক টেরে সাজানো গোজানো একখানি ঘর দিয়ে তোমায় রেখেছেন ভুলিয়ে···বসে বসে সেখানে ভূতের বেগার খাট তুমি। কেমন? ঠিক বলেছি কিনা?

ভূতনাথ : আজ্ঞে......

যুগল : দেখ বাবাজী—আমার এত মাথা ব্যথা শুধু নিজের স্বার্থের খাতিরে। তার মানে—সেই স্বার্থ রয়েছে আমার ঐ বড় আদরের, বড় যত্নের, বড় আশা-আকাঙ্খার জিনিষ—পিতৃমাতৃহারা ঐ ভাগনীটার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে। আমি কি চাই জান বাবাজী—তোমার হাতে যাকে দিয়েছি—সে যাতে রাজরাণী হয়, তার স্বামী সব থাকতে সর্বহারা না হয়ে তার বাপের আসনখানিও পায়।

ভূতনাথ : আপনি এসব কি বলছেন মামাবাবু? আমি যে—

যুগল : বুঝতে পেরেছি বাবাজী—কথাগুলো শুনে চমক লেগেছে মনে—প্রথমটা এমন হয়। এখন শোন—এই ঝুনো মাথার যুক্তি দিয়ে আমি তোমাকে ব্যবসাবাণিজ্যে ওস্তাদ করে তুলতে চাই। আর কিছু নয়—শুধু কথাগুলো কাণ দিয়ে শুনবে, আর সেই মত চলবে।—কিন্তু কাউকে জানতে দেবে না যে, আমার কাছে পরামর্শ পাচ্ছ। হপ্তায় ছুটির দিনটে তাও পুরো নয়—ঘণ্টাখানেকের জন্যে—বেড়াবার ছলে

এখানে আসবে—সব বলবে, আর শুনবে—কেউ জানবে না—বাস্। মাসখানেকের মধ্যেই দেখবে—তোমার দিকে সবার নজর পড়ে গেছে।

* *

*

দাস-ফ্যাক্টরীর আফিস-ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। সিদ্ধিনাথকে কিছুটা বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে। ভাস্কর সেটা লক্ষ্য করে বলছেন:

ভাস্কর: ভূতোকে তুমি বললে না কেন সিধু—কারখানার কাজগুলোর 'নেচার' বুঝবে বলেই গোড়ায় ওকে ঐ কাজ দেওয়া হয়েছিল। বেশ ত, ও যদি এখন থেকে আমাদের কাজে সাহায্য করতে চায়, করুক না—তাতে কি হয়েছে?

সিদ্ধিনাথ: আমার কেবলই মনে হোচ্ছে—হঠাৎ ওর মাথা থেকে—

ভাস্কর: আরে এ হোচ্ছে স্থান মাহাত্ম্য আর বংশের ধারা! পাঁচ পুরুষে কারবারী তোমরা। তারপর কারখানায় এসে আফিস করছে; মাথা তো খুলবেই হে!

সিদ্ধিনাথ: উঁহু—সে কথা আলাদা। নিজে থেকে ভূতো সত্যিই যদি কিছু করতে চায়, সে তো আনন্দের কথা; কিন্তু কারুর কথা শুনে যদি নেচে ওঠে—

ভাস্কর: আরে—না-না-না—ও সব কিছু ভেব না—

সিদ্ধিনাথ: ভূতোকে চিনতে তো আমার বাকী নেই...কিন্তু যে ভাবে কথাটা বললে...তার সুরটা মোটেই ভাল লাগল না...তার কথার ধাঁজে বোঝা গেল—এমন কাজ উনি করতে চান যাতে

দায়িত্ব আছে…অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ওঁরও সহীসাবুদ থাকবে।

ভাস্কর : ভালোই ত—

সিদ্ধি : এর পর হয় ত আব্দার করবে—চেকেও ওর সই থাকা চাই।

ভাস্কর : হাঃ হাঃ, যদি সে হিম্মত রাখে সহী করবে—তাতে কি হয়েছে? তুমি এ নিয়ে সুস্থ মনকে চঞ্চল কর না সিধু!

সিদ্ধি : বেশ। তাহলে আজকের এই টেণ্ডারগুলো—

ভাস্কর : হ্যাঁ, ভূতোর ঘরে পাঠিয়ে দাও, ও দেখুক, বলবার কিছু থাকে বলুক, এখন থেকে প্রত্যেক টেণ্ডারে ভূতোও সই করবে।

দাস-ফ্যাক্টরী। ভূতনাথের ঘর। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের উপর ঝুঁকে ভূতনাথ একটা ফাইলে রাখা কতকগুলো কাগজ দেখছে। তারক এসে পিছন থেকে বলল :

তারক : এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখা হচ্ছে?

ভূতনাথ : এসেছিস্? তোর কথাই ভাবছিলুম ব'স্।

তারক সামনের চেয়ারে বসে ফাইল দেখে সবিস্ময়ে বলল :

তারক : আরে…তোর টেবিলে কনফিডেনসিয়্যাল ফাইল দেখছি যে! ব্যাপার কি? প্রমোশ্যান পেলি নাকি?

ভূতনাথ : তাই বটে! ফাইলটার সঙ্গে এই চিরকুটখানা লিখে দাদা জানাচ্ছেন—"এখন থেকে যে-সব টেণ্ডার আসবে বা যাবে…মঞ্জুর অথবা বাতিল যাই হোক না কেন, প্রত্যেকটাতে তুমিও সাইন (sign) করবে।"

তারক : হীপ্, হীপ্, হুর্রে! মাইরি…য্যাদ্দিন পরে নিজেকে

রিকগনাইজ (recognize) করবার মত পাওয়ার একটা পেলি ! কিন্তু হঠাৎ যে তোর দাদার এ সুমতি হলো ?

ভূতনাথ : দাদাকে বলেছিলুম যে—ওসব একঘেয়ে কাজ আমার ভালো লাগে না ···তোমাদের হাতের কাজও আমাকে কিছু কিছু ছেড়ে দিয়ে দেখ না পারি কি না—যাতে মাথা খেলাতে হয়···আমারো সহী-সাবুদ থাকে। দাদা তো আর বোকা নয়—কথা পাড়তেই বুঝে নিয়েছে।

তারক : ভাসুরক দাদা বাধা দেয় নি যে বড় ?

ভূতনাথ : সেই বিয়ের ব্যাপার থেকেই ভাস্করদা আমাকে চিনেছে !

তারক : তাহ'লে ভাই, এখান থেকে দুর্গাপুরের স্থারকে সেলাম দে !

এই সময় ফাইলের একখানা কাগজ দেখে অস্বাভাবিকভাবে ভূতনাথ চেঁচিয়ে উঠায় তারকের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

ভূতনাথ : আরে—একি করেছে ?

তারক : কি—

ভূতনাথ : ওদের কাণ্ড দেখ—ইণ্ডিয়ান ডেল্‌টা মিলের এতবড় অর্ডারটা কিনা ছেড়ে দিচ্ছে ! তিন হাজার টনের অর্ডার··· মিল দিতে চাইছে টনে তিনশো পঞ্চাশ ; এঁরা চাইছেন—একান্ন টাকা দশ আনা। এই সামান্য এক টাকা দশ আনার জন্তে এত টাকার মোটা অর্ডারটা হাত ছাড়া হবে ! উহুঁ— আমি এতে সই করব না—

আফিস ঘরে ভাস্কর ও সিদ্ধিনাথ স্ব-স্ব চেয়ারে উপবিষ্ট। ভাস্কর ফাইলের কাগজখানা পড়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

সিদ্ধিনাথ : তুমি হাসছ ! আমার তো সর্বাঙ্গ রাগে জলে যাচ্ছে !

ভাস্কর : তোমারো উচিত ছিল সিধু—ভূতোর এ ব্যাপারে না চটে উঠে তারিফ করা। আমাদের গোড়ে গোড় না দিয়ে একটা পয়েন্ট ধরে ও যে আপত্তি তুলতে সাহস করেছে—(ভূতনাথ ঘরে প্রবেশ করল) এই যে ভূতনাথ, এস, এস—

ভূতনাথ : আমাকে ডেকেছেন ?

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ। ডেল্‌টা মিলের এই টেণ্ডারে সই কর নি যে ?

ভূতনাথ : আমি তো লিখে দিয়েছি—

সিদ্ধিনাথ : যা তা একটা লিখলেই হলো ? মোটা টাকাটাই দেখলে—ডিফারেন্সটা খতালে না...

ভাস্কর : শোন, শোন, আমি তোমাকে সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি—ওরা ৩৫০ টাকা দর দিচ্ছে প্রতি টনে, আর আমরা টন প্রতি এক টাকা দশ আনা বেশী চেয়েছি। এটা শুনতে ছোট, কিন্তু তিন হাজার টনে ১॥৵০ থেকে আসবে কত জান ?—চার হাজার আটশো পঁচাত্তর ...প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

ভূতনাথ : তা যেন বুঝলুম ; কিন্তু ওরা ত স্পষ্ট জানিয়েছে—ওর বেশী দেবে না। আমরা অর্ডারটা ছেড়ে দিলে ওরা অপর ফারমে দেবে ; হাতে পেয়ে এত বড় অর্ডারটা ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে ?

ভাস্কর : আমাদের ফারমেরও তো একটা প্রেষ্টিজ আছে! যে-দর একবার হিসেব করে দিয়েছি, সেটা কমিয়ে ওদের দর যদি মেনে নিই—লোকসান হয়ত হবে না, কিন্তু প্রেষ্টিজ নষ্ট হবে। এর পর—প্রত্যেক বারই টেণ্ডারে এইভাবে ভাঙচুর করবে। সেই জন্যেই আমরা রেট কমাব না ; আর তুমি শেষ পর্য্যন্ত দেখে নিও—আমাদের রেট মেনে নিয়ে অর্ডার

ওরা পাঠাবেই।…যাই হোক, তুমি যেভাবে আপত্তি তুলেছ, এতে আমরা খুসিই হয়েছি। এ থেকেই অভিজ্ঞতা আসে।

* *

*

দুর্গাপুর। যুগল মোক্তারের খাস কামরা। খেরো দিয়ে বাঁধানো বইএর মতন একখানি খাতায় তিনি নিবিষ্টমনে কি লিখছেন—এমন সময় ভিতর দিকের ভেজানো দরজা ঠেলে খুলে তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। চমকে উঠে যুগল মোক্তার বললেন:

যুগল: কে?

জলদা: আমি গো আমি। ঘরের দোর জানালা সব বন্ধ করে ভূতের মতন বসে কি হোচ্ছে শুনি?

যুগল: ভূতের বেগার খাটছি।

জলদা: তা মিছে বল নি—তোমার কাজ কর্ম আজকাল এমনিই হয়েছে! ঘাড়ে পড়া যে ভাগনী ছিল বুকের কাঁটার মতন হ'য়ে—দেখলেই জলে যেতে; তারেই এমন ঘরে দিলে যার জন্যে নিজের মেয়েরাই এখন ছ্যার্ ছ্যার্ করে কত কথাই শুনিয়ে দেয়!

যুগল: কি বলে?

জলদা: বলে—আমাদের ক'বোনকে তো হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন! আর—ভাগনীর বেলায় কত যোগাড় যন্তর করে রাজপুত্তুরের মতন বরকে বাড়ীতে এনে ফুস্ মন্তরের জোরে দুহাত মিলিয়ে দিলেন! ভাগনীকে করলেন রাজরাণী। আর, আমরা কি হালে আছি, সে কি চোখে দেখছেন না?

যুগল : (মুখখানার বিচিত্র ভঙ্গি করে) হুঁ!

জলদা : শ্বশুরবাড়ী থেকে দুর্গা এবার আসতে—তার সুখসৌভাগ্যি দেখে মনের জ্বালায় লক্ষ্মী তো ফেটে পড়বার জো! মেঝের ওপর ঢিপ ঢিপ করে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বললে—এমন ঘরে আমাকে দিলেন যে, বছর ফিরতে না ফিরতে কপাল পুড়ে গেল! তাও সহেছিলুম; কিন্তু হা-ঘরে দুর্গার স্বামী-সুখ ঐশ্বর্য্য দেখে......

যুগল : হুঁ! সবই বুঝছি।...আর...চুপ করেও নেই, বুঝলে? লক্ষ্মীকে বলতে পার তুমি—তার স্বামীকে অবশ্য ফেরাতে পারব না; কিন্তু দুর্গার ধনৈশ্বর্য্যের অংশ যাতে ওরাও পায়—

জলদা : পোড়া কপাল আর কি! ঐ আশা নিয়েই বাতাসে গেরো দিচ্ছ বুঝি? ভাগনীকে তো চেন নি—সে দুর্গা আর নেই! তোরঙ্গ ভর্তি দামী দামী কাপড় জামা সব খুলে খুলে দেখানো হলো....মেয়েগুলো দেখে, আমার মুখ পানে চায়! কিন্তু ওর মনে এ ইচ্ছাই হলোনা যে মামাতো বোনেদের হাত তুলে এক আধখানা দেয়! ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—

যুগল : বটে!

জলদা : জাঁক করে বলা হলো—ওর ঘরে লোহার সিন্দুকে গোছা গোছা নোট টাকা গুণে গুণে সাজিয়ে দিয়েছে ওর জা; তার চাবিটাই আঁচলে বেঁধে এনেছে—তুলে দেখালে! কিন্তু একটা টাকা এনেছিল সঙ্গে করে? ঐ ভাগনীর ঐশ্বর্য্যের ভাগ পাবে এরা—কি করে মুখ নেড়ে বললে এ-কথা?

যুগল : এই খাতায় লিখে রাখছি গিন্নী, পরে মিলিয়ে নিও। দুর্গাকেই হাতের পাঁচ করে এমন প্যাঁচ কসব—তার

শ্বশুরবাড়ীর ধনসম্পদ হুড় হুড় করে গড়িয়ে আসবে যুগল মোক্তারের ঘরে—বুঝলে ?

যুগল মোক্তারের বাহিরের অফিস ঘর। যুগল মোক্তার ও গোবর্দ্ধন। মোক্তারের নির্দেশ মত গোবর্দ্ধন একখানা একসারসাইজ খাতায় লিখছিল, এই সময় লেখা শেষ হতে সোজা হয়ে বসে বলল :

গোবর্দ্ধন : আপনি যেমন-যেমন বলেছেন স্যার, আমি তাই লিখে গেছি—আমাকে কিভাবে কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, প্লানটা খুব জবর হয়েছে স্যার!

যুগল : তুমি তো জানো হে—এই প্ল্যানের দৌলতেই মক্কেলদের প্ল্যানটেন দেখিয়ে কাজ বাজিয়ে চলেছি; তোমাকেও সাকরেদ করে নিয়েছি।

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! ম্যাট্রিক ফেল করে কোথাও কাজ পাইনি; দূরের একটা সম্পর্ক ধরে আপনার কাছে আসতেই আমাকে তালিম দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে কাজের লায়েক করে নিয়েছেন।

যুগল : হ্যাঁ হে—তোমার এলেম দেখে আমি খুসি হয়েছি, দুটো বছরেই তুমি ইশারা বুঝে কাজ বাগাতে শিখেছ। এ বড় সাধারণ কথা নয়। এর পর দেখবে—তোমার ঘর বাড়ী জমি জেরাৎ ধনদৌলত মানসম্ভ্রম কিছুরই অভাব হবে না ·· বড় ঘর দেখে বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে দেব দেখো। তবে কিনা— মূল খুঁটি ধরে শক্ত হয়ে থাকা চাই—কথা বুঝেছ ?

গোবর্দ্ধন : আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—ভালো করেই বুঝেছি···বেইমান আমি কখনো হব না স্যার ···আপনাকে ধরেই বরাবর....

যুগল : এখন যে কাজে তোমাকে লাগাচ্ছি গোবর্দ্ধন—এটাই হোচে তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষা · এতে যদি পাস করতে পারো·· তাহলে তুমিও কিভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠবে—এখন বলব না মাথা গুলিয়ে যাবে তোমার···দেখতেই পাবে সময় হোলে। আগে এখন পরীক্ষাটা—

গোবর্দ্ধন : বুঝেছি স্যার···আপনার হুকুম হোচ্ছে—তাক বুঝে আপনার ভাগনী জামাই ভূতনাথবাবুর মাথায় ঐ ফন্দীটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। · তবে একটা কথা স্যার · একবার যদি ঐ ফন্দীর ফাঁদে উনি পড়েন, আর কিন্তু তাঁরে ······

যুগল : আহা হা....তুমি যে এখানে খেই হারিয়ে ফেলছ হে! তাঁরে ফেরানো, কিম্বা সেখান থেকে অন্য দিকে চালানোর কথা হবে পরে। এখন যা বলেছি, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখ। আর শোন—আদালতে গিয়েই তাড়াতাড়ি গোড়ার কাজ-গুলো সেরে—ঝাঁ করে বাসে চড়ে শিবনগরে কিছু একটা উপলক্ষ নিয়ে যাবে ··আরে, তুমিতো চেতলা ক্লাবের একজন ভালো অভিনেতা, আর এটাও তো অভিনয় হে!

* *

*

দাস-ফ্যাক্টরী। ভূতনাথের ঘর। টিফিন হয়ে গেছে। ভূতনাথ, তারক ও গোবর্দ্ধন সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছে।

ভূতনাথ : আপনাকে আমার ভারি ভালো লাগে গোবর্দ্ধনবাবু! এখন আমার রিকোয়েষ্ট (request) যে দিনই আসবেন—টিফিনের মুখেই আসা চাই।

গোবর্দ্ধন : বা! এসেই আপনার টিফিনে ভাগ বসাই!

ভূতনাথ : ভাগ বসিয়ে আমাকে কি অসুবিধায় ফেলেছেন—বলুন ? বৌমা জানেন—বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে খেতে আমি ভালবাসি।

তারক : ছেলেবেলা থেকেই এটা ওর অভ্যাস গোবর্দ্ধনবাবু!

ভূতনাথ : বৌমাও তাই টিফিনের খাবার অনেক বেশী করেই পাঠান—বুঝেছেন ?

গোবর্দ্ধন : বেশ, তাহলে অসঙ্কোচেই আসা যাবে। কিন্তু, আপনি যে খেতে খেতে বলছিলেন···রাতে ঘুমুতে পারেন না, কাজে মন বসে না, মাথার ভেতর চক্কর দেয়····এসব তো ভালো কথা নয়—কেন এ রকম হয় বলুন তো ?

ভূতনাথ : ও সব আপনি বুঝবেন না···আপনারা হোচ্ছেন ব্রোকার, নানা জায়গায় নানান লোকের সঙ্গে মেশেন·· বেশ আছেন। কিন্তু আমার অবস্থা কি বলুন তো ? দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত····কোন কোন দিন আবার সন্ধ্যা হয়ে যায়—এই ঘরের ভেতর একলাটি বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজি। রাতে বিছানায় শুয়েও মনে হয়—যেন মাথার মধ্যে মেশিন চলছে। তাই ভাবি—শেষ পর্য্যন্ত জীবনটাই কি মেশিন হয়ে যাবে !

তারক : আজকাল ওঁর মনে ঐ একটা মহা ভাবনা হোয়েছে—আমি তো বুঝিয়ে পারিনে ; বলুন তো কি করা যায় [illegible] গোবর্দ্ধন বাবু ?

গোবর্দ্ধন : দেখুন, এক একজন লোকের মাথার শিরাগুলো ঠিক্ যেন সেতারার তার····তাতে জোরে একটু ঘা পড়লেই বেজে উঠে। এই আমার কথাই বলি—বহু ধান্দায় ঘোরাঘুরির মাঝখানে নতুন কিছু হাল্কা ব্যাপারে মাথাটা গলিয়ে একটু আমোদ করে চাঙ্গা হই।

তারক : ও-র কম আমোদ পেতে হোলে মাঝে মাঝে রেসে যেতে হয়। কিন্তু ছোট বাবুর ইচ্ছা থাকলে কি হবে, যে শক্ত গার্জ্জেন!

গোবৰ্দ্ধন : না না না না—আমি কখনই ওঁকে ও মতলব দেব না—ও হোচ্ছে সর্বনেশে ব্যাপার! যতখানি একসাইটমেণ্ট, তার দশগুণ বেশী আফটার অল—ডিসাপয়েণ্টমেণ্ট! ও নয়, আমি যে ব্যাপারের কথা বলছি, আমি যাতে আছি, তাতে আনন্দটাই বেশী, নিরানন্দ তো নেই-ই, আর গার্জ্জেনদের দিক দিয়েও নিরাপদ।

ভূতনাথ : বলেন কি গোবৰ্দ্ধনবাবু! তাহলে তো আপনাকে ঐ ব্যাপারটার কথা বলতে হোচ্ছে।

গোবৰ্দ্ধন : সেটা হোচ্ছে—সেয়ার মার্কেটে মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসা। সেয়ারের ব্যাপারে সেঁধিয়ে সেয়ার কিনুন বা নাই কিনুন—বেড়িয়ে এলেও দেখে আনন্দ পাবেন।

ভূতনাথ : তাহলে তো একদিন যাওয়া চাই—বেশ, সে ব্যবস্থা তাহলে আপনিই করে ফেলুন।

গোবৰ্দ্ধন : ব্যস্ত হবার কিছু নেই—আমি একদিন এসে নিয়ে যাব।··· হ্যাঁ, একবার অফিসে কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করে যাই··· কিছু বাণিজ্য আছে কিনা।

দাস-ফ্যাক্টরী। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্করের চেম্বার। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর স্ব স্ব আসনে বসে গোবৰ্দ্ধনের কথা শুনছেন।

গোবৰ্দ্ধন : দেখুন স্যার, ভূতনাথ বাবু আমাদের পাড়ার জামাই, যুগল মোক্তার মশাইও আমাকে জানেন; এঁদের সুপারিশ

যোগাড় করে আনা আমার পক্ষে কঠিন হোতনা, কিন্তু আমি তা পছন্দ করিনা। সাহস করে—নিজেকেই নিজের সুপারিশ ধরে আপনাদের সামনে হাজীর হয়েছি।

ভাস্কর: বেশ করেছেন; এই তো কাজের লোকের কথা।

সিদ্ধিনাথ: এ কাজ আপনার জানা আছে?

গোবর্দ্ধন: জেনে নেব আপনাদের কাছে। যারা কাজ দেয়—আদায় করে আনব। মুনফা ভাল পেলে—তখন কমিশন বলে যা দেবেন, তাই নেব—তা বলে আনডিউ য়্যাডভানটেজ পাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করব না স্যার।

ভাস্কর: ভাল কথা। বেশ, বলুন—অর্ডার সিকিওর করবার সাপক্ষে কি কি জানতে চান...

গোবর্দ্ধন: এই খাতায় লিখে নেব স্যার—তারপর বাড়ী গিয়ে ষ্টাডি করব লেখাগুলো।

সিদ্ধিনাথ: আপনি পারবেন—আপনাকে নিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।

* *
*

কলকাতা। লয়াস রেঞ্জের একাংশ। বেলা একটা। একখানা মোটরে ভূতনাথ, গোবর্দ্ধন ও তারক।

অদূরে সেয়ার মার্কেট প্লেস—সেখান থেকে একটা কলরব উঠছিল। হঠাৎ কোলাহল অত্যন্ত প্রবল ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠল।

ভূতনাথ: রায়ট—রায়ট—গাড়ী ফেরাও, শীগগীর!

গোবর্দ্ধন: কি বলছেন!

ভূতনাথ: শুনছেন না—কি ভীষণ হল্লা! মরবেন! ঐ দেখুন—ক্রাউড—

গোবর্দ্ধন: ঐ খানেই আমরা চলেছি ভূতনাথ বাবু! ওটা হোচ্ছে সেয়ার মার্কেটের ক্রাউড্। এই জন্মেই বলেছিলুম—এনজয় করবার মত জায়গা—

ভূতনাথ: য়্যাঁ! তাই নাকি—

তারক: ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বাবা!

সেয়ার মার্কেট। রাজপথ—সংলগ্ন ফুটপাথ জুড়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমাজের ভদ্রলোকদের ছুটাছুটি—উন্মত্তবৎ চীৎকার—স্লোগান—

দিলুভাই দালালের চেম্বার। ভূতনাথ, গোবর্দ্ধন, তারক, দিলুভাই।

দিলুভাই: আরে বাবুজী, পয়লা রূপিয়া কুছু লাগান তো পিছাড়ি আপনকার জবানসে সেয়ার ভুক্তান হোবে।

ভূতনাথ: গোড়ায় কতটাকা লাগাতে আপনি বলেন?

দিলুভাই: আপকো মর্জী বাবুজী। দো হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার—

ভূতনাথ: আচ্ছা কালই আমি হাজির হচ্ছি।



অচলার ঘর। সন্ধ্যার পর সবেমাত্র ধুপ-ধুনা দিয়ে সায়ংকৃত্য সেরে অচলা দরজার দিকে ফিরেছেন, এমন সময় দেখেন ভূতনাথ ঘরে প্রবেশ করছে।

অচলা: অ-মা! এসেছিস? হ্যাঁরে আপিস থেকে ওবেলা

কোথায় গিয়েছিলি? উনি তো ভেবেই খুন! টিফিনের খাবার পর্য্যন্ত কৈলেস ফিরিয়ে নিয়ে এলো—

ভূতনাথ : একটা কাজের জন্যে বেরিয়েছিলুম বৌমা। এই তো ফিরছি; টিফিন সেইখানেই করেছি। হ্যাঁ—দেখ বৌমা, কাল আফিসে বেরুবার সময় আমার কিছু বেশী টাকা—

অচলা : অ-মা! দুর্গা তোকে বলেনি কিছু? টাকাকড়ির যা দরকার তোর হবে, ওর কাছ থেকেই চেয়ে নিবি।

ভূতনাথ : তার মানে—আমাকে তুমি ভিখিরী হতে বলছ? এখন কাঁধে একটা ঝোলা বেঁধে দাও।

অচলা : কথা শোন ছেলের! বৌয়ের কাছে চাইলে বুঝি ভিখিরি হতে হয়? জানিস—অন্নপূর্ণার কাছে শিবকেও ভিক্ষে চাইতে হয়েছিল। তাতে শিবের মান বেড়েইছিল।

ভূতনাথ : তুমি ও সব যাই বল বৌমা, টাকাকড়ির ব্যাপারে এই ঘরে যিনি থাকেন—আমি শুধু তাঁকেই জানি, টাকা আমার কাল চাইই—বুঝলে?

বলতে বলতে হাতের ৫টা আঙুল দেখালো।

অচলা : বেশ তো, তোর ও ঘরে যে থাকে, তাকে বলেই দেখনা আগে—না মেলে তখন তো আমি আছিই।

ভূতনাথের ঘর। ভূতনাথ ও দুর্গা। ভূতনাথ খাটে উপবিষ্ট, একটু দূরে জড়সড় ভাবে দুর্গারাণী দাঁড়িয়ে আছে নতমুখে—মাথায় অবগুণ্ঠন।

ভূতনাথ : বৌমার সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল শুনি?

দুর্গা : আমি তো কিছু জানি না!

ভূতনাথ : জানো না? ন্যাকামী! বলনি বৌমাকে—টাকা পয়সা তোমার কাছে রাখতে …

দুর্গা। না, না, আমি তো ও কথা বলিনি…দিদি নিজে হাতে করে সিন্ধুকে রাখলেন … যেমন রেখেছেন, তেমনি আছে।

ভূতনাথ : কতটাকা বৌমা রেখেছেন?

দুর্গা : (অচলার নিষেধ হেতু নিরুত্তর)

ভূতনাথ : বোবা হলে নাকি—বল ?

দুর্গা : পাঁ—চ হাজার।

ভূতনাথ : চাবি কোথায় ?

দুর্গা : (আঁচলে বাঁধা চাবি দেখাল)

ভূতনাথ : সিন্ধুক খুলে টাকা গুলি এখানে রাখ দেখি।

বলেই পকেট থেকে রুমালখানি বার করে খাটের উপর পেতে দিল। দুর্গারাণী সিন্ধুক খুলে নোটের একটা বাণ্ডিল রুমালের উপর দিলে—ভূতনাথ সেটা দেখে অগ্রাহ্যভাবে রুমালে রেখে বলল :

ভূতনাথ : এতো দেখছি—মাত্র এক হাজার। আর কই ?

দুর্গা : দিদি বলেছিলেন—এক তাড়ার বেশী যেন…

ভূতনাথ : থামো! ডেঁপমি করতে হবে না—সিন্ধুকে যা আছে, সব আনো। এর পর—বৌমার কাছ থেকে আবার পাঁচ হাজার এনে রেখো।

অচলার ঘর। অচলা ও দুর্গা।

অচলা : য়্যা—করলি কি! অতগুলো টাকা সব একদিনে ওর হাতে তুলে দিলি! অত করে বলেছিলুম, একটু শক্ত হতে পারলিনি?

দুর্গা : মা গো! চোখ দুটো পাকিয়ে কি ধমকানি!

অচলা : তোর কি মুখ ছিল না পোড়ারমুখী? বলতে পারলিনি—এক সঙ্গে সব টাকা দেবনা··· দিদি দিতে বারণ করেছে?

দুর্গা : আমার বড্‌ডো ভয় করে বৌমা!

অচলা : কিন্তু অতো ভয় করলে তুই তো ভূতোকে টিট করতে পারবিনি ছোট বৌ! শক্ত তোকে হোতেই হবে—নৈলে ভূতো সব লুটে পুটে নিয়ে যাবে—ওর টাকার দরকার হোলেই। আচ্ছা—আসুক তো সে!

* *

*

যুগল মোক্তারের খাস কামরা। ভূতনাথকে নিয়ে যুগল মোক্তার ঘরে প্রবেশ করছেন কথা বলতে বলতে। তখন অপরাহ্ন কাল; যুগল মোক্তারের কাছারীর পোষাক—এই মাত্র ফিরছেন কাছারী থেকে।

যুগল : এসো বাবাজী এসো—আমাকে মনে করে যে এলে, এতে ভারি খুসি হয়েছি····ব'স, ব'স,।

বলেই যুগল মোক্তার তাঁর স্থানে বসলেন। ভূতনাথ বসতে বসতে বলল :

ভূতনাথ : রোজই ভাবি আসি, কাজের ভীড়ে হয়ে উঠেনা।

যুগল। বটে! তাহলে কারখানায় কাজের ঘানি টেনে চলেছ বল! হাঃ হাঃ হাঃ—ঘানি বললুম বলে যেন চটে যেয়োনা বাবাজী, সেকেলে মানুষ আমরা, রেখে ঢেকে কথা বলতে শিখিনি। হ্যাঁ—ভালকথা, তোমাদের কারবারে নাকি এ বছর মোটা মুনফা হয়েছে ··তার জন্যে তোমার দাদা দুহাতে 'হরিলুঠ' বিলুচ্ছেন···

ভূতনাথ : হরিলুঠ····

যুগল : আহা·· তাই বৈকি বাবাজী ! কারখানা থেকে আফিস শু সবাইকে মাইনের সাড়ে বারো পার্সেন্ট বোনাস ব বিলোচ্ছেন ··নয় কি বাবাজী ?

ভূতনাথ : কই ! আমি তো জানিনা ····

যুগল : জানো না ! সে কি হে বাবাজী। মুনফা হলো—খয়রাতি হবে ;—আর কিনা—আধা অংশীদার তুমি জানো না অথচ এই মাত্র বললে কাজের ভীড়ে নাকি হিমি খাচ্ছ—ষ্যাঁ !

ভূতনাথ : মুনফার কথা অবশ্য জানি, কি বোনাসের ব্যাপারটা····

যুগল : শোননি—এইত ! অথচ দেখ বা জী—কি হারে বোন দেবার কথা উঠেছে সে খবর পর্য্যন্ত আমি তোমা শুনিয়ে দিলুম। অবিশ্য, আমার এখানে কথা ব হয়তো—অনধিকার চর্চা, কিন্তু দুয়ে ভাগ্নেটা—আ তোমার তরেই আমার যত মাথা ব্যথা ! এখন—তুমি একটু ভেবে বলতো বাবাজী মুনাফা হয়েছে বলে বোনাস দিতে হবে কেন ? আচ্ছা, ধর যদি—লোকস হোত, তাহলে—এখন যাদের বোনাস দেওয়া হচ্ছে, তাঁ মাইনের টাকা কিছু কম করে নিতেন ?

ভূতনাথ : আপনার এ যুক্তি অকাট্য মামাবাবু····আমি একথ তুলব।

যুগল : তোল, সে তো ভালো কথা, কিন্তু দেখো বাবাজী, যে মামাবাবুর নামটি তুলে তোল-মাটি-ঘোল ক'রনা।·· আরো একটা কথা বলি বাবাজী,—ক্রমে ক্রমে এগুতে থাব

দাদার তো বানপ্রস্থের সময় হয়ে এসেছে—এগিয়ে গিয়ে তোমাকেই বসতে হবে তার আসনে পরের কর্তামীর ভুরটাও তখন আপনি ভেঙে যাবে বাবাজী!

ভূতনাথ: পরের কর্তামী! আপনি কি ভাস্করদা'র কথা বলছেন মামাবাবু! কিন্তু তিনি যে আমাদের···

যুগল: আহাহা···ছাড়ান দাও বাবাজী, ছাড়ান দাও! ইশারার অর্থ যেখানে দুর্বোধ্য, কথায় চিঁড়ে ভিজিয়ে কোন ফয়দা নেই। ছাড়ান দাও বাবাজী, ছাড়ান দাও—এখন থাকগে ওকথা।

* *
*

দাস ফ্যাক্টরী। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর তাঁদের আসনে বসে কথা বলছেন।

ভাস্কর: বোনাস-সীটটা একবার ভূতনাথের ঘরে পাঠানো উচিত—সেও দেখুক।

সিদ্ধিনাথ: কি দরকার? এ তো আর টেণ্ডার নয়!

ভাস্কর: দেখলে হয়ত খুসিই হবে—খরচে মানুষ ত! হোল ষ্টাফ্ একটা বোনাস পাচ্ছে দেখে ঐ বেশী আহ্লাদ করবে দেখো!

সিদ্ধিনাথ: তবে দাও পাঠিয়ে—

ভাস্কর অমনি কলিং বেল টিপলেন।

ভূতনাথের ঘর। সিগারেট খেতে খেতে চেয়ারে বসে ভূতনাথ ভাবছে। বেয়ারা একটা ফাইল এনে তার সামনে রাখল। ফাইলখানা

খুলে টাইপ করা কাগজের হেডিংটা পড়তেই তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। বেয়ারকে বলল :

ভূতনাথ : আমি যাচ্ছি এ ফাইল নিয়ে—তুই যা!

অভিবাদন করে বেয়ারা চলে গেল। ভূতনাথ তখন কাগজখানা পড়ছে। পরক্ষণে চোখ তুলে আপন মনে বলল :

ভূতনাথ : মামাবাবু কি জ্যোতিষ জানেন! যা বললেন কাল—সব মিলে যাচ্ছে। হুঁ!

ফাইলটা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাহিরে যাবার ভঙ্গিতে।

অফিস ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়ে সামনে দণ্ডায়মান ভূতনাথের কথা শুনছেন। ভাস্করের মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি লেগেই আছে—সিদ্ধিনাথের মুখখানি কিন্তু বিরক্তিতে ভরে গেছে।

ভূতনাথ : আমার কাছে এটা পাঠিয়েছেন বলেই বলছি। কখনো তো বোনাস দেওয়া হয়নি ষ্টাফকে, হঠাৎ এ বছর এটা দেওয়া হোচ্ছে দেখেই জিজ্ঞেস করছি।

সিদ্ধিনাথ : দেওয়া হবে ব'লে যখন পাকা হয়ে গেছে—জিজ্ঞেস করবার কি আছে? এত কাল আমরা লাভের টাকা ষোল আনাই ঘরে তুলিছি, এ বছর তা থেকে কিছু অংশ কর্মচারীদের ভাগ করে দিচ্ছি।

ভাস্কর : তোমার কি এতে আপত্তি আছে ভূতনাথ?

ভূতনাথ : আমি শুধু জানতে চাইছি—কারবার যখন লোকসান থাচ্ছিল, সে সময় কর্মচারীদের মাইনের অংশ থেকে কি কিছু কেটে নেওয়া হয়েছিল?

সিদ্ধিনাথ: লাভের কথায় আগেকার লোকসানের কথা তুই কি বলে টেনে আনলি?

ভূতনাথ: আমি কিছু বললেই তো দোষ হয়। তারক বেচারী যে মাইনে পায় কুলোচ্ছে না তার, কিছু বাড়াবার জন্যে সুপারিস করলুম, এখন খরচ বাড়ানো ঠিক নয় বলে তার দরখাস্ত বাতিল হলো, অথচ বোনাস্ লিষ্ট বেরিয়েছে! আমার কাছে পাঠাবারই বা কি দরকার ছিল—

ভূতনাথ মুখখানা ভার করে চলে গেল। দুই বন্ধু পরস্পরের পানে তাকালেন।

সিদ্ধিনাথ: এইজন্যেই ওকে লিষ্টটা দেখাতে চাইনি—তুমি বললে, দেখে ও আহ্লাদ করবে। এখন দেখলে ত?

ভাস্কর: কিন্তু গোড়ায় যে গলদ করে বসে আছ সিধু—সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তারকের ব্যাপারটা স্পেশ্যাল কেস হিসেবেও তখন বিবেচনা করা উচিত ছিল তোমার। তুমি সে সময় এমনি বেঁকে বসলে'যে—

সিদ্ধিনাথ: তুমি বুঝছ না ভাই—ওকে এখন লোকে নাচাচ্ছে—

ভাস্কর: কিন্তু আমরা ওকে নাচবার ফুরসদ দেব কেন বল?

সিদ্ধিনাথ: বেশ তুমি যা ভাল বোঝ কর ভাই—আমি কোন আপত্তি করব না।

* *
*

অচলার ঘর। কিছুটা রাত হয়েছে। ভূতনাথ অচলার কাছে অফিসের ব্যাপারে অভিযোগ করতে এসেছে; কিন্তু তার আগে অচলাই তাকে দুর্গার ব্যাপারে অভিযুক্ত করে কৈফিয়ৎ চাওয়ায়

ভূতনাথ ব্যাপারটাকে নিজের মনের মত করে মানিয়ে মর্মস্পর্শী স্বরে অভিনেতার মত আকৃষ্ট করে বলছে :

ভূতনাথ : আমি কোথায় তোমার কাছে দুঃখের কথা জানাতে এলুম, তুমি তাতে কাণ না দিয়ে ছোট বৌএর পক্ষ নিয়ে আমাকে ধমকাতে শুরু করলে বৌমা! তোমাদের মেয়ে জাতটাই এমনি পক্ষপাতী।

অচলা : এতে পক্ষপাতের কি হলো শুনি? পরের মেয়েকে এনে আপনার করে নিতে হোলে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে তার পানে তাকিয়ে কাজ করতে হয় তা জানিস্! তোর দাদা পই পই করে বলে দিয়েছে—ছোট বৌএর মনে যেন কেউ কোন রকমে ব্যথা না দেয়—

ভূতনাথ : আমিই বুঝি খালি খালি তার মনে ব্যথা দিয়িছি?

অচলা : সে কি তুই নিজে বুঝিস্ না! অমন ভালো মেয়ে হয় না, দেখতে পাই না; কিন্তু তুই কি তার সঙ্গে ভালো ব্যাভার করিস্ ভূতো? তার ওপরে এমনি তোর টাইস্-যে— তোকে দেখলেই সে ভয়ে কাঁপতে থাকে, দুটো মিষ্টি কথা তারে বলিস না—সব সময় দাঁতে খিঁচুস্...এ সব কি ভালো কথা? ছেলে মানুষ, ছাপোসা ঘরের ভাগনী, টাকা পয়সা হয়ত নাড়েনি, সেই বুঝে হাজার কতক টাকা ওর বাক্সয় সাজিয়ে দিয়েছিলুম—তুই উজোড় করে নিয়ে গেলি সব—

ভূতনাথ : তুমিই কেন আমাকে দিলে না? আমার টাকা নিয়ে কথা—

অচলা : অত টাকা তোর কিজন্যে দরকার হয়েছিল শুনি?

ভূতনাথ : শুনো পরে—এখন নয়। তবে জেনো, সে টাকা আমি

ওড়াই নি—আমার ভারি সাধ হয়েছে বৌমা…টাকার মানুষ হ'তে নিজের চেষ্টায়।…তুমি আমাকে ভালবাস বলেই বললুম…আর কেউ শুনলে হাসবে হয়ত—

অচলা : কেন, তোর দাদা—আমাদের দেবতা—ওঁরা তোকে ভালবাসেন না ?

ভূতনাথ : সে কথাই ত বলতে এসেছিলুম তোমার কাছে। তুমি জানো, তারককে আমি কত ভালবাসি ? দাদার কাছে যেমন তোমার ঐ দেবতা, আমার কাছেও তেমনি তারক। কিন্তু ওর মাইনে বাড়াবার জন্যে ওঁদের বলেছিলুম, 'না' করেছেন ; অথচ গুষ্টীশুদ্ধকে এখন বোনাস দেওয়া হোচ্ছে।

ভূতনাথের এই নালিশ শুনতে শুনতে অচলার মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং সেই সঙ্গে স্নিগ্ধস্বরে বললেন :

অচলা : ঐ নিয়ে কাল আপিসে ঝগড়া করে এসেছিস্—ওঁর মুখে সে সব শুনিছি, কিন্তু ওঁরা কি করেছেন জানিস্ না তো ! শোন্—দেবতার ওপরে তোর দাদা ভার দিতে তিনি তোর তারকের কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোর নালিশ তো হয়ে গেল, এখন ছোট বৌএর নালিশ তোলা রইল—এরপর ভালো ব্যভার তার সঙ্গে যদি না করিস্, আমি কিন্তু এ নিয়ে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বাধাব—তা বলে রাঁখছি।

* *

*

ভূতনাথের ঘর। রাত হয়েছে। ভূতনাথ ও দুর্গা। দুর্গারাণী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছছে—খাটের উপর বসে সিগারেট ফোঁকার সঙ্গে তর্জনের ভঙ্গিতে ভূতনাথ বলছে :

ভূতনাথ : আবার নেকামী করে কান্না হোচ্ছে। ওসব প্যানপেনানী আমি পছন্দ করি না! ফের যদি শুনি—আমার নামে বৌমার কাছে কিছু লাগিয়েছ—সেদিন তুমি আর এক মূর্তি আমার দেখতে পাবে। গায়ে এখনো হাত তুলিনি—তাও সেদিন বাকী থাকবে না। কাছে এগিয়ে এল… এসো বলছি—

নীরবে ধীরে ধীরে কম্পিত পদে দুর্গা খাটের দিকে এগিয়ে আসে।

ভূতনাথ : ফের ফোঁস্ ফোঁস্ করে সাপের মতন। মুখ থেকে ঘোমটা খোলো—খোলো শীগ্গীর—

দুর্গা কম্পিত হাতে ঘোমটা কিছুটা মাথার দিকে সরিয়ে দিল—অশ্রু মাখা ম্লান মুখখানা দেখা গেল।

ভূতনাথ : চাও আমার দিকে--

দুর্গা : (নীরবে তাকাল)

ভূতনাথ : বলো, যা বললুম—বলো….

দুর্গা : আমায় মাপ করো—আমি আর কখ্খনো—

ঘরের দরজা সশব্দে ঠেলে খুলে প্রবেশ করলেন অচলা। দ্রুতপদে দুর্গার কাছে যেতেই দুর্গা তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল। জলন্ত দৃষ্টিতে ভূতনাথের দিকে তাকিয়ে অচলা বললেন :

অচলা : ভূতো! খুব হয়েছে। এমনি করে বৌকে শাসিয়ে আমার কথা রাখবি বটে!

ভূতনাথ বেগতিক দেখে হাতের সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলে বিচিত্র গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* *
*

সেয়ার মার্কেট। ডুলিভাই দালালের চেম্বার। ডুলিভাই, যুগল মোক্তার (কাছারীর পোষাকে), গোবর্দ্ধন ও কতিপয় ব্রোকার। বেলা তখন ১১টা।

যুগল: একটা কথা কিন্তু হরদম ইয়াদ রাখা চাই ডুলিভাই সাহেব! ব্রোকারেজই বল, আর বখরাদারীই বল—তার হিস্তে এই গোবর্দ্ধন বাবুর মারফত আমাকে দেবেন বটে, কিন্তু কড়া নজর রাখতে হবে—ও মক্কেল যাতে বজায় থাকে।

ডুলিভাই। হাঁ—হাঁ—দাসবাবু আপনকার দামাদ আছে হামি তা জানে বাবুজী! লোকসানী সিয়ার হামিলোক ভুক্তান না করবে উনিকা ওয়াস্তে।

যুগল: আসল কথাটা তাহলে বলি—ভূতনাথবাবুর মাথার ওপরে দাদা আছেন, তা ছাড়া আছেন তাঁর এক নম্বরের এক ওস্তাদ উজীর। এই ছোকরাকে ওঁরা দাবিয়ে রেখেছেন—আমরা চাইছি কারবারের গদীতে ওকে জাঁকিয়ে বসাতে। তখন লাখ লাখ টাকার কারবার হবে—সেই ভেবে এখন এমন সব সেয়ার ওঁকে দিয়ে কেনাতে হবে—টাকা জলে পড়েছে ভেবে উনি পিছিয়ে না যান। আর, এ ব্যাপারে আমার নামগন্ধও যেন—কথা আমার বুঝেছেন?

ভুলিভাই : হাঁ বাবুজী—হাঁ,—হামিলোক বিল্‌কুল বুঝিয়েছে—আপনকার মর্জীমাফিক সব ফায়সলা হইয়ে যাবেক—মৎ ঘাবড়াইয়ে বাবুজী!

* *

*

কলকাতার পথ। একখানা ট্যাক্সীর মধ্যে যুগল মোক্তার ও গোবর্দ্ধনকে দেখা যাচ্ছে। ভুলিভাই দালালের চেম্বার থেকে এঁরা আলিপুরে চলেছেন। সেখানকার কাজ সেরে গোবর্দ্ধন শিবনগরে যাবে। বেলা তখন সাড়ে এগারটা।

যুগল : এখানকার কাজটাও খুব জরুরী—আমার আসা একবার দরকার ছিল, তাই সেরে গেলাম। পেস্কারকে বলে—গোড়ার মামলাগুলোর মুলতুবী ব্যবস্থা করে এসেছি, বুঝলে?

গোবর্দ্ধন। আপনার সব তাতেই চুল-চেরা হিসেব-কোথাও ফাঁক থাকে না।

যুগল : যা বলেছ হে—এই হিসেব। এটা আগে থেকে করে রাখলে পরে পস্তাতে হয় না। ভূতনাথের ব্যাপারেও এই হিসেবের খেলা—শুধু দেখে যাও।

গোবর্দ্ধন : ভূতনাথ বাবু তো অবাক। বলেন—মামা কি জ্যোতিষ জানেন।

যুগল : হে-হে-হেঃ। বলে বুঝি?

গোবর্দ্ধন : বলছিলেন—মামার কথা মত ফোঁস্ করতেই ওঁদের ঝোট ফাঁস হয়ে গেছে। নিজেরা যেচে তারকের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে—কুড়ি টাকা।

যুগল : জানি। কিন্তু এখানে হিসেবটা একটু গেঁজে গেছে হে!

গোবর্দ্ধন : তার—মানে ?

যুগল : তাহলে মন দিয়ে শোন—আর মনের মুখে কোষে ছিপি এঁটে রাখো ! ঐ তারক ছোকরাকে এখন ছাঁটাই করে ওর জায়গায় তোমাকে বসাবার মতলব আমি করিছি।

গোবর্দ্ধন : বলেন কি !

যুগল : সাধে কি নিজে হামরাই হোয়ে বড় বড় ফারম থেকে অর্ডার যোগাড় করে তোমাকে বর্তমানের দুই কর্তার নেক্ নজরে ফেলেছি ? এ-টাও হিসেব হে !

গোবর্দ্ধন : আপনার দৌলতে ওঁদের কাছে আমার এখন যথেষ্ট প্রেষ্টিজ, আর কমিশন বাবদ টাকা-পয়সা—যা পাওয়া যাচ্ছে—কম নয়, এর ওপর চাকরী নিলে—

যুগল : হিসেব খতিয়ে ঠিক সময়ে বুঝিয়ে দেব—ও চাকরী হবে বোঝার ওপরে শাকের আঁটির মতন। এখন শুধু দেখে যাও। হ্যাঁ—তবে তারকের স্বপক্ষে যা বলবার তার সামনে ভূতনাথকেই বলবে · কিন্তু ভাস্কর বা সিদ্ধিবাবুর কাছে তারকের দিকে টেনে টু-শব্দটিও বলবে না ··বুঝলে ?

গোবর্দ্ধন : তাহলে তারকের—

যুগল : বললুম তো···হিসেব চলেছে ; শুধু দেখে যাও, তাহলেই জানবে, আর বুঝবে। আরো একটা মোক্ষম কথা শুনে রাখ—তারককে সরানো মানেই কাঁটা তুলে কাজ উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করা। এ সব কাজে বলি চাই···তারক হচ্ছে সেই বলি—বুঝলে ?

* *

*

আফিস ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর স্ব স্ব আসনে বসে একখানা চিঠি নিয়ে আলোচনা করছেন:

সিদ্ধিনাথ: কি সর্বনাশ! ভূতো কিনা সেয়ার-মার্কেটে আনাগোনা স্থরু করেছে! ওকে এখন থেকে—

ভাস্কর: *আগে ভাল করে খবর নাও। একখানা চিঠির ওপর নির্ভর করে—*

সিদ্ধিনাথ: চিঠিখানা কি তুমি বাজে বলতে চাও—ঠুনঠুনওয়ালা দালাল লিখছে, ভূতো আর তারকের নাম রয়েছে···ভূতো ওখানে নিজেকে এ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বলে পরিচয় দিয়েছে···চিঠিখানা তাই ম্যানেজারের নামে আসায় আমাদের হাতে পড়ে গেছে। এ কখনই বাজে বা মিথ্যে হতে পারে না। এখন বুঝিছি—এ অনর্থের মূল হচ্ছে ঐ তারক; এইজন্যেই ওর মাইনে বাড়াবার জন্যে বাবুর অত লম্ফ ঝম্প কাঁদুনি! আর এইজন্যেই তাড়াতাড়ি সইগুলো সেরে প্রায়ই বারোটার পর আফিস থেকে পালায়—

ভাস্কর: বেশ তো—তারককে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করলেই—

শুনেই সিদ্ধিনাথ কলিংবেল টিপলেন—বেয়ারা ছুটে এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তাকে বললেন:

সিদ্ধিনাথ: তারক বাবুকে ডাক তো—

* *

*

কর্মচারীদের ঘর। কতক খাতাপত্র লিখছে। কেউ কেউ বা কথা বলছে। এক দিকে তিনটি মেসিনের সামনে বসে তিন জন টাইপ করে চলেছে—তাদের মধ্যে তারককে দেখা যাচ্ছে।

বেয়ারা এসে বলল :

বেয়ারা : তারকবাবু, বড়াবাবু আপনাকে ডাকছেন—

তারক : বড়বাবু ?

বেয়ারা : বড়াবাবু আছেন, ম্যানেজারবাবু আছেন—আসুন।

আফিস ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্করের সামনে তারক জবাবদিহি করছে।

তারক : আজ্ঞে না।

সিদ্ধিনাথ : তুমি হলফ করে বলতে পারো যে ভূতো সেয়ার মার্কেটে যায় না ?

তারক : ভূতনাথ বাবু সে লোকই নন স্যার! আমি ত ওঁর সম্বন্ধে অনেক খবর রাখি, কিন্তু শেয়ার-মার্কেটের নামই আমরা শুনিছি, চোখে কখনো দেখিনি।

ভাস্কর : এখন এই চিঠিখানা দেখত·· ভূতনাথবাবু তোমার হাত দিয়ে যে দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিল—ঠুনঠুনওয়ালা ব্রোকার লিখছেন, সে টাকা তিনি পেয়েছেন···এখন তুমি কি বলবে ?

সিদ্ধিনাথ : চুপ করে রইলে যে—জবাব দাও, বলো—

তারক : আজ্ঞে.. হ্যাঁ - এখন মনে পড়ছে·· হ্যাঁ, দু'হাজার টাকা উনি আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন····কিন্তু সে তো ঠুনঠুন-ওয়ালা নয়—অন্য লোক, তাঁর নাম মনে পড়ছে না।

ভাস্কর : তোমার সাফাই বাপু কেঁচে গেল, টিকল না।

সিদ্ধিনাথ : শোন, তোমাকে এখনই কাজ থেকে বরখাস্ত করা হলো—কেসিয়ারের কাছ থেকে তোমার পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে যাও, আমরা সেখানে অর্ডার পাঠাচ্ছি—যাও।

ভূতনাথের চেম্বার। বেলা প্রায় বারোটা। ভূতনাথ ও তারক।

ভূতনাথ: আহাম্মুখের মত ওরা ম্যানেজারের নামে চিঠি পাঠাতেই ত সব ফাঁস হয়ে গেছে। আর তুই-ই বা ও-ভাবে ডাহা মিথ্যে বলতে গেলি কেন? চিঠিখানা হাতে পেয়েই তোকে ডেকে চ্যালেঞ্জ করেছিল—এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

তারক: আমি ভেবেছিলুম—আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে। তাই—মিথ্যের ওপরেই জোর দিতে হয়েছিল। কিন্তু ঠুনঠুনওয়ালা এলো কোথেকে—ভারি তাজ্জব তো!

ভূতনাথ: অনেক দালাল তো আছে—দিলু ভাই লিখতে ঠুনঠুনওয়ালা লিখেছে—হয় তো ওরই পার্টনার ফার্টনার কেউ হবে। তবে সে যাই হোক, তুই ঘাবড়াসনি—আমি যখন ওঁদের অর্ডারের ওপর রিকোয়েষ্ট করে লিখিছি…ঠেলতে পারবে না।

তারক: ভরসা এখন তুমিই। কিন্তু ওদের যে-রকম ষ্ট্রং য়্যাটিচুড দেখলুম, তাতে—

এই সময় বেয়ারা ফ্যাক্টরীর নাম ছাপা কাগজে লেখা ভূতনাথের পত্রের পাশে অন্য হাতে লেখা—সেই অনুরোধপত্রখানা ফিরিয়ে এনে ভূতনাথের হাতে দিল। সেখানা পড়তে পড়তে ভূতনাথের মুখখানা কালো হয়ে গেল। তারক নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ভূতনাথের পানে চেয়েছিল। এই সময় শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

তারক: কি ব্যাপার—

ভূতনাথ: আমি যা কল্পনাও করিনি তুই শিয়ালের এক রা। লিখেছে কি শোন্—'যার জন্যে তুমি অনুরোধ করছ, আফিসের ডিসিপ্লিনের দিকে তাকালে তাকে রাখা যায় না। সে শুধু

লায়ার নয়—সেমলেস্ ল্যায়ার, অর্থাৎ কি না—নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী।' বটে! আচ্ছা—

তারক : আমি তো বললুম ভাই—ওদের য়্যাটিচুড এই ব্যাপারে—

ভূতনাথ : একটু বোস আমি আসছি।

আফিস চেম্বার। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর পূর্ববৎ উপবিষ্টভাবে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ভূতনাথের সঙ্গে কথা বলছে :

সিদ্ধিনাথ : সেয়ার মার্কেটে গিয়ে তুমি ন্যায় কি অন্যায় করেছ—আর ওটা রোজগারের রাস্তা, কিম্বা উৎসন্নে যাবার জায়গা—তা নিয়ে তো এখন কথা হচ্ছে না। ও ছোকরা তো তোমার মতন আসল ব্যাপারটা বলতেই পারত! কিন্তু আমাদের সামনে যেভাবে ও জোর দিয়ে মিথ্যা বলেছে, শুধু সেই জন্যেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে ওকে আর রাখা চলে না। বেশী কথা কি, বাবাও যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে এমন অন্যায় অনুরোধ করতেন, আমি রাখতে পারতুম না।

ভূতনাথ : ভাস্করদারও কি এই মত?

ভাস্কর : সেটা কি তুমি এখনো বুঝতে পারনি ভূতনাথ? তোমার দাদাই বলে থাকেন, আমার নিজের মতটা এত উদার যে, তার জন্যে ফ্যাক্টরীর লোকেরা নাকি আস্কারা পায়। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারে সিধুর কথার ওপরে আমার ভাই কিছুই বলবার নেই। এই ফারমে তারকের মত ছেলেকে তো রাখা হবেই না—তোমারও উচিত নয় ওর সংস্পর্শে থাকা!

ভূতনাথ : [ভূতনাথ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রুক্ষ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল] যে—আজ্ঞে! (পরক্ষণে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।)

ভূতনাথের চেম্বার। ভূতনাথ, তারক ও গোবর্দ্ধন। ইতিমধ্যে গোবর্দ্ধন এসে ব্যাপারটা শুনে কৃত্রিম দুঃখ, বেদনা ও ক্ষোভে যেন ফেটে পড়বার মত হয়েছে। সেই ভাবের আবেগে বলছে :

গোবর্দ্ধন : তাহলে তো এ শাস্তি আমারই হওয়া উচিত ভূতনাথ-বাবু! আরে—তারকবাবু তো প্রথমে রেসের কথা তুলে-ছিলেন, আমিই ওপর পড়া হোয়ে সেয়ার মার্কেটের পথটা দেখিয়েছিলুম।... তার জন্যে ওঁর চাকরী খতম... না, না, না, এ হবে না, হতে পারে না, হতে দেব না—আমি নিজেই ওঁদের বলবো—

ভূতনাথ : কেন বলে মান খোয়াবেন গোবর্দ্ধন বাবু! এর পর আপনার ব্যাপারটাও জানাজানি হোলে—

গোবর্দ্ধন : আমি কি তার পরোয়া করি নাকি? নিজেই বলব... হ্যাঁ—আমি, তারকবাবু নয়—আমিই—

ভূতনাথ : রক্ষে করুন। তারক খসে পড়ল; এখন আপনিও আর ইচ্ছে করে—

তারক : না, না, যখন আপনার কথা জানাজানি হয়নি—আপনি নিজে আর বলবেন না গোবর্দ্ধন বাবু।

গোবর্দ্ধন : কিন্তু তা বলে—আপনারও খসা হবে না তারকবাবু! আমরা 'থ্রি ম্যাসকে টিয়ার্স' ঠিক থাকবো। আপনারা তো জানেন,—বড় বড় মিল থেকে মোটা মোটা অর্ডার এনে দিয়ে এঁদের

খুব খাতির পাচ্ছি—কাজেই, আমার কথা ওঁরা রাখবেনই। অন্ততঃ, তারকবাবুর পোষ্টে বাইরে থেকে যাতে আর কেউ এসে না বসে, সে চেষ্টা আমি করবই—

ভূতনাথ : তাতে লাভ ?

গোবর্দ্ধন : আরে মশাই, যাক্ না দিন কতক—সুযোগ সুবিধে বুঝে তারকবাবুকেই ফের বাহাল করাব। তারপর—ওঁরা তো আর মারকণ্ডের প্রমাই নিয়ে আসে নি গো! ভূতনাথবাবুও তো ও-ঘরের একখানা চেয়ারে বসতে পারেন। (হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে) কর্তাকেও আর বেশী দিন আফিসের গদীতে বসতে হবে না—ব্লাডপ্রেসার চাড়া দিয়েছে যখন···তবে ?

ভূতনাথ : আপনি তো তাহলে সাধারণ লোক নন দেখছি! কথা-গুলো শুনলে আমার মামা শ্বশুরের কথা মনে পড়ে—

গোবর্দ্ধন : যুগল মোক্তার মশায়ের কথা বলছেন তো! (উদ্দেশে নমস্কার করে) আমার গুরুদেব—সুরুতে তাঁরই কাছে হাত মক্স—দরকার পড়লে এখনো বুদ্ধি শানাতে যেতে হয় মশাই! মহাপুরুষ তিনি। (পুনরায় নমস্কার)

তারক : তাহলে আমি চলি ভূত্‌দা—

গোবর্দ্ধন : বসুন, বসুন; একটা পরামর্শ দিই শুনুন—আপিস থেকে ওঁর নাম কাটা গেলেও ওঁকে ছাড়া হবে না আপনার ভূতনাথবাবু! আমাদেরও এখন জিদ হওয়া চাই—ওঁদের জিদ ভেঙে তারকবাবুকে আবার ফিরিয়ে আনাতে হবেই। এখন থেকে এই মতলবই আমাদের মাথায় ঘুরবে।

উপস্থিত ওঁর মাইনেটা না হয় আমরাই মাস মাস ভাগাভাগি করে দুজনে দেব।

ভূতনাথ : হিয়ার, হিয়ার! আপনার যুক্তি খাসা। তবে তারকের মাইনেটার পার্ট পেমেণ্ট আর আপনাকে করতে হবে না— আমিই একলা আমার পকেট থেকে দেব। তারক আমারই কাজ চালাবে—সেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করবে।

গোবর্দ্ধন : বাস, বাস, তবে আর কি! আমিও তারকবাবুকে সুলুক সন্ধান দিয়ে কিছু অর্ডার পত্র আনিয়ে নেব; আর সেগুলো এখানে দেব; তার কমিশন আমার মারফত উনিই পাবেন— একটা একস্ট্রা ইনকমও ওঁর হবে—কি বলেন?

তারক : তাহলে দেখছি ব্যাপারটা আমার পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়াল।

*　*
*

আফিসের চেম্বার। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর। গোবর্দ্ধন এসে এ দিনের এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করছে :

গোবর্দ্ধন : আমিও তো—ছোটবাবুকে বোঝাচ্ছিলুম স্যার, ওঁরা তো অন্যায় কিছু করেন নি! আর—ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলাটা খুবই দোষের। মুখের ওপর মিথ্যা বলে ধরা পড়লে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।—আমার কথা শুনে এখন বুঝেছেন, ঠাণ্ডাও হয়েছেন।

সিদ্ধিনাথ : আচ্ছা, আপনাকে তো অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়। সেয়ার মার্কেটের খবর আপনি রাখেন? ভূতনাথকে ওখানে দেখেছেন কোন দিন?

গোবৰ্দ্ধন : আমার কি ক্ষ্যামতা বলুন—যে সেয়ার মার্কেটে পাড়ি জমাতে যাব। সে তো শুনিছি—মস্ত একটা দরিয়া বিশেষ। তবে একথাও বলি—বাঙালী বাবুরা থোড়াই ও-বাজারে গিয়ে থাকেন—তাঁদের জায়গা হচ্ছে রেসের মাঠ, ঘোড়ার পিছনেই ছোটেন। যদিই ছোটবাবু ওখানে যাওয়া আশা করে থাকেন স্যার, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। বলেন তো, আমি আপনাকে সব খবর যোগাড় করে এনে দিতে পারি—একবারে আয়নার মতন সব দেখতে পাবেন।

ভাস্কর : এ কথা মন্দ নয়—আপনিই এটা পারবেন। বেশ ত, খবরটা যদি জানাতে পারেন, আমরা তাহলে আশ্বস্ত হই। অবিশ্যি, তার জন্যে আপনার দক্ষিণা—

গোবৰ্দ্ধন : না না না—ও আমি চাই না। খেটে খুটে যা পাচ্ছি, তাই যথেষ্ট—তাতেই আনন্দ। হ্যাঁ, একটা কথা আমি তুলছি স্যার, আজকের ঐ মিথ্যেবাদী তারক ছোকরার ব্যাপারে। দেখুন—সত্যি বলি, ওকে সরিয়ে দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। ছোকরা ভাল নয়। ক'দিন থেকেই বলব বলব ভাবছিলুম স্যার। আমার বড্ডো ইচ্ছে—রোজই দু এক ঘণ্টা আপনাদের সংস্পর্শে কাটিয়ে যাই, আর কিছু না হোক, অনেক কিছু শিখতে তো পারব। আমার স্যার টাইপের কাজটা খুব আসে—তারক বাবুতো টাইপ করতেন, এরি মধ্যে নতুন লোক না নিয়ে, দেখুন না—আমাকে দিয়ে ও কাজটা যদি চলে যায়। দিতে থুতে হবে না কিছু—টাইপের অভ্যাসটা রাখাই হোচ্ছে—

সিদ্ধিনাথ : বেশ ত, বেশ ত, আজই আপনাকে গোটা কয়েক কাজ

দিচ্ছি, যদি করতে পারেন ভালোই তো; আর কিছু দেব নাই বা কেন; আপনাকে অমনি খাটাব!

(কলিং বেল টিপলেন)

*　*

*

ভাস্করের বাড়ী—ঠাকুর ঘর। ঘরের মধ্যে সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। একটু দূরে কার্পেটের আসন পাতা। তার সামনে কোষাকুশি, তাম্র কুণ্ড। অল্প রাত হয়েছে। অচলা দুর্গাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন এবং দুর্গার আগ্রহে আরতি এঁদের ঠাকুর ঘরে এনে বসিয়েছেন। সেই সূত্রে কথা হচ্ছে:

অচলা: জানো দিদি, ঠাকুর ঘর পেলে ছোট বৌ আর কিছু চায়না। আমায় বলে, বামুন দিদির ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

আরতি: তাহলে আমাকেও বলতে হয় বড় বৌ, দুর্গাকে পেলে আমারো ছাড়তে ইচ্ছে করেনা—মনে হয় কেবলি ওর মুখে কেত্তন শুনি। কি মিষ্টি গলা—

দুর্গা: ছাই গলা! আপনি বড্ডো ভালবাসেন, তাই ওকথা বলছেন।

আরতি: শুনচ বড় বৌ দুর্গার কথা—ওর গলা হলো ছাই! জানো, সেদিন তোমরা চলে যাবার পরই পাড়াশুদ্ধ লোক সব এসে জিজ্ঞেস করে—কে গান গাইছিল গো, অমন কেত্তন ত কখনো শুনিনি? আমার খোকাও গান বড় ভাল বাসে কিনা! সেই থেকে সেও গুণ গুণ করে কত কি বলে।

অচলা : আমরা কি জানতুম দিদি! যে চাপা মেয়ে, কিছু বলেছিল নাকি? আপনিই তো ঢাকা খুলে দিয়ে ওর গুণপনা দেখিয়ে দিলেন। জানেন দিদি, আপনার মত সাজিয়ে আমাকেও ও-বাড়ীতে ঠিক এমনি করে ঠাকুর-ঘর করে দিতে হয়েছে। একদিন পায়ের ধূলো দেবার জন্তে নিয়ে যাব আপনাকে—দেখবেন তখন।

আরতি : ও মা—ওকি কথা! ঠাকুর ঘরে গিয়ে মাথা ঠুকে আমিই ধন্য হব বল ভাই! তাহলে তো একদিন যেতেই হবে দিদি!

দুর্গা : আপনাকে না দেখালে আমার মন স্থির হচ্ছে না দিদি—সেই জন্যেই তো বলতে এসেছি।

আরতি : তাহলে তো বড় বৌ আশ মিটিয়ে এখন দুর্গার কেত্তন শুনছ বল?

অচলা : তবেই হয়েছে—সেগুড়ে বালি দিদি! ও বাড়ীতে দুর্গা গাইবে গান? বাব্‌বা! কি মেয়ের ভয়! পাছে ভুতো টের পায়—কিছু বলে!

আরতি : বল কি বড় বৌ—বরকে এত ভয়?

অচলা : সে আর কি বলব দিদি! বেশ হাসছে, কথা বলছে, গল্প করছে, তার মধ্যে যেই শুনতে পেল ভূতোর গলা, বুঝল সে বাড়ী এসেছে, অমনি সব বন্ধ—আর, মেয়ে ভয়ে যেন একেবারে কাঁটা!

আরতি : এ তো ভাল কথা নয় ভাই! কেনই বা এত ভয় লা? আমরাও তো তোর মতন বয়সে বৌ হয়ে এসেছিনু—তা বলে বরের ভয়ে তো কাঁটাসার হইনি কখনো। তবে?

আচ্ছা, আমি একদিন গিয়ে ছোট বৌএর ভয় ভেঙে দিয়ে আসব।

দুর্গা : না দিদি, লক্ষ্মীটি, ও সব করবেন না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—

আরতি : তবে আজ একখানা নতুন কেত্তন শোনা দেখি। ঐ চেয়ে দেখ—আমার রাধাকৃষ্ণের মুখ হাসিতে ভরে গেল—তুই কীর্তন গাইবি শুনে।

দুর্গা পদাবলীর একখানি কীর্তন গান করুণ সুরে আরম্ভ করিল।

* *
*

যুগল মোক্তারের চেম্বার। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। খাস কামরায় বসে যুগল মোক্তার তাঁর সেই খেরো বাঁধানো খাতায় রোজ নামচা লিখতে লিখতে অদূরে উপবিষ্ট গোবর্দ্ধনের সঙ্গে কথা বলছেন :

যুগল : তোমার কাজ দেখে খুসি হয়েছি। এই তো চাই। তুমি পারবে। হালে দাস ফ্যাক্টারীতে তারকের জায়গায় বসেছ, এর পরে বসবে ঐ ভাস্কর গাঙ্গুলীর চেয়ারে—সেদিন খুব দূরে নয়। তখন ফ্যাক্টরীর সঙ্গে ভূতনাথ বাবুকেও তুমিই চালাবে।

গোবর্দ্ধন : চালাবার কর্তা হচ্ছেন আপনি স্যার—আমি ঐ সাধা হাতের যন্ত্র বইতো নই!

যুগল : ভূতনাথ এসেছে—বাড়ীর ভিতরে গেছে; বড়লোক ভাগনী জামাই—ভালভাবে খাতির যত্ন না করেও পারিনে। হ্যাঁ, তোমার আজকের খবর গুলো কাজে লাগবে হে।

যুগল মোক্তারের বাড়ীর ভিতর। দরদালান। কার্পেটের আসনে বসে ভূতনাথ জলযোগ করছে। থালায় নানাবিধ আহার্য্য। যুগল মোক্তারের স্ত্রী জলদা ও বিধবা কন্যা লক্ষ্মী কাছে বসে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলছেন :

লক্ষ্মী : দুর্গাকে সঙ্গে করে আনলেনা কেন···বেড়িয়ে যেত, না হয় এক রাত থাকতেই দুজনে !

ভূতনাথ : তার কথা আর বলবেন না। কিচ্ছু বোঝেনা, ভালমন্দ বিবেচনাবোধও নেই। হয়ত, এখানে যা শুনবে...ও-বাড়ী গিয়ে সব বৌমার কাছে বলে বাহাদুরী নিতে যাবে।

জলদা : বাবা আমার মিছে বলেননি। ওঁর সত্যিকার নজর আছে, দুগ্যাকে চিনেছেন; নৈলে ও-কথা বলেন ? আমরা যে ওর ছেলা বেলা থেকে এত করেছি কর্মেছি—সে সব ভুলে গেছে। কে বলবে ও এ বাড়ীর মেয়ে ?

ভূতনাথ : ওখানেও আমার নামে বৌমার কাছে দিনরাতই খালি নালিশ আর নালিশ !

জলদা : ওমা···সেকি গো !

যুগলবাবুর খাসকামরা। সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। যুগল মোক্তার এখন ভূতনাথের সঙ্গে আলাপ করছেন :

যুগল : সব শুনিছি বাবাজী। তারকের ব্যাপারে যেন মশা মারতে কামান দেগেছেন তোমার দাদার মিনিষ্টার ভাস্কর গাঙ্গুলী। আসল কথা হোচ্ছে···তোমার তরফের কোন লোককে ওখানে ওঁরা রাখতে চান না। এই দেখনা কেন, তারককে

তাড়ালেন · ওদিকে ভাস্কর বাবুর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন এক থোকে আড়াই শো টাকা....

ভূতনাথ : কই—এ কথা তো শুনিনি ?

যুগল। হেঁ হেঁ হেঁ। বোঝ বাবাজী। তুমি শোননি, কিন্তু যাদের শোনানো প্রয়োজন মনে করেন তোমার দাদাটি....তাঁরা জেনেছেন, নৈলে আমি জানব কি করে ?

ভূতনাথ : মাইনে বাড়ার জন্যে কথা নয় · আমি জানলুম না বলেই ··

যুগল : বিলক্ষণ! মাইনেটা এ ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া কিছু নয় বলছ কি বাবাজী! এক থোকে একেবারে আড়াইশো! এ রকম বেহিসিবি কাণ্ডটাকে ···

ভূতনাথ : ভাস্করদার গোড়ার ব্যাপার আপনি জানেন না মামাবাবু। প্লাটিনার ফ্যাক্টরীতেও উনি হাজার টাকা মাইনে পেতেন ; সেখানে থাকলে পার্টনার হতেন। সে সব ছেড়ে ছুড়ে আমাদের ফ্যাক্টরীতে আসেন...প্রথম প্রথম কিছুই নিতেন না ; কারবার জেঁকে ওঠবার পর থেকে হাজার টাকা করেই নেন। বাড়ছে এই প্রথম।

যুগল মোক্তার : হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ বাবাজী! দেখছি—এখনো তুমি তেমনি ছেলেমানুষই আছ! গোড়ার খবর আমি জানিনে ? ওঁর · · পাটনার চাকরী, আর—এক কথায় খসে পড়বার মিস্ত্রি—সবই আমার জানা আছে বাবাজী।

ভূতনাথ : য়্যাঁ—আপনি জানেন ?

যুগল : তবে বলছি কি, বাবাজী! 'থাচ্ছিল তাঁতী তার তাঁত বুনে, কাল হলো শেষে এঁড়ে গরু কিনে।' সেখানকার কারবার লাভে দাঁড়াতেই উনি অংশ চেয়ে বসলেন। তারা হোচ্ছে

পাকা ব্যবসাদার—তখুনি দরোজা দেখিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময়েই তোমার দাদা চাইলেন পরামর্শ নিজের কারবার সম্বন্ধে। ঝানু লোক—অমনি করলে কি, ছাড়িয়ে দিয়েছে এ-বদনামটা চাপা দিয়ে—চাকরী ছেড়ে দিয়েছি তোমার কারবার দেখবো বলে এই সরফরাজি করে মস্ত নাম কিনলেন; তোমার বোকারাম দাদাসাহেবও বর্তে গেলেন!

ভূতনাথ : বলেন কি—এত কাণ্ড?

যুগল : এই—বোঝ বাবাজী! একে বামুন, তায় বন্ধু, তারপর মস্ত এক ধোঁকাবাজীর চাপরাস....সিধুবাবু কাবু হয়ে সব ছেড়ে দিলেন ওঁর হাতে। গোড়ায় কিছু দিন নেননি, এখন সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছেন। ভয় কোথায় জানো বাবাজী, ব্লাডপ্রেসারের ঠেলায় তোমার দাদাটি শেষ দশায় না দাতাকর্ণ হয়ে বসেন! আমার ভাবনা বাবাজী—ঐ ভাগনীটার জন্যে...বড় আশা করে তোমার হাতে যাকে তুলে দিয়েছি। পাঁচ পুরুষে কারবারটা শেষে না পরের গব্বায় যায়! হায়-হায়-হায়...রে!

* *

*

দাস বাড়ীর ঠাকুরঘর। ভাস্করের ঠাকুরঘরের অনুকরণে এই ঘর সাজিয়েছে দুর্গারাণী। দেখে মনে হয়—ও-বাড়ীর সেই ঠাকুরঘর। অচলাদের আমন্ত্রণে আরতি বারো বছরের ছেলে রবিকে নিয়ে এই ঘরে এসেছে। অচলা ও দুর্গা উপস্থিত। একঘণ্টারও অধিক হতে চলল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

রবি : দেখ মা—ঠিক যেন আমাদের ঠাকুর ঘর

আরতি : সত্যি বড়বৌ, দুর্গা যেন ও-বাড়ীর ঠাকুরের স্থানটি তুলে এনে বসিয়েছে !

অচলা : এও দেবতার দয়া দিদি ! তিনি সে বছর জয়পুর থেকে একই রকমের দু-সেট রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আর সিংহাসন আনিয়ে এক সেট নিজের বাড়ীতে রেখে, আর একটি সেট ওঁকে দেন। আমাদেরটি য্যাদ্দিন পূজার দালানে সাজানোই ছিল—দুর্গাই এখন এঘরে এনে আপনাদের ঠাকুরঘরটির মতন করে সাজিয়েছে।

আরতি : তা বলে ঠাকুরঘর দেখাতে এনে মুখ বুজিয়ে বসে থাকলে তো হবেনা ছোটবৌ —ভজন শোনাতে হবে।

রবি : আপনার কেত্তন আমার ভারি ভাল লাগে—আমি শুনে শুনে মুখস্থ করিছি।

দুর্গা : তাহলে তুমিই গাও রবি—আমরা শুনি।

রবি : বা-রে ! আপনার কেত্তন শুনব বলেই ত এসেছি !

আরতি : রাত হয়ে যাচ্ছে ছোটবৌ—বেশীক্ষণ থাকা হবে না ভাই !

অচলা : তোর ভয় কিসের শুনি ? ভুতো তো বাড়ী নেই—তুই গা তো !

কিন্তু দুর্গা ভজনের কিছুটা গেয়েই যেমন পরের আখর টেনেছে, অমনি ভুতনাথের ঘর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : সব গেল কোন্ চুলোয় ?

স্বরটি যেন দুর্গার কাণে বর্শার খোঁচার মত বিধল—সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করে সে সভয়ে বলে উঠল :

দুর্গা : ঐ দিদি ! এসেছে ! ডাকছে ! আমি যাই—

বলতে বলতেই আর কারো দিকে না চেয়ে কোন কথা শোনবার

প্রতীক্ষা না করেই—উঠি পড়ি অবস্থায় ছুটে চলে গেল। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ভূতনাথের ঘর। ভূতনাথ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে আছে—দুর্গা দ্রুতবেগে অথচ ভয়ের প্রভাবে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ভূতনাথ মুখখানা বিকৃত করে খিঁচিয়ে বলল:

ভূতনাথ: প্রাণে ভারি স্ফূর্তি দেখছি যে!

দুর্গা ঘরের মধ্যে ঢুকে নিরুত্তরে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

ভূতনাথ: হুঁ! আমি বাড়ী থেকে বেরুলেই ঢং করে গান গাওয়া হয়! তারপর—আমার কাছে এলেই একেবারে জুজুবুড়ি!

অচলাও ভূতনাথের কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতরে—আরতিও দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা শক্ত করে অচলা বললেন:

অচলা: সে দোষ তো তোরই—তুইই জবাব দে…তোর কাছে এলেই ও ভয়ে কাঁটাপানা হয় কেন?

আরতি: দোষ তো কিছুই করেনি ভাই ও! ঠাকুরের ভজনটি যেমন ধরেছে, তোমার গলা না শুনেই মুখখানা ছায়ের মত করে ছুটে এল! ওর ওপর আবার টাইস করছ ভাই!

ভূতনাথ: আপনাদের কি বলুন না—বরাত খুলে গেছে, আনন্দ হয়েছে, তাই ওকে দিয়ে বাঈজীর মতন গান গাওয়াচ্ছেন!

অচলা: ভূতো! তুই কাকে কি বলছিস্?

ভূতনাথ: বেশতো! বাড়ীতে গানের আসর বসাও—নাচাও, যা ইচ্ছা হয় কর, আমি চলে যাচ্ছি—

বলেই ভূতনাথ ঘর থেকে সবেগে বেরিয়ে গেল।

দুর্গা : কি হবে দিদি—

অচলা : ওকে আমি চিনি—ও রাগ থাকবে কতক্ষণ! আসুক ফিরে, এর বিহিত করতেও আমি জানি।

আরতি : কিন্তু আমাকে ঠেস দিয়ে ও কথা বললে কেন ভাই?

দুর্গা : আজকাল ঐ রকম তিরিক্ষি স্বভাব ওর হয়েছে দিদি! কি যে বলে নিজেই বোঝে না—আমি তো ওর কোন কথা গায়েই মাখি না, যাইহোক—আপনি কিছু মনে করবেন না দিদি, লক্ষীটি! আপনার পায়ে পড়ি।

আরতি : ও মা—ও কি, কর কি—ছি!

* *
*

সিদ্ধিনাথের ঘর। সিদ্ধিনাথ ও অচলা। রাত্রি প্রায় এগারটা।

সিদ্ধিনাথ : ওঁর পেয়ারের বন্ধু তারককে বরখাস্ত করা থেকেই মেজাজ বিগড়েছে। এখন লায়েক হয়ে উঠেছেন · বড় বড় ব্যাপারে মাথা দিচ্ছেন·· সেয়ার মার্কেটে যাচ্ছেন; সত্যিই আমার বড় ভাবনা হয়েছে বড়বৌ! একে নিজের শরীরের এই অবস্থা, একটুতেই রেগে উঠি; এর পর ভুতো যদি এরকম বাড়াবাড়ি করে....মানীর মান রেখে না চলে...

অচলা : তাহলে তোমাকে বাপু ওকথা না বললেই হোত, আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সত্যি কথা—যাতে তোমার রাগ হয়, তেমন কিছু করতে বা শোনাতে বারণই তো করেছেন ডাক্তারবাবু! আমার এমনি ভুলো মন! যাইহোক, আমি মানিয়ে নিয়েছি। ভুতোকেও বকেছি খুব, তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিও না—

সিদ্ধিনাথ : আমি আর সব সইতে পারি বড়বৌ ; কিন্তু ভাস্কর বা তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ভূতো যদি কোন রকম অনুচিত কথা বলে, আমি কিন্তু সহ্য করতে পারব না—ওর জিভখানা তখন টেনে ছিঁড়ে দেব—

অচলা : না, না, তেমন কিছু ও বলেনি ; তুমি রেগো না—আমি ভূতোকে—

সিদ্ধিনাথ : ও-বাড়ীর বৌমাকে ভূতো কেন ওকথা বলেছে—আমি তা বুঝিছি বড়বৌ। যদি আমার অনুমান ঠিক হয়—আমিও যা করবার করব।

অচলা : কি বলছ ?

সিদ্ধিনাথ : কিছু নয়—এখন থাক—পরে শুনো।

* *

*

অফিস ঘর। ভাস্কর ও কতিপয় ফোরম্যান। ভাস্কর চেয়ারে বসে টেবিলের উপর একটা নক্সা রেখে কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন—তারা টেবিলখানা ঘিরে ঝুঁকে দেখছে।

ভাস্কর : বুঝতে পেরেছ প্রসেসটা ?

১ম : এখন বুঝিছি স্যার।

ভাস্কর : ছোট বাবুকে দেখিয়ে একটা সাইন করিয়ে নিও।

২য় : যে আজ্ঞে স্যার!

•

ভূতনাথের চেম্বার। ভূতনাথকে নক্সাটা দেখিয়ে ১ম ফোরম্যান বলছে :

১ম ফোরম্যান : আজ্ঞে হ্যাঁ—এই নক্সা দেখেই ফিট হবে।

ভূতনাথ : কেন—উনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ফিট করাতে পারলেন না?

ফোরম্যান : ফিট করবার প্রসেস ত এতেই রয়েছে—আপনি সই করে দিন স্যার!

ভূতনাথ : এসব বেগারঠেলা ফাঁকিবাজীর ব্যাপারে আমি সই করব না—যাও। (কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল)

ফোরম্যান : আপনার দাদাও ম্যানেজারবাবুর সম্বন্ধে কথনো এভাবে কথা বলেন নি—

ভূতনাথ : সাট্‌আপ্—(ফোরম্যানের গালে চড় মারল)

ফোরম্যান : আপনি মারলেন আমাকে!

ভূতনাথ : ইয়েস! গেট আউট—গেট আউট য়্যাট্ ওয়ান্স।

* *
*

অফিস ঘর। ভাস্কর টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় এলেন সিদ্ধিনাথ।

ভাস্কর : একি! তুমি আজ আবার এত তাড়াতাড়ি এলে কেন? আমি তো কাজের সব ব্যবস্থা করেই চলেছি। তোমার প্রেসারটা যখন বেড়েছে—দিন কতক নাই বা এলে! দেখ দেখি!

সিদ্ধিনাথ : বাড়ীতেও থাকতে ভালো লাগে না...এখানে এসে যতক্ষণ কাজ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলি, বরং ভালো থাকি।

ভাস্কর : তাহলে চুপ চাপ বসে থাক—এখন কাজ করবার কিছু নেই। আমি খেয়েই আসছি। এতো তাড়াতাড়ি যাবার মানে—ছেলেটার পৈতে এই মাঘেই দেব ভেবেছি··· মাঘ মাস

ছাড়া আর দিন নেই ; ভট্চাজ্যি মশাই তাঁর পূজো পাঠ সেরে, বারোটার সময় আসবেন, তাই—

সিদ্ধিনাথ : আরে বারোটা বেজে গেছে—শীগ্‌গীর যাও, বাইরে গাড়ী আছে।

* *
*

কারখানার একাংশ। জয়কয়েক মিস্ত্রী জটলা করছে উত্তেজিতভাবে :

১ম : গায়ে হাত—এত বড় আস্পর্দ্ধা ··

২য় : এর বিহিত এখুনি চাই—

৩য় : আগে মেসিন বন্ধ কর—তারপর অন্য কথা।

সমস্বরে : বন্ধ কর—মেসিন বন্ধ কর।

* *
*

আফিস। সিদ্ধিনাথ ইজি চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগড় পড়ছিলেন। ইতিমধ্যে ভূতনাথ এসে প্রশ্ন করায় একটু অবসন্নভাবেই উত্তর দিচ্ছেন :

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ, যা শুনেছ সত্য। আজই তুমি জানতে পারতে। কিন্তু তুমি কি—ভাস্করের এই ইনক্রিমেণ্ট অনুচিত মনে কর ?

ভূতনাথ : আমার মনে করবার কি আছে বলুন। আমি তো শুনিনি, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। আচ্ছা—

ভূতনাথ চলে গেলে সিদ্ধিনাথ কিছুক্ষণ তার যাওয়ার দিকে চেয়ে আপন মনে বললেন :

সিদ্ধিনাথ : যা ভেবেছিলুম তাই—এই জন্যেই মেজাজ বিগড়ে বসে আছে। ষ্টুপিড্ কোথাকার—

ভৃত্য কৈলাস হন্ত দন্ত হয়ে এসে বলতে লাগল এই সময় :

কৈলাস : ছোট দাদাবাবু তো ওদিকে হুলুস্থুল বাধিয়ে বসেছেন গো!

সিদ্ধিনাথ : কি হয়েছে ?

কৈলাস : কারখানার যোগেশবাবুকে মেরেছেন—

সিদ্ধিনাথ : মেরেছে ? ভূতো ?

কৈলাস : এই নিয়ে পেরলয় কাণ্ড চলেছে! মেশিন বন্ধ করতে চাইছিল আর সকলে; কিন্তু যোগেশ বাবুই কইলেন গো—বড়বাবুর শরীর খারাপ, বন্ধ কোরনি,—ম্যানেজারবাবু এলে এর বিহিত হবে।

সিদ্ধিনাথ : আমার শরীরের দিকে চেয়ে বাইরের লোকে ভাবে- চুপ করে, কিন্তু আমার গুণধর ভাইয়ের গ্রাহ্যই নেই! ডাকতো ভূতোকে।

কৈলাস : না দাদাবাবু এখন থাক, ম্যানেজারবাবুকে আসতে দিন। দোহাই আপনার—

সিদ্ধিনাথ : না ;—আর দেরী নয়, ওর ছেলের পৈতেকে উপলক্ষ করেই ..

* *

*

ভূতনাথের চেম্বার। বেলা তখন দুটো। ভূতনাথ ক্রুদ্ধভাবে বসে আছে তার চেয়ারে—সামনের চেয়ারে গোবর্দ্ধন বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ভূতোকে বলছে :

গোবর্দ্ধন : সেই যে কথায় আছে না—সাপ হয়ে কামড়ালে, আর—রোজা হয়ে ঝাড়লে আমাদের ঐ ভাস্করবাবু হোচ্ছেন সেই প্রকৃতির লোক! হালে পানি না পেয়ে—শেষে

নিজেই আপনার হোয়ে মাপ চেয়ে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছেন !

ভূতনাথ : ওঁর যা ইচ্ছে হয় করুন গে—আমি তো মাপ চাইতে ওঁকে বলিনি। আর আমার কোট—

গোবর্দ্ধন : আহাহা—আমি তো গোড়াতেই আপনার কানে এই মন্তরই দিয়েছিলুম—যা করে ফেলেছেন তার চারা নেই ; কিন্তু তাই বলে চাকরের কাছে মাথা হেঁট কখনো করবেন না।····আপনিও এদিক দিয়ে খুব বাহাদুর ! যাই—একবার ওঘরে তালিম দিয়ে আসি !

* * *

আফিস ঘর। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর। নিজের চেয়ারে বসে একটা ফাইল দেখছেন ভাস্কর, সিদ্ধিনাথ বিরক্তভাবে বলছেন :

সিদ্ধিনাথ : ওর হোয়ে তুমি মাপ চাইলে মানে ?

ভাস্কর : মানে—ওর কোট,····মাপ কিছুতেই চাইবে না।

সিদ্ধিনাথ : কী—

ভাস্কর : আবার তুমি মাথা গরম করছ সিধু ! আমি যখন মিটমাটের ভার নিয়েছি—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ওরা এত ভদ্র আর বুঝদার যে, তোমার স্বাস্থ্যের কথা তুলতেই একবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল !

সিদ্ধিনাথ : তাহলে আমারো উচিত ওদের কাছে মাপ চাওয়া—আমি তবে উঠি—

ভাস্কর : তার দরকার হবে না—তাহলে ওরা আরো লজ্জা পাবে। এখন সবাই কাজে হাত লাগিয়েছে।

গোবৰ্দ্ধন এই সময় ঘরে প্রবেশ করে বলল :

গোবৰ্দ্ধন : লাগাবে না স্যার—আপনি যেন যাদুমন্ত্র পড়ে—যা হবার নয় তাই করলেন। সবাইকে একসঙ্গে থ বানিয়ে দিলেন—কারুর মুখে আর রা-টি নেই! তবে হ্যাঁ—কোট বটে ছোটবাবুর·· হাতে পায়ে ধরেও বাগে আনতে পারলুম না স্যার!

সিদ্ধিনাথ : আমার কিন্তু এ-ব্যাপারে রীতিমত আক্কেল হয়েছে ভাস্কর। তাই ভাবছি—

ভাস্কর : তুমি ভাই মন থেকে ওটা ঝেড়ে ফেল দেখি! গোবৰ্দ্ধনবাবু আসুন—আপনাকে কিছু জরুরী কাজ দেব। বসুন, আমি আসছি।

ভাস্কর ঘর থেকে চলে গেলেন সিদ্ধিনাথ গোবৰ্দ্ধনকে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে লাগলেন :

সিদ্ধিনাথ : দেখুন গোবৰ্দ্ধনবাবু, আমার নোট করা এই কাগজখানা রাখুন ত! ঝাঁ করে প্রথমেই এটা টাইপ করে ডুপলিকেট কপি দেবেন আমাকে খুব চুপি চুপি। কাজটা খুব কনফিডেনসিয়াল—রাখুন আপনার কাছে।

* *
*

দাস-বাড়ী। সিদ্ধিনাথের ঘর। অনেখানি রাত হয়েছে। সিদ্ধিনাথ খাটের উপর বসে কথা বলছেন অচলার সঙ্গে।

সিদ্ধিনাথ : মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না বলে একটা প্রবাদ আছে কিনা—সেই জন্যেই তোমাকে কথাটা চেপে রাখতে বলেছি।

অচলা : আহা গো ! এ যেন নতুন কথা—আমি যেন শুনিনি !

সিদ্ধিনাথ : তাহলেও চাপা আছে। সেইজন্যেই বলছি—এখন জানাজানি করে কাজ নেই।

অচলা : বেশ ত। হ্যাঁ, দেখ, একটা কথা তোমাকে বলব ?

সিদ্ধিনাথ : কি ?

অচলা : দেবতা ছেলের তো পৈতে দেবেন শুনছি। তাতে নতুন ব্রহ্মচারীকে কিছু না কিছু তো আমাদের দিতে হবে! তা, আমি যা দেবার দেব'খন ; তুমি কেন ঐ দিনই দলিল-খানা দাওনা · বেশ হয় না ?

সিদ্ধিনাথ : ঠিক বলেছ ! বা—চমৎকার প্রস্তাব। হ্যাঁ—তাই হবে।

* *

*

দুর্গাপুর। যুগল মোক্তারের বাড়ীর বাহিরের ঘর—খাস-কামরা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। যুগল মোক্তারের সঙ্গে ভূতনাথের কথোপকথন চলেছে :

যুগল : এই তো বাবাজী—গলদ করে বসলে ! ঝাঁ করে ঐ মাইনে বাড়ানোর কথাটা দাদাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন ? কথা বলতে শেখাও একটা আর্ট—বুঝলে বাবাজী ! আমার এক সাকরেদ নাকি তোমাদের আফিসে কাজকর্ম দিচ্ছে—ঐ যে গো, সেই গাড়ীর ব্যাপারে যে লোক তোমাকে এখানে প্রথম আনে—আমার আবার নামটা সব সময় মনে পড়ে না—

ভূতনাথ : গোবর্দ্ধন বাবুর কথা বলছেন—

যুগল : হ্যাঁ, হ্যাঁ,—গোবৰ্দ্ধন। জান তো, ও ছোকরার পেশা, হচ্ছে

কথা ফিরি করা—কথার জোরে বড় বড় অর্ডার ধরে। কিন্তু কি ক'রে, কি ভাবে, কি সুরে—কার সঙ্গে কখন কথা বলতে হয়—দুটি বছর ধ'রে শিখেছিল আমার কাছে—বুঝলে বাবাজী! সাধে কি আর ঐ ছোকরা তোমার দাদার কারবারে কল্কে পেয়েছে!

ভূতনাথ : সত্যি—ওঁর কথার ধরণ শুনলেই আপনার কথা মনে পড়ে যায় মামাবাবু!

যুগল : তাহলে এখন বলি—কাউকে কিছু বলবার আগে চুপি চুপি ও-ছোকরার পরামর্শ নেবে, কিন্তু আর কাউকে জানতে দেবে না—বুঝলে? এখন আর একটা খবর দিচ্ছি শোন—ভাস্কর ঠাকুরের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েও তোমার দাদার মন ভরে নি··এখন কি সাব্যস্ত করেছেন জান?··হুঁ! কারবারের তিন ভাগের এক ভাগ অংশ লেখাপড়া করে দিচ্ছেন ভাস্কর ঠাকুরকে।

ভূতনাথ : বলেন কি! দাস-ফ্যাক্টরীর অংশীদার হবেন—

যুগল : ভাস্কর ঠাকুর। সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। দলিলপত্র লেখা হোচ্ছে য়্যাটর্নীর আফিসে। তুমিই কও তো বাবাজী ভীমরতি না হোলে পাঁচ পুরুষের ডেকে-যাওয়া ফ্যালাও কারবারে—সাধ করে এক অংশীদার এনে ঢোকায় কখনো তাও এক-আধ আনার পার্টনার নয়··সমান বখরা থাকে তোমাদের দু'ভায়ের মতন! বুঝেছ—বাবাজী?

ভূতনাথ : এ অন্যায়—সত্যই অন্যায়; আমি এ হোতে দেব না-কিছুতেই না।

যুগল : তা বলে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে বাবাজী—চট

চলবে না। এখন যা যা বলি মন নিবিষ্ট করে শোন দেখি। কিন্তু কোন কথা কাউকে বলবে না—আমার ভাগনী দুর্গাকেও না···বুঝলে ? এরপর যেখানে আটকাবে, একমাত্র বিশ্বাস করে ঐ গোবর্দ্ধনকে শুধু বলবে—তারই যুক্তি পরামর্শ নেবে। সেও কাউকে বলবে না। এখন শোন :

রুদ্ধ কক্ষ হ'লেও অতি সাবধানী যুগল মোক্তার ভূতনাথের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া যুক্তি পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

* *
*

সিদ্ধিনাথের ঘর। রাত হয়েছে। খাটের উপর বসে সিদ্ধিনাথ দলিল পড়ে শোনাচ্ছিলেন অচলাকে। এই মাত্র পড়া শেষ হওয়ায় দলিল খানা দেরাজে রাখতে রাখতে বলছেন :

সিদ্ধিনাথ : শুনলে তো। আজই দলিল তৈরী হয়ে এসেছে। এই দলিলের বলে ভাস্কর, আমি আর ভূতো—আমরা তিনজনেই তুল্যাংশ কারবারের মালিক হচ্ছি।

অচলা : আহা—এ যেন নতুন। অনেকদিন আগেই তো আরতি ঠাকরুণের সামনেই তুমি একথা বলে এসেছিলে। সেকথা এখন সত্যি হলো। বেশ হলো, আর, আমারও খুব আহ্লাদ হলো।

সিদ্ধিনাথ : কথাটা আমার মনেই ছিল। তবে এদানী শরীরের যে রকম অবস্থা দেখছি, আর ফেলে রাখা ঠিক নয় ভেবেই তাড়াতাড়ি সেরে ফেললুম।

অচলা : তুমি বাপু এবার নিশ্চিন্তি হয়ে কার-কারবার ওদের হাতে

ছেড়ে দিয়ে ঘরে স্থির হয়ে ব'স দেখি। না হয় চল—দিন কতক কোন তীর্থ ঘুরে আসি।

সিদ্ধিনাথ: আমিও তাই ভেবেছি।

অচলা: ভাল কথা—ভূতোকে এসব বলেছ?

সিদ্ধিনাথ: বলাবলি আর কি—কালই আফিসে তৈরী দলিলখানা দেখিয়ে দেব ভেবেছি। তবে, ভাস্করকে এখনি বলা হবে না।

দাস ফ্যাক্টরী। আফিস ঘর। শীতের অপরাহ্নকাল। সিদ্ধিনাথ ও ভাস্কর। ৬টা বাজবার আগেই সন্ধ্যা হয়েছে।

সিদ্ধিনাথ: আগে তুমি ওঠ—এখনো আফিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ! এই বললে—সন্ধ্যের আগেই পুরুত ঠাকুর আসবেন— ৬টা তো বাজে যে—ওঠ।

ভাস্কর: হয়েছে—এই যে উঠেছি। তা—তুমিও ওঠ, এক সঙ্গেই—

সিদ্ধিনাথ: আমার একটু কাজ আছে—৬টার সময় একজনের সঙ্গে এখানে দেখা করবার কথা আছে। তুমি বরং গিয়েই গাড়ীখানা পাঠিয়ে দিও।

ভাস্কর উঠলেন। সিদ্ধিনাথ পকেটে হাত দিলেন।

ভূতনাথের চেম্বার। ভূতনাথ ও গোবর্দ্ধন।

ভূতনাথ: ছ'টা তো বাজে···আমি তাহলে ওঘরে যাই—উনি তো ঠিক ৬টায় যেতে বলেছেন।

গোবর্দ্ধন: হ্যাঁ—এবার দুর্গা বলে উঠে পড়ুন। কিন্তু আবার বলে দিচ্ছি—কিছুতেই যেন চটবেন না, মাথা গরম হোতে দেবেন না: যেমন যেমন বলেছি তেমনি বলবেন....

ভূতনাথ : হ্যাঁ—মনে আছে।

ড্রয়ার থেকে হাত মোজা বার করে হাতে পরল—আলনা থেকে অলষ্টারটি নিয়ে গায়ে চড়ালো।

আফিস ঘর। সিদ্ধিনাথের সামনের চেয়ারে বসে ভূতনাথ দলিলখানা মনে মনে পড়ছিল—পড়তে পড়তে তার মুখখানা কালো ও চোখ দুটো কুঞ্চিত হচ্ছিল। পড়া শেষ করে বলল :

ভূতনাথ : এভাবে দলিল করবার মানে এই বুঝছি—আমাদের পৈতৃক কারবারে ভাস্করদাও আমাদের সঙ্গে সমান অংশীদার হচ্ছেন!

সিদ্ধিনাথ : হ্যাঁ! বাবা মারা যাবার পরেই দারুণ দুর্দিন যখন এসেছিল—সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার দেনার ভারে কারবার যায় যায় অবস্থা—পাওনাদারদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি কারবার বেচে ফেলতে চেয়েছিলুম; এই ভাস্করই তখন দেবদূতের মতন এসে আমাকে নিষেধ করে- নিজেই সব ভার হাতে করে নিয়েছিল। আমি তখনই ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে সঙ্কল্প করি—যদি দিন ফেরে, কারবার টেঁকে, তাহলে ভাস্করকেও সমান অংশীদার করে নেব।

ভূতনাথ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও সব জানা আছে।

ভূতনাথের কথার সুরে একটু অপ্রসন্নভাবে তাকিয়ে বললেন :

সিদ্ধিনাথ : তাহলে তো এ দলিল পড়ে কোন প্রশ্ন তোলাই তোর উচিত নয়।

ভূতনাথ : আজ্ঞে, এত বড় একটা ওলট পালট ব্যাপার হতে চলেছে—

পুরুষানুক্রমে আমরাই যে কারবারের মালিক বলে গণ্য আছি, তাতে বাইরের একজন সমান বখরাদার হচ্ছেন, এ অবস্থায়—এখানে কোন প্রশ্ন তোলা কি আপনি অসঙ্গত বলতে চান? এই কারবারের জন্যে তিনি অনেক কিছু করেছেন বলেই মোটা মাইনে দেওয়া হচ্ছে, বোনাস পাচ্ছেন, এই সেদিনও—কম নয়… এক সঙ্গে আড়াই শো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে…এরপর না হয় আরও কিছু বাড়ুক—বোনাশ বেশী হোক…কিন্তু একেবারে ইকোয়্যাল শেয়ারে পার্টনার করে নেওয়া…

সিদ্ধিনাথ: তোর এসব ছেঁদো কথার উত্তরে আমি শুধু এই কথাই বলছি—সেদিন ভাস্কর এসে না দাঁড়ালে এই চেয়ারে বসে আজ এসব কথা বলবার মত মুরোদ তোর হত না; আর আজকের দিনের এই বিরাট ফ্যাক্টরীর নামটাই হয়ত বজায় থাকত, কিন্তু এর মালক হয়ে বসতেন আমাদের প্রাক্তন মহাজন শেঠ লোচন দাস ভিয়ানাওয়ালা—দেনার টাকায় সেদিন যিনি এই কারবার কিনে নিচ্ছিলেন! আমরা আজ হয়ত কোন রকমে মাথা গুঁজে সাধারণ ভাবে পৈতৃক বাড়ীতে থাকতুম, আর পূর্বপুরুষদের কীর্তির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতুম।

ভূতনাথ: এখন আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন।

সিদ্ধিনাথ: আমার নামের নীচে তোমার নামটি সই করতে হবে।

ভূতনাথ: আমাকে তবে আজকের রাতটি ভাবতে দিন।

সিদ্ধিনাথ: তাহলে শোন—আসছে কাল দিনটি ভালো। রাত আটটা থেকে পৌনে ন'টা পর্যন্ত মাহেন্দ্র যোগ আছে। তুই ঠিক

আটটার সময় এখানে এসে দলিলে সই করবি। সাড়ে আটটার সময় ভাস্করকে আসতে বলেছি—তাকেও সই করতে হবে কিনা? এখনো তাকে কিছু বলা হয়নি, তখন চমকে দেব। তারপর আমরা এক সঙ্গেই ওর বাড়ীতে গিয়ে রবির উপনয়নের নিমন্ত্রণ রক্ষা করব। বুঝলি?

ভূতনাথ: যে আজ্ঞে।

সিদ্ধিনাথ: এইটে তুই মনে রাখবি ভূতো—তোর ভাববার কিছু নেই। এরপর আমার শেয়ারও তুই পাবি; তখন তুই ও তোর ওয়ারিশানরাই বড় তরফ হবে—বুঝলি?

*

*

ভাস্করের বাড়ী। দেউড়ীতে নহবত বাজছে। রাত্রি প্রায় পৌনে আটটা। শীতকালের রাত্রি—পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তার অবস্থা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। উৎসব মুখর বাড়ী। লোকজন আসছে। দেউড়ীর কাছে বসে কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা মধ্যবয়সী সুকণ্ঠ এক বাউল এক তারা বাজিয়ে দেহতত্ত্ব-মূলক একখানি রূপক আধ্যাত্মিক গান গাইছেন আপন মনে।

দোতালার সেই ঠাকুর ঘরখানি আজ ভাস্করের ছেলে রবির দণ্ডীঘর হয়েছে। ঘরের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আরতি নবাগতা অচলা ও দুর্গারাণীকে অভ্যর্থনা করছেন:

আরতি: অমা—এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঘসছ যে! ভিতরে চলো—ছোট বৌএর সাধের সেই ঠাকুর ঘরেই ব্রহ্মচারীর দণ্ডীঘর করেছি।

অচলা : ভালোই করেছেন দিদি। তবে—আমরা কি করে ব্রহ্মচারীর দণ্ডী-ঘরে যাব দিদি!

ভাস্কর একটা গলাবন্ধ গরম কোট ও তার উপর একখানা সাদা আলোয়ান গায়ে দিয়ে এই দিকেই আসছিলেন ; অচলার কথাগুলি তিনি শুনতে পেলেন ; সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানা গম্ভীর করে তিনি এগিয়ে এসে বললেন :

ভাস্কর : ও কি বলছ বৌমা! জানো—সিধু আমাকে মায়ের পেটের ভাই বলেই জানে ; তাই আমাদের মধ্যে জাত নিয়ে ও-সব বিধি নিষেধ নেই—বুঝেছ ?

ভাস্করকে দেখে অচলা ও দুর্গা তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলেন। দুর্গা সেই অবস্থায় চাপা গলায় বলল :

দুর্গা : শুনলে দিদি? আর তুমিও তো ওঁরে দেব্‌তা বলো! এখন কি বলবে বল ?

অচলা : বলবই তো—দেবতারাই তো যত বিধিনিষেধের বেড়া বেঁধে দিয়েছেন! আপনিই বলুন দেবতা—নয় কি ?

আরতি : শুনলে বড় বৌয়ের কথা—এখন জবাব দাও।

ভাস্কর : হ্যাঁ—এর জবাব তো সামনেই রয়েছে গো! বৌমা যে বেড়ার কথা বললেন—সে বেড়াতো মানুষের মূর্তিতে দেবতা এসেই ভেঙেও দিয়েছেন—আর তার মস্ত নজীরও রয়েছে।

বলতে বলতেই ভাস্কর নিজে দণ্ডীঘরের দরজা দুহাতে খুলে দিয়ে বললেন :

ভাস্কর : ঐ দেখ বৌমা। সামনেই যাঁর ছবি—উনি ব্রহ্মচারী হয়েই—সব বিধিনিষেধ ঠেলে ফেলে—ওঁর শূদ্রাণী-ধাই-মা

ধনি কামারণীর হাতের ভিক্ষা নিয়েছিলেন সবার আগে। (হাস্য) একবারে মোক্ষম নজীর নয়? যাও মা—যাও।

বলেই স্বভাবসিদ্ধ হো হো করে হেসে বললেন :

আমার আবার ভোগস্থি দেখনা—সিধু গাড়ী পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন—অফিসে বসে আছেন, আমি গেলে এক সঙ্গে আসবেন। কি রকম ছেলে মানুষী বলতো মা?

অচলা : হয়তো কোন মুস্কিলে পড়েছেন—তাই মুস্কিল আসানের জন্যে দেবতার ডাক পড়েছে।

বাড়ীর বাহিরে দেউড়ী। সেই বাউল একইভাবে গান খানি গেয়ে চলেছে। গানের রেশ সংলাপের মধ্যেও দোতালায় শোনা যাচ্ছিল। ভাস্কর নিচে এসে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে গানটি শুনলেন—আরও অনেকে গান শুনছিলেন। ভাস্কর পকেট থেকে গেঁজিয়া বার করে একটি টাকা দিলেন বাউলের ঝুলিতে। ভাস্কর গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী চলতে লাগল—গানের রেশও সেই সঙ্গে চলল।

* *

*

দাস-ফ্যাক্টরী আফিস। সিদ্ধিনাথ একাকী আফিস-ঘরে তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। সামনে খোলাভাবে দলিলখানা পড়ে রয়েছে। গায়ের শালখানা চেয়ারের পীঠে ঝোলান অবস্থায় ছিল—সিদ্ধিনাথ এই সময় সেখানি তুলে নিয়ে ও পাটখুলে গায়ে দিলেন। ঘড়িতে আটটা একটু আগেই বেজে গেছে। এই সময় ভূতনাথ অফিস ঘরে প্রবেশ করল। তার পরণে কোঁচানো ধুতি, গায়ে সার্জের পাঞ্জাবি, পায়ে ও হাতে পাংশুটে রঙের মোজা। হাত-মোজা বা দস্তানাবৃত হাতে একটা